Gram Bangler Galpa

(a collection of short stories on peasant life and struggle of Bengal)

Edited by

Kamalesh Sen

▭ প্রকাশক : রেণুকা সাহা ২০ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৯

▭ মুদ্রণে : নিউ মহামায়া প্রেস ৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭৩

▭ প্রচ্ছদপট : প্রবীর সেন

▭ প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্পেকট্রাম ১৭ মণীন্দ্র মিত্র রো কলিকাতা-৭০০০০৯

তিরিশ টাকা

এই তেভাগা এব

কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলনে

শহীদ বীরসেনানীদের অমর

স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

প্রীতিভাজন কমলেশ সেন কর্তৃক সম্পাদিত 'গ্রাম বাংলার গল্প' পুস্তকের ভূমিকা আমাকে কেন লিখতে অনুরোধ করলেন জানি না। আমি নিজে কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছি। কিন্তু প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রয়োজনে গল্প ও উপন্যাস রচনার প্রবল আগ্রহ পরিত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত অনুবাদক ও প্রবন্ধকার হিসাবেই জীবন কাটালাম। অবশ্য প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে বাংলা সাহিত্যের গল্প ও উপন্যাস নিয়ে কিছু কিছু প্রবন্ধ আমাকে লিখতে হয়েছে বোধ করি সেই সব কথা ভেবেই আমাকে কমলেশের পছন্দ হয়েছে।

ত্রিশ দশকে মার্কসবাদী চিন্তাধারা যখন পুঁথিপত্র ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে বাংলার তথা ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করে তখন সমস্ত ভারতীয় সমাজের চিত্রের মধ্যে গ্রাম বাংলার চিত্র নতুন ও কিছু আগের পুরাতন সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে পরিবর্তন ঘটাতে চেষ্টা করে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে তারাশঙ্কর গ্রাম বাংলাকে যে দৃষ্টিতে দেখে তাঁদের গ্রাম বাংলা ভিত্তিক রচনাগুলি লিখেছেন, তার সঙ্গে ত্রিশ চল্লিশ দশকের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত ভূমি ব্যবস্থার সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে, হার্বার্ট স্পেনসার ও কোৎ-এর দার্শনিক ও নান্দনিক চিন্তাধারাপুষ্ট বুদ্ধি ও চিন্তাভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল তাতে অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদারনৈতিক মানবতাবাদ প্রকাশ পেলেও সেই সামাজিক সম্পর্কগুলি প্রকাশ পায়নি যার থেকে বলা যায় সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের ফলে গ্রামের সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে। গ্রাম থেকে শহরে কলকারখানায় এসে গ্রামের মানুষ বৈপ্লবিক শ্রেণী তৈরী করছে। গ্রামের কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য তৈরী হওয়ার বাস্তবতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং গোটা ভারতে পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের ঐক্যের বিরুদ্ধে শহর ও গ্রামের মেহনতী মানুষের ঐক্যবদ্ধ শর্ত সমাবেশ করছে। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন চিত্র পাওয়া গেলেও সমগ্রের সঙ্গে তাৎপর্যহীন।

বাংলা নাটকের শুরুতে এই ছবির কিছু আভাষ পাওয়া যায়। মাইকেল মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে সামন্ত হিন্দু জমিদারের শঠতা ও দুশ্চরিত্রতার বিরুদ্ধে হানিফ ও গরীব ব্রাহ্মণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের জমির উপর নির্ভরশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে নবীনমাধবের

সঙ্গে মুসলমান কৃষক তোরাপের একত্রে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার এবং পরবর্তী কালে নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে নবীনমাধবের গ্রামে কৃষক সমাবেশের যে ইঙ্গিত রয়েছে তার কোনরূপ প্রতিচ্ছবি পরবর্তী লেখকদের রচনায় মেলেনি। শরৎ-চন্দ্রের মহেশ এর মতো রচনা তাঁর নিজের লেখায় যেমন আর মেলে না তেমনি তাঁর সমসাময়িক কালের গল্প লেখকদের মধ্যেও পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে গ্রাম সমাজের কিছু ছবি উদার মানবিকতার রং-এ রঙীন কিন্তু সামাজিক গতি তত্ত্বের সন্ধান সেখানে কদাচিৎ মেলে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৩৬ সালে প্রগতি লেখক সংঘ, নিখিল ভারত কৃষক সভা এবং ছাত্র ফেডারেশন তৈরী হল। সংগঠনগুলি পৃথক হলেও দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একই বিশ্ব-দর্শন প্রসূত। সেই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা ভারতে সামাজিক সমস্যার সঙ্গে শিল্প সংস্কৃতির সমস্যাকে পারস্পরিক সংযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা শুরু হল। প্রগতিশীল ছাত্র, তরুণ সাংবাদিক এবং কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন কর্মী ও নেতারা গ্রাম বাংলার জীবন নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখতে সুরু করলেন। কলিকাতার বাইরেও এ চেষ্টা হয়েছে।

১৩৪৪ (১৯৩৭) সালে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষ থেকে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং প্রয়াত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রগতি নামে যে সংকলন প্রকাশ করেন তাতে প্রয়াত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ দুটি তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের যে অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন তা আজকের দিনে স্মরণ করার প্রয়োজন আছে। ধূর্জটিবাবু লিখছেন "শুনেছি বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল লেখক আছেন। তাঁরা কেউ কেউ উন্নতি করছেন। ভাবের দিক থেকে কোন নতুনত্ব পাইনি। সকলে এখনো ব্যক্তিবাদী। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী ও শরৎচন্দ্রের যুগে হিন্দু সমাজের বিপক্ষে লড়াই করার প্রয়োজন, তাই ব্যক্তিবাদ তখন ছিল প্রগতিশীলতার মূলমন্ত্র। এখন সমাজ বদলেছে। নতুন সাহিত্যিকের লেখার পরিবর্তন সম্বন্ধে সন্দেহের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু কেন হল কি ভাবে হল এই জ্ঞানের পরিচয় পাই না। ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া শিখে খেতে পাচ্ছে না, তাই কষ্ট পাচ্ছে, কষ্টের কারণ সে নিজে বুঝতে পারছে না—মাত্র এইটুকুই কথাসাহিত্যে ফুটেছে। কবিতায় বিষাদের ছায়া দেখছি, কিন্তু কিসের বিষাদ? সেই একই কারণে অর্থাৎ কবি নিজে ভালো ভাবে থাকতে পারছেন না। এঁরা যে সকলে চাকুরী খুঁজছেন। বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্য বড় চাকুরীর দরখাস্ত লেখার সামিল হয়েছে। যাঁরা গরীব গৃহস্থের দুঃখে হা হুতাশ করেন তাঁরা লোক ভালো কিন্তু রোমান্টিক। আমাদের সাহিত্য পিছনে তথ্য, ঘটনা মূল্য জ্ঞানের কোন তাগিদ নেই। যখন তা নেই তখন

আজকের কেরামতি ঝুটা মনে হয়।...সমাজ জীবনের রূপ পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলেও যে নতুনত্ব সাহিত্যে আনা যায় তাকে প্রগতিশীল সাহিত্যের অভিনবত্ব বলে আমি ভুল করতে রাজী নই।"

ধূর্জটিবাবু সেকালের খ্যাতিনামা শিল্প সমালোচক। তাঁর সমগ্র রচনাটি নিয়ে আমি অন্যত্র দীর্ঘ আলোচনা করেছি, যার পুনরুল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে না। কিন্তু তিনি যে বিশ ও ত্রিশ দশকের অর্থাৎ কল্লোল ও ঠিক তাদেরই ঘনিষ্ঠ পরবর্তী যুগের সাহিত্য প্রচেষ্টার একটা রূপরেখা দিতে চেষ্টা করেছেন এটা সুস্পষ্ট। ঐ একই সংকলনে প্রকাশিত ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যে কাল ব্যতিক্রমের উল্লেখ করে প্রশ্ন তুলেছেন,........"কিন্তু ইংরেজ শাসনের এবং কলকারখানার জন্য যে মধ্যশ্রেণী বা বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বত্র উদ্ভূত হয়েছে এবং যারা ভারত শাসনে ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের বা শ্রমিক কৃষকের অস্তিত্বের চিহ্ন সাহিত্যে কই?...তবে হালে এক প্রকার নূতন সাহিত্যের উদয় হইয়াছে। তাহা একটি বুর্জোয়া সাহিত্যের অভিমুখে যাইতেছে মনে হয়। কিন্তু ইহা কেবল ইডিপাস কমপ্লেক্স অনুসরণ করিয়াই পরিশ্রান্ত। ইহাতে সমাজকে আধুনিক ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার কোন আদর্শ দিতে পারিতেছে না। ইহাতে জনের সন্ধান বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না গণের তো নয়ই। কেবল পাওয়া যায় যৌন সম্বন্ধের কাহিনী।...শুধু যৌন সম্বন্ধের বিচার করিলেই পুরুষ ও নারীর শেষ প্রশ্নের সমাধা হয় না। আবার নারীর ক্রমাগত স্বামী বা প্রণয়ী পরিবর্তন করাই তাহার সামাজিক শেষ প্রশ্ন নয়। ইহা কোন সমাজের আদর্শ তাহা জানি না। অন্ততঃ সাম্যবাদী গণশ্রেণী সমাজে তাহা নয় ইহা নিশ্চিত ভাবে জানি। ...পুস্তকে গণশ্রেণীর জীবন সম্বন্ধে লিখিলেই তাহা গণসাহিত্য হয় না। গণশ্রেণীর দুঃখ দারিদ্র্য, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কথা হৃদয়ের বেদনা ও সুখেচ্ছার কথা লইয়া এবং তাহাকে সমাজের কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার ওয়ারল্ড ভিউ (বিশ্বদর্শন) নিয়া যে-সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে তাহাকে গণসাহিত্য বলা যায়। ভারতে অর্থনৈতিক কারণে একটি গণ আন্দোলন চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহার একটি সাহিত্য এখনও গড়িয়া উঠিতেছে না—ইহাও একটি কাল ব্যতিক্রম। যেদিন গণশ্রেণীর লোক সাহিত্যে লোকসমাজের চিত্র অঙ্কিত করিবে, সেইদিন একটি জীবন্ত গণসাহিত্য উদ্বুদ্ধ হইবে।...মোটের উপর দেখি আমাদের সাহিত্য একদিকে সনাতনী খাতে প্রবাহিত হইতেছে; অন্যদিকে অদ্ভুতভাবে বৈদেশিক ভাব, আসিতেছে। আমার মতে উভয়েই বেখাপ্পা।"

এই দুইজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ যাঁরা মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন অথচ কোন দলের সদস্য হননি এবং কোন প্রকারেই কোন গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না—

তাদের বিচারে চল্লিশ দশকের এই গল্পগুলির গুণ বিচার করার একটি সূত্র নির্ণয় করা কঠিন নয়। এই সংকলনের অনেক লেখক নিজেদের প্রগতিশীল মতাদর্শের জন্ত শহীদ হয়েছেন, কয়েকজন সাহিত্য ক্ষেত্রে, কল্লোল যুগের হয়েও চল্লিশ দশকের ভাবাদর্শে নিজেদের রচনারীতিকে পরিবর্তন করার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন—কিন্তু অধিকাংশই হলেন চল্লিশ দশকের মার্কসবাদী ধ্যান ধারণা ও আন্দোলনের ফসল এবং উভয় বাংলাতেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন—সেই আদর্শ সামনে রেখে। এঁদের মধ্যে অনেকেই আমার বিশেষ পরিচিত এবং বন্ধু স্থানীয়।

গ্রাম বাংলার মানুষ, তার শ্রেণী বিন্যাস এবং ইংরাজ শাসন অবসানের আগে ও পরে তার মধ্যেকার পরিবর্তন বুঝে যেমন সংগ্রামী সংগঠন পরিকল্পিত হয়নি, তেমনি তার সাহিত্য ও সৃষ্টির মানসিকতা গড়ে ওঠেনি। তেভাগা হাজং বিদ্রোহ কাকদ্বীপ ও তেলেঙ্গানার রক্তাক্ত সংগ্রামের ফসল নিয়ে বাংলা সাহিত্যে গ্রাম জীবনের যে ছবি ফুটে ওঠার সুযোগ ছিল তার কিছু আভাস আলোচ্য সংকলনে হয়তো পাওয়া যাবে। তেমনি পাওয়া যাবে প্রত্যেক লেখকের সীমাবদ্ধতারও কিছু পরিচয়। যেখানে গ্রাম বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ নিবিড়, সেখানে আজকের দুর্বলতার অতিক্রম করে গল্প জনপ্রিয় হয়েছে। কেবল বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী—যাকে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত world view বলেছেন এবং যাকে আজ মার্কসবাদ বলা হয়ে থাকে, কেবল তা জানা এবং তার প্রতি বিশ্বস্ততা জ্ঞাপন করাই যথেষ্ট নয়—গ্রাম বাংলার জীবন ও সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও নিবিড় সম্পর্ক থাকা অবশ্য প্রয়োজন।

ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের গ্রামে পাঠানো হত। বিজন ভট্টাচার্য, চিত্ত প্রসাদ, সোমনাথ হোড, গোলাম কুদ্দুস, কামরুল হাসান, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রামে গেছেন এবং তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যাঁরা গ্রামে যেতে পারতেন না তাদের জন্য সংঘের অফিস ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীট-এ (বর্তমানে লেনিন সরণী) রাজনৈতিক নেতারা এসে গ্রামের মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি বিবরণ দিতেন। সে যুগের প্রগতিশীল লেখকদের সে নীতি-বোধ ও মূল্যবোধ ছিল। বর্তমানকালে যা দিন দিন দুর্লভ হয়ে উঠছে। এই সংকলনে তারও একটা পরিচয় পাঠকরা পাবেন আশা করি। আর সেই কারণে বর্তমান সংকলন বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার পক্ষে প্রয়োজনীয় দলিল হিসাবে গণ্য হতে পারে।

সুধী প্রধান

গ্রাম বাংলার গল্প



ভকাটটি বিখ্যাত শিল্পী শ্রীসোমনাথ হোড় কর্তৃক কৃত এবং শারদীয়া স্বাধীনতা
৫৩ হতে পুনর্মুদ্রিত।

সংকলন প্রসঙ্গে

চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশক—এই কুড়িটি বছর ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলা দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর দিয়ে অনেকগুলো ঝড় বয়ে যায়। এই ঝড়ের প্রচণ্ডতায় সমগ্র জনজীবন এবং জনমানস প্রবলভাবে আলোড়িত হয় এবং এক নতুন বোধ—এক নতুন সংঘাতে উপনীত হয়।

এই নতুন বোধ—এই নতুন সংঘাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যেই ধীরে ধীরে জন্ম নেয় এবং বর্ধিষ্ণু হয়। এক দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমগ্র জাতির রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, অন্যদিকে শ্রমিক কৃষকসহ সমস্ত মেহনতী মানুষের শোষণ এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার লড়াই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনকে এক উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যায়।

চল্লিশ দশকের প্রারম্ভেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ শাসন এবং নির্যাতনের ভিত প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী এবং ফাসিস্ট শক্তিগুলি বাজার দখলের জন্যে যে-সর্বগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করেছিল, তা ক্রমশই স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ লাল ফৌজ এবং ইউরোপ সহ সমগ্র পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির দুর্দমনীয় প্রতিরোধের কাছে বিধ্বস্ত হয়ে পড়তে থাকে ও অবশেষে পরাজিত হয়। অন্যদিকে প্রায় সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ড অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। চীন সহ সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন শক্তিগুলির বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলি সশস্ত্র প্রতিরোধের দিকে যায় এবং মুক্তিসংগ্রাম এক নতুন পর্যায়ে ওঠে। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী তীব্র গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে নৌ বিমান এবং সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের চোখের ঘুম কেড়ে নেয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাজাপ্রাপ্ত সৈনিক আব্দুর রশীদ ও অন্যান্যদের মুক্তির দাবীতে সারা দেশ জুড়ে হরতাল এবং ব্যারিকেড লড়াই শুরু হয়ে যায়।

বাংলাদেশ, উত্তর প্রদেশ, কেরালা, এবং অন্ধ্রের কৃষকরা সামন্ততান্ত্রিক গোলামী এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়। যুদ্ধ মন্বন্তর দেশভাগ

ও দাঙ্গা গোটা বাংলাদেশের, বিশেষ করে কৃষক সমাজকে বিধ্বস্ত করে দেয়। প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষ মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষে অনাহারে মারা যায়। দাঙ্গার রক্তে দেশ ভেসে যায়। দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে আসে স্বাধীনতা। খণ্ডিত পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশের দুটি জাতিসত্তার এক কোটিরও বেশী লোক উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। জীবন সম্পর্কে মানুষের চিরায়ত নীতি ও মূল্যবোধ প্রচণ্ডভাবে নাড়া খায় এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। ঘুষ, কালোবাজার এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্যান্য ক্লেদগুলোর সঙ্গে মানুষ ক্রমশঃ পরিচিত হয়।

চল্লিশ দশকের প্রারম্ভেই এই অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামমুখর দিনগুলির দিকে নজর রেখে কমিউনিস্ট পার্টি তার ঘোষণাপত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থা ধ্বংস করে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্য প্রত্যয়ের সঙ্গে আহ্বান জানায়। এই আহ্বানকে নিছক আহ্বানের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং তা বাস্তবায়িত করার জন্যে গণতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মীরা শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের মধ্যে তাদের কাজের পরিধিকে ব্যাপক এবং গভীরতর করার জন্যে নেমে পড়েন। এই কাজের ধারা এবং প্রক্রিয়া একদিকে যেমন ছিল সাচ্চা, যেমন প্রাণবন্ত, ঘৃণা এবং ভালোবাসায় আপ্লুত, তেমনি অন্যদিকে ছিল স্বাভাবিক মানবিকতায় ভরপুর, শ্রেণী সচেতনতায় তীক্ষ্ণ এবং আন্তর্জাতিকতা বোধে দীপ্যমান।

শহরাঞ্চল এবং শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক আন্দোলনের পাশাপাশি সারা বাংলাদেশের ব্যাপক গ্রামাঞ্চল জুড়ে কৃষক সমিতিগুলি দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে। বিশেষ করে সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে কৃষক আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়। অসংখ্য কৃষক এবং গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ কৃষক সমিতির পতাকা তলে সমবেত হয়। গ্রামগুলি ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে।

এই জাগরণের কাজ যাঁরা করেন, কাজ করতে গিয়ে যাঁরা গ্রামের খেটে-খাওয়া দরিদ্র মানুষের সঙ্গে মিশে যান—একাত্ম হন, আত্মত্যাগ করেন এবং সমদুঃখে ব্যথিত হয়ে ওঠেন; তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সংস্কৃতি কর্মী। আর তাই এই নতুন উপলব্ধি বোধ থেকে কেউ লিখেছেন গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ রিপোর্টাজ নাটক কবিতা, কেউ রচনা করেছেন গান, কেউ বা করেছেন অভিনয়। মানুষের চিন্তা চেতনায় এনেছেন এক নতুন ধারার প্লাবন। সেদিনের সেই আন্দোলন, সেই সংগ্রামগুলির ভেতর দিয়ে তাঁরা যে শ্রেণী ভ্রাতৃত্ব এবং কমিউনিস্ট নৈতিকতা সৃষ্টি করেছিলেন, তা আজ খুঁজে পাওয়া ভার।

এই গল্প সংকলন করতে গিয়ে আমাকে বারবার এই দিকগুলিই বিশেষভাবে আকৃষ্ট এবং অভিভূত করে। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল এই সংগ্রাম মুখর দিনগুলি

যেন অতিপরিচিত, অতি কাছের। যেন এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের সংগ্রামের কৈশোর আর যৌবনের বিশ্বস্ত দিনগুলি।

সাহিত্য শিল্প এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই যে শ্রেণীচেতনা, নতুন মূল্যবোধ নতুন আদর্শ বস্তুনিষ্ঠতা এবং উদ্দীপনা শুধু অবিভক্ত বাংলার গণশিল্পী এবং সাহিত্যিকরাই সংগ্রামের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি করলেন না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শিল্পী সাহিত্যিকরাও ঠিক একই আবেগ উদ্দীপনা মূল্যবোধ এবং বস্তুনিষ্ঠতায় তাঁদের স্ব স্ব সাহিত্যে মুক্তিদিশা আনলেন—খুলে দিলেন রুদ্ধ দ্বার। কৃষণ চন্দর, সাজ্জাদ জাহির, মুলকরাজ আনন্দ, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, খাজা আহমদ আব্বাস, বলরাজ সাহানী, আন্না ভাও সাঠে, অমৃত রায়, যশপাল প্রত্যেকেই নতুন মানুষ নতুন চেতনা নতুন মূল্যবোধকে এক দুরন্ত শক্তিতে উজ্জীবিত করে তুললেন—যা আগের অন্যান্য দশকগুলি থেকে অবশ্যই সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা যায়।

এই সুস্পষ্ট চিহ্নকেই আজ আমরা আবার নতুন করে অনুসন্ধান করতে চাইছি। চাইছি তার কারণ, অতীতের সংগ্রাম মুখর দিনগুলি আগামী দিনের সাথে যেন রণপায়ে হেঁটে যায়। তাকে শক্তি এবং বিশ্বাস জোগায়।

এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গল্পকারদের অধিকাংশই শুধু একজন লেখক হিসেবে দূর থেকে এই সংগ্রামগুলি এবং গ্রাম বাংলার মানুষকে প্রত্যক্ষ করেননি, বরং তাদেরই একজন হয়ে গিয়েছেন এবং গল্পের রূঢ় বাস্তবভূমিতে সহজ সাবলীলভাবে চলা-ফেরা করেছেন।

যুদ্ধ, মন্বন্তর, ফ্যাসিবাদের পরাজয়, তেভাগা আন্দোলন, হাজং বিদ্রোহ কাকদ্বীপের কৃষক সংগ্রাম, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এবং নিপীড়ন, রাঢ়ভূমির আদি-বাসী কৃষকদের জমিদার জোতদারদের সঙ্গে সংঘর্ষ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, দেশ বিভাগ, বিভাগোত্তর কৃষক আন্দোলন—এ সমস্ত কিছুই যেন ঐতিহাসিক মূল্যবোধ নিয়ে এই গল্পগুলির দেহে বিচরণ করছে। করছে বলেই গল্পগুলি আজ জীবন্ত ইতিহাস হয়ে উঠেছে।

তৎকালীন পত্র-পত্রিকা—'পরিচয়' 'নতুন সাহিত্য' 'স্বাধীনতা' 'ছোটগল্প' এবং বিভিন্ন সংকলন থেকে সংগ্রহ করে গল্পগুলি এই সংকলনে নিয়েছি। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও জায়গার অভাবে অনেকের গল্প সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হল না, সেজন্যে স্বাভাবিক ভাবেই আমি দুঃখিত। এই সংকলন করতে যাঁদের সহযোগিতা বিশেষভাবে পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই বন্ধুবর সলিল সাহার নাম উল্লেখ করতে হয়। বলা যেতে পারে, আমার সহযোগী হয়েই তিনি এই সংকলনের জন্যে কাজ করেছেন। শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী শ্রীসুশীল জানা নানা রকম

পরামর্শ দিয়ে এই সংকলকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। শ্রীমতী মণিকা সাহা এবং মিতা সুর প্রেস কপি করে দিয়ে আমার পরিশ্রমকে অনেকখানি লাঘব করেছেন। তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প এই সংকলনে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে সংকলন সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ গল্পকার শুধু তাঁদের গল্প প্রকাশের অনুমতি দিয়েই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেননি, বিভিন্নভাবে এই প্রয়াসকে আন্তরিকতার সঙ্গে সমর্থনও জানিয়েছন। এই সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন এবং আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। সময়াভাবে এবং বিভিন্ন কারণে, এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত যে কয়েকজন গল্পকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি, আমার বিশ্বাস তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন না বরং আমার এই কাজকে আন্তরিক ভাবে সমর্থনই জানাবেন বলে আশা রাখি।

সব শেষে যাঁর কথা একান্তভাবে বলা দরকার, তিনি হচ্ছেন সে দিনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধী প্রধান। এই সংকলনের জন্যে তিনি একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে শুধু আমাকেই ব্যক্তিগত ভাবে নয়, আজকের তরুণ পাঠক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদেরও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলেন।

কমলেশ সেন

রমেশচন্দ্র সেন	৮	ভবানী সিংহের কিসারী
সোমনাথ লাহিড়ী	২৩	কামরু ও জোহরা
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য	৪৯	মন্ত্রশক্তি
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৯	ছিনিয়ে খায়নি কেন
মনোরঞ্জন হাজরা	৮৩	ঠিকাদার
সুশীল জানা	৯৭	বউ



সূচী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১১১	বন্দুক
ননী ভৌমিক	১২৩	আগন্তুক
সুধীর করণ	১৪৯	শপথ
সলিল চৌধুরী	১৬৩	চাল চোর
গোলাম কুদ্দুস	১৭৭	লাখে না মিলয়ে এক
উমানাথ ভট্টাচার্য	২০৭	সাদাকুর্তা
আলাউদ্দীন আল-আজাদ	২১৯	সুন্দরী

মিহির আচার্য	২৩৫	দালাল
মিহির সেন	২৪৭	হাউষ
অরুণ চৌধুরী	২৬৩	হালাল
আবু ইসহাক	২৮৩	জোঁক
ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	২৯৫	সামনে চড়াই
সৌরী ঘটক	৩০৭	অরণ্যের স্বপ্ন
মুনীর চৌধুরী	৩২৭	খড়ম
জহির রায়হান	৩৩৭	বাঁধ
সরোজ দত্ত	৩৪৭	বাঘের বাচ্চা

গ্রাম বাংলার গল্প
গ্রাম বাংলার গল্প
গ্রাম বাংলার গল্প
গ্রাম বাংলার গল্প
গ্রাম বাংলার গল্প
গ্রাম বাংলার গল্প
গ্রাম বাংলার গল্প
গ্রাম বাংলার গল্প
গ্রাম বাংলার গল্প

ভবানী সিংহের ফিশারি

রমেশচন্দ্র সেন



রমেশচন্দ্র সেন দরদী গল্পকার, উপন্যাসিক। জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। তথাকথিত উচ্চশিক্ষার কোন্ ডিগ্রী তাঁর ছিল না। প্রথম জীবনে পারিবারিক বৃত্তি কবিরাজী শুরু করলেও, বেশীদিন তিনি ঐ বৃত্তিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন নি। চলে আসেন সাহিত্যের জগতে। অত্যন্ত কাছ থেকে যে মানুষ এবং জগতকে তিনি দেখেছেন দরদী মন দিয়ে সাহিত্যে তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাস 'কাজল' এবং দাঙ্গার ওপর লেখা গল্প 'সাদা ঘোড়া' তাঁকে খ্যাতির উচ্চসীমায় পৌঁছে দেয়। দেশ ভাগ এবং ছিন্নমূল মানুষদের নিয়ে লেখা 'পূব থেকে পশ্চিমে' একটা অসাধারণ উপন্যাস। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লেখক। এই গল্পটি ১৩৬২ সালের শারদীয় স্বাধীনতায় প্রকাশিত হয়

অন্ধকার রাত। উপরে আকাশের বুকে অগণন জরির বুটি জ্বলজ্বল করছে। নিচে নদীর বুকে চলেছে ঢেউয়ের নাচন, জলো ফণা তুলে লাখো লাখো সাপ জলের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। এদিক থেকে বাতাস আসছে গাছের পাতায় শিহরণ জাগিয়ে, মৃদু গুঞ্জন তুলে। ডাল-পালা লতাপাতা কাঁপছে, মনে হয়, ট্যাবলো করছে তারা—মাঝে মাঝে কথা দিয়ে জোড়া বিচিত্র এক গীতি অভিনয়।

বাঁধের উপর কালো কালো কতগুলি মূর্তি—তারা নড়ছে, চলাফেরা করছে। শুক্র কিম্বা মঙ্গল গ্রহের পণ্ডিতরা হয়ত দুরবীন দিয়ে দেখছেন কতগুলি পোকা, গভীর গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করছেন যে, এগুলি নীচ জাতীয় কোনও জীব। এদের সবচেয়ে বড় কাজ নিজেদের মধ্যে হানাহানি করা।

পোকা নয়, একদল মানুষ, মুখের ও পায়ের কাদা ধুয়ে ফেলেছে বটে কিন্তু অনেকেরই কাপড়ে গামছায় কাদার দাগ, পাশে রয়েছে কোদাল, খন্তা, মাটি মাখানো ঝুড়ি। দুপুর থেকে তারা অপেক্ষা করছে ভবানী সিংহরায়ের জন্য।

কলকাতার বিরাট ব্যবসায়ী, সিংহরায় গঙ্গার পারে পাঁচশ বিঘা জমি নিয়ে ফিশারি করছে। মাটি কেটে কেটে ভেড়ি বাঁধছে। ভিতরে হবে ছোট ছোট খাল। বাঁধে নালা কেটে নদী থেকে জল আসবে—জলের সঙ্গে আসবে মাছ।

কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, এই সময় আজ দুপুরে এক বিপদ ঘটল, মজুর শ্রীধরের পা কেটে গেল। গোমস্তা জন্মেজয় তলাপাত্র তখনই কলকাতায় লোক পাঠিয়েছে সিংহরায়কে নিয়ে আসার জন্য।

কাজ সেই থেকে বন্ধ। মজুরেরা বাবুর জন্যে অপেক্ষা করছে। তিনি এলে সবাই গিয়ে শ্রীধরের আরও ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থার কথা বলবে, ক্ষতিপূরণ চাইবে, আর জানাবে নিজেদের অভাব অভিযোগ।

কিছুদিন থেকেই শ্রীধরের শরীর ভালো ছিল না, জ্বরভাব, মাথা-ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি। কাজে না এলে ছেলে মেয়ে বউ উপোস করে, তাই অপটু শরীর নিয়েও আসে।

অরের জন্য কোন কোন দিন ভাত খেতে পারে না; আসে ছুটো চিঁড়ে-মুড়ি মুখে দিয়ে। খন্তা দিয়ে চাক্‌চাক করে মাটি কাটে। মাটি বোঝাই ঝুড়ি মাথায় করে দশবারো হাত উপরে এসে বাঁধের উপর মাটি ফেলে। প্রতিবারই কুলকুল করে সারা শরীর দিয়ে ঘাম ঝরে, হাঁপ ধরে।

আজ ছুপুরে বাঁধে এসে প্রায় উঠেছে এমন সময় তার মাথা ঘুরে গেল, কেমন যেন কালো হয়ে গেল চারদিক। শ্রীধর ডান হাতখানা বাড়িয়েছিল কিন্তু শূন্যে কোন অবলম্বন মিলল না। বেচারা গড়িয়ে এসে পড়ল একেবারে বারোহাত নিচে গুপলুর খন্তার তলায়।

খন্তার ডগায় মাংসের টুকরো ঝুলছে, রক্ত পড়ছে টুপটুপ করে, পাশেই একটা মানুষ কে যে পড়ল, রক্ত কার—গুপলু তা লক্ষ্য করল না। রক্ত দেখেই গাঁক গাঁক শব্দ করে মৃগী রোগীর মতোন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

চীৎকার উঠল খুন খুন। লোক ছুটে এল চারদিক থেকে। শ্রীধর প্রথমটায় কিছুই অনুভব করতে পারেনি। ভিড় দেখে, রক্ত দেখে চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই যাতনায় মুখখানা গেল কুঁকড়ে। জিব বার করে ইসারা করল—জল।

বাঁধের উপর খড়ের চালা, গোমস্তার বিশ্রামের ঘর। চালার তলায় শ্রীধর শুয়ে আছে। আড়ায় ঝুলানো হারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় দেখা যাচ্ছে তার ফ্যাকাসে মুখ, খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি। রক্ত ক্ষরণের ফলে বিকাল থেকেই জ্ঞান নেই, পাশে বসে তার স্ত্রী সর্ব। অর্থহীন চাহনি।

কি যে হয়ে গেল কিছুই যেন বুঝতে পারছে না। স্বামীকে পাখা করতে করতে ঝিমিয়ে পড়ে, একটু পরেই উঠে হয়ত ডাকে, শুনছো।

কোলের মেয়েটি তার বুকের মধ্যে। মায়ের স্তনের শুকনো বোঁটা চুষতে চুষতে একবার ঘুমিয়ে পড়ে, ক্ষুধার জ্বালায় একটু পরেই আবার ট্যাঁ ট্যাঁ শুরু করে দেয়। সর্ব ধমক দেয়, দূর—রাক্ষসী। কখনও বা চড়টা চাপড়টা মারে।

চার পাঁচ বছরের একটি ছেলে শ্রীধরের পায়ের কাছে ঘুমিয়ে, আর তাদের বড় ছেলে ঘরবার করছে, একবার বাইরে যায় আবার ভিতরে বাপের কাছে এসে বসে, তার কপালে, মুখে, গায়ে হাত বুলোয়।

বছর এগার বারো বয়স, নাম দুলু। শ্যামবর্ণ টকটকে সুন্দর মুখশ্রী, মাটি কাটা মজুরের ঘরের এ এক বেনিয়ম।

বাইরের জনতার মধ্যে বেশির ভাগই ছিল সিংহরায়ের মজুর। কয়েকজন এসেছে মাতব্বর, আর দু' একটি কৌতূহলী। যেখানে যা কিছু ঘটুক না কেন মধুলোভী মক্ষিকার মতোন তারা সেখানেই এসে ভন্ ভন্ করে।

বাইরে দুলুর ঘন ঘন ডাক পড়ে। শুভার্থীরা পরামর্শ দেয়, বাবু এলে কি বলতে হবে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখতে চায়। একজন বলল, চীৎকার করে কাঁদবি, আপনি আমার মা বাপ।

দুলু বলল, আমার বাবা ত'ই।

শুভার্থী উপদেশ দিল, বড় লোককেও বাবা বলতে হয়।

দুলু বলে, ইস্!

তা-না পারিস বলবি, দুবেলা খেতে পাই না। আপনি আমাদের খেতে দিন, বাঁচিয়ে রাখুন।

কেন, কালও ত দুবেলা খেয়েছি। রোজই খাই।

মাতব্বর গুরুচরণ সম্পর্কে দুলুর মেসো। সে বলে উঠল, হা-হা হারামজাদা বিচ্ছু। ও—ও আমাকেই বলতে হবে দেখছি।

ঠিক সময় রওনা হলে বাবু নটার আগেই আসতে পারতেন। দশটা, এগারটা বেজে গেল এখনও তাঁর দেখা নেই। লোকগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার আগে থেকে ভিড় জমে আসছিল, এবার আরও দ্রুত কমতে লাগল। গুরুচরণ বলল, ব-ব-ড় লোকের চলন তো, হাতির মতন আসছেন।

গোমস্তা জন্মেজয় একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করছিল। ভেড়ি, মাছের কারবার, তা থেকে মৎসগন্ধার কাহিনী।

ডাক্তার বলল, দেখবেন তলাপাত্র মশাই, আমি যেন ফাঁকিতে না পড়ি। গরীব মানুষ, দুপুর থেকে এই জায়গায় আটকে আছি।

তা দেখব বই কি। বাবুকে বলে আপনাকে যদি খুশি করিয়ে দিতে পারিতো আমায় কি দেবেন ?

সে হবে'খন।

হবে'খন নয়। কথাটা আগে থেকেই পরিস্কার করে নেওয়া ভালো। ঠিক এই সময় সামনের পিচের রাস্তার উপর পড়ল আলোর সুতীক্ষ্ণ ফলা, লোকগুলোর চোখ যেন ঝলসে গেল।

নাকে পাঁসনে, মুখে সুবৃহৎ বার্মা, গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে হরিণের চামড়ার জুতো। ঘাড় বাঁকাতে বাঁকাতে স্থূলবপু সিংহরায় গাড়ি থেকে নামল। পিছনে শ্মশ্রুল দেহরক্ষী, দেখলে মনে হয় লোকটা মাথায় ও মুখে যেন এক রাশ জঙ্গল বেঁধে চলেছে।

জনতা গাড়ির ধারে ধারে এসে ভীড় করে। সকলেরই চেষ্টা কি করে বাবুর নজরে পড়বে।

বাবু মহাশয়।

পে—পে—পেন্নাম, আমি গুরুচরণ মাতব্বর।

জন্মেজয়ও ছুটে এসেছিল। ভবানী আর কোন দিকে না তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, লোকটি আছে কেমন, যার পা কেটেছে ? কি যেন নাম ? ওঃ শ্রীধর। অজ্ঞান হয়ে আছে ? রক্ত বন্ধ হয়েছে তো ?

ডাক্তার পিছন থেকে বলে উঠল, ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে রক্ত বন্ধ করেছি স্যার। এখনও ঘণ্টায় ঘণ্টায় চলছে কোরামিন, গ্লুকোজ, এড্রিন্যা—

ও, নমস্কার। আপনিই ডাক্তার—বাবু ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পুরোনো আর জি কর, নাইন্টিন থার্টিন।

তলাপাত্র বলল, খুব প্র্যাকটিশ ওর। এ অঞ্চলে বিধেন ডাক্তার।

ভবানী জিজ্ঞাসা করল, যার খন্তার কোপে শ্রীধরের পা কেটেছে সে কোথায় ?

গুরুচরণ মুখ বাড়িয়ে বলল, বে—বে—বেটা-গো-মুখ্খু, না জিজ্ঞসে করে পালিয়েছে। মরুক গিয়ে খুনের দায়ে।

ভাবানী বলল, যে করে হক শ্রীধরকে বাঁচাতে হবে ডাক্তারবাবু। টাকার জন্য ভাববেন না।

তা জানি, প্রাণটা আশা করি রক্ষা পাবে।

ডান পা খানা?

সেপসিস না হলে পাও থাকবে।

তুলু বলে উঠল, সেপসিস কর না ডাক্তারবাবু। খোঁড়া করো না বাবাকে, তোমার পায়ে পড়ি।

না রে ছোঁড়া ভয় নেই। সায়েন্সে যতটা আছে তা করতে কোন কসুর করব না। তোর বাপের পা থাকবে।

ওঃ, এটি শ্রীধরের ছেলে বুঝি? বলেই তাকে কাছে টেনে নিয়ে ভবানী তার মাথায় হাত বুলোয়।

সুবেশ মোটরারোহী মোটাসোটা বাবুর সহৃদয় ব্যবহারে তুলুর মন পুলকে ভরে উঠল। সে বলল, আমি বাবার ছেলে তুলু। সিষ্টিধর সাউ।

গুরুচরণ ধমক দিল, হু-হু, হুজুর বলে কথা কইবি।

নিজেদের দাবী পেশ করার জন্য লোকগুলো তুপুর থেকে বাবুর জন্যই অপেক্ষা করছিল কিন্তু এখন ভরসা করে কেউ দাবি জানাতে পারে না। চার পাশে চলে মৃত্ব গুঞ্জন।

চিকিচ্ছের খরচার কথাটা বল, মাতব্বর।

আর ক্ষতিপূরণ। যতদিন না সেরে ওঠে ততদিন ওর ছেলে বউর খরচা।

আমাদের বাড়তি মজুরী।

ভবানীর কানে টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসে।

সবই সে জানত। তলাপাত্র তাকে লিখেছিল, মজুরদের দাবি না মেটালে তারা কাজ বন্ধ করবে।

কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এমন সময় এই উৎপাত। আর ক'দিন গেলেই বাঁধটা উঠে যেত। বাঁধ না হলে বছরটা মাটি হবে। নষ্ট হয়ে যাবে হাজার হাজার টাকা। তাই কলকাতার বন্ধু পত্নীর জন্মদিনের উৎসব ফেলে সে চলে এসেছে। সে এইসব ভাবছে এমন সময় গুরুচরণ সামনে এসে বলল, জানেন বোধ করি যে মাটিতে রুধির পড়লে দেবতা

তু-তু-তরুষ্টু হয়।

কাশীপতি পিছন থেকে নাক বাড়িয়ে বলল, পশুর রুধির পড়লেই মা-মাটি কল্ কল্ করে জল দেন্। এতো যে-সে পশুর রুধির নয়, মান্ষের।

ধনীর কাছে নিজেদের স্বার্থের প্রসঙ্গ তোলার আগে মাতব্বররা ভূমিকার অবতারনা করল তাকে খুশি করার জন্য, কিন্তু সিংহরায় সে কথা কানেই তুলল না। সে তখন সবাইকে শুনিয়ে গোমস্তা আর ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করছিল কি করে শ্রীধরকে সারিয়ে তোলা যায়, তারা সংসার কি ভাবে চলবে এই সব।

সর্বকে বঁলল, আমি তোমার সংসারের ভার নিলাম। কিছু ভেবো না মা।

পরক্ষণেই শ্রীধরের ডান হাতের কব্জির নিচে ধরে বসে রইল যেন ধ্যানী ধন্বন্তরি নাড়ী পরীক্ষা করছেন, মিনিট তিনেক ঐ অবস্থায় থেকে চোখ মেলে বলল, নাড়ী ভালো, জীবনের ভয় নেই। মনে হচ্ছে পা খানাও রক্ষে পাবে।

ঘোমটার ভিতর থেকে সর্ব তাকে দেখছিল, তার মনে হল, বাবু মানুষ নয়, দেবতা। কৃতজ্ঞতায় তার চোখ বাষ্পার্দ্র হয়ে উঠল। ইচ্ছা হল তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

ভবানী ঢুলুকে জিজ্ঞাসা করল, কি খেয়েছো তোমরা?

দুপুরে পান্তাভাত, মালঞ্চশাক, লঙ্কা পোড়া।

—তারপর আর কিছু খাওনি?

ঢুলু মাথা নাড়িয়ে জানাল, না, আর খায়নি কিছু।

ভবানী গোমস্তার দিকে চেয়ে বলল, এসব তোমার দেখা উচিত ছিল, একরত্তি ছেলেমেয়েগুলো না খেয়ে রয়েছে।

এঁ্যা, এঁ্যা ভুল হয়ে গেছে স্যার। আপনার মতোন মাথা ঠিক রেখে তো আর……

ডোণ্ট ফ্লাটার। এখানে বাজার কি দোকান কিছু কাছে আছে?

গুরুচরণ বলল, কা-কা কাছে কোন দোকান নেই। বা-বাজার পোটেক দূর।

তোমাদের পাড়াগাঁয়ের এক পো'ত হু'মাইল। যাক্ বাজারে লোক পাঠিয়ে দাও, তলাপাত্র। ওদের জন্য খাবার নিয়ে আসুক।

তলাপাত্র আমতা আমতা করে, এত রাত্তিতে দোকান কি—

বেশী পয়সা দিয়ে দোকান খোলাবে। এদের জন্য দই চিঁড়ে মুড়ি আনিয়ে দাও। আর পেলে সন্দেশ রসগোল্লা।

বাপকে তুলু ভালোবাসে খুবই, কিন্তু সন্দেশ রসগোল্লার সম্ভাবনার আনন্দ বাপের পা কাটার দুঃখটাকে ছাপিয়ে উঠল। তার মনে প্রশ্ন জাগল, বাবার অসুখ সারা অবধি বাবু থাকবে তো, না হুট করে চলে যাবে ?

জনমেজয় গুরুচরণকে বলল, তুমি এদের জন্য চিঁড়ে মুড়ি সন্দেশ রসগোল্লা আনিয়ে দাও, মাতব্বর। চার জনের যাতে ভালো করে হয়।

ভবানী দরজার কাছে এগিয়ে এসে গুরুচরণের হাতে গুটি কয়েক টাকা দিয়ে বলল, ভালোই হল। তুমি মাতব্বর মানুষ, দোকান ঠিক খোলাতে পারবে। আচ্ছা তোমরাও অনেকে এখানে আছ, মোড়ল মশাই। আমার লোকই হয়ত বেশী।

কাশীপতি বলল, আপনার লোকই, যারা নিজেরা কাজ করে না, তাদেরও ছেলে-ভাই ভাইপো আপনারই মজুর।

এখানে এখন মোট কতজন হবে ?

তা তিরিশ চল্লিশ জন হবে। ছিল আরও অনেক।

এই নাও আরও কিছু টাকা, তোমাদের জন্যও দই চিঁড়ে কলা গুড় আনাও। বলে ভবানী গুরুচরণের হাতে ঝন্‌ঝন্ করে আরও কিছু টাকা ঢেলে দিল। শব্দ হল আগের বারের চেয়ে অনেক জোরালো। তারপর জিজ্ঞাসা করল, হবে-এতে ?

গুরুচরণ বলল, নি-নি-নিশ্চয় হবে। সে চলে যায়। বাইরে জনতার মুখে মুখে চলে বাবুর প্রশংসা, মেজাজ বটে, এঁর কাছে সব বিষয়েই সুরাহা হবে।

আর একদল করে ফলারের হিসাব, চিঁড়ে দই কলার দাম। মাথাপিছু দই কতটুকু পড়বে, এই সব।

ভবানী শুনছে সবই। আর বসে বসে শ্রীধরকে হাওয়া করছে।

প্রথমে যখন পাখা করতে আরম্ভ করে তখন কাশীপতি বলেছিল, আমরা থাকতে আপনি কেন, কত্তা ?

শ্রীধরের পা কেটেছে সেত তারই অপরাধে এইরূপ ভাব করে সিংহরায় বলল, আমাকেও একটু করতে দাও। তোমরা তো অনেক সেবা করেছ, আরও করবে।

ইন্‌জেক্‌শনের সময় শ্রীধরের শিরা যাতে ভালো করে ওঠে, সেই জন্য ভবানী তার বাহু চেপে ধরেছিল, কাশীপতি বলল, দেখেছ বাবু ডাংদারি কবিরাজীও জানে।

খাবার এল। তুলুদের দিয়ে সন্দেশ রসগোল্লা কয়েকটি অবশিষ্ট ছিল। গুরুচরণ বল্‌ল, ও-ও কটা আপনার ভোগে লাগান। আপনিও হয়ত—

সে কী হে। আমার ভোগে কেন ? ছেলে-ছোকরারা যারা আছে তাদের বরং একটা করে দাও।

তুলুর চিঁড়ে দেওয়া হয়েছিল চালার তলায়।

সে এসে বাইরে বড়দের সঙ্গে খেতে বসল। বড়রা খাচ্ছে, গল্প করছে। কেউ বলছে, আর একটু দই হবে না গুরুদা ?

আমার কলাটা বড্ড ছোট হয়ে গেল। কি দই করেছে দেখছ। দোখ্‌নের নাম হাসাল।

জোচ্চোর—পাকা জোচ্চোর। আবার বোড ঝুলিয়েছে ঠাকুর ছিরি ছিরি রামকিষ্টের নামে।

ভবানী এবার বেরিয়ে এসে বলল, তোমরা খাচ্ছ, বেশ বেশ। পেট পুরে খাওয়ার ব্যবস্থা আজ করতে পারলুম না।

এখনি যাচ্ছেন নাকি হুজুর ? —আঙুলের দই চাটতে চাটতে মনি শীল প্রশ্ন করে।

গুরুচরণ বলল, আ—আমাদের আরজি ছিল। কাশীপতি বলল, শ্রীধরের সবই আপনি করবেন তা বুঝেছি তবে আমাদের রোজ—

রোজ মজুরি দু'আনা করে বেশী। আসতে এক লহমা দেরি হয়ে গেলেই গোমাস্তাবাবু আধ রোজের মাইনে কাটে। এর পিতিকার চাই।

এঁ্যা! আধ রোজের মাইনে নাকি, তলাপাত্র সে কী কথা ?

তলাপাত্র নিচু গলায় বল্ল, আপনারই হুকুম ছিল।

সিংহরায় এবার উচ্চকণ্ঠে বলল, দু'এক মিনিট দেরী হলে গোমস্তা বাবু মাইনে কাটবেন না, ওকে বলে গেলুম, তোমরা মন দিয়ে কাজ করো।

কাশীপতি বলল, আমাদের বাড়তি মজুরির—তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ভবানী বলল—কারবারে নেমে অবধি খালি খরচই করে যাচ্ছি। তার উপর আবার খরচা বাড়ল। কে জানে শ্রীধরের চিকিৎসার জন্য কত লাগবে। ওর পরিবারকেই বা সাহায্য করতে হবে কতদিন ? ও সেরে উঠলে তখন বাড়তি মজুরির কথা ভাবা যাবে।

মণি শীল বলল, তার আগেইতো কাজ ফুরিয়ে যাবে, কর্তা।

না, না, তা হবে না। আমাদের সকলের উচিত এখন শ্রীধরের কথা ভাবা, ওকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করা।

কাশীপতি বলল, সে কথাটা ঠিক। ওর ভাবনাটাই এখন বড়।

কেষ্ট বাগল বলে উঠল, তাই বুঝি দই চিঁড়ে সাপটাচ্ছ, মোড়ল ?

আঁতে ঘা লাগল, সকলের। অনেকেই সমস্বরে প্রতিবাদ করল, এ তোমার অন্যায় কেষ্ট ধন।

একজন বলল, দই চিঁড়ের সঙ্গে সঙ্গে ছিরুর কথাও ভাবছি।

ওঠে হাসির লহর। চলে কথা কাটাকাটি। সিংহরায় ডাক্তারকে বলল, একটু সুস্থ হলেই শ্রীধরকে বোধ করি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

ডাক্তার বলল, হ্যাঁ স্যার, সেই ভালো, তবে, সবচেয়ে কাছের হাসপাতাল পাঁচ ক্রোশ দূরে। সেখানে পাঠাবার মতোন হলেই সব ব্যবস্থা করব।

গুপ্লুর খোঁজ কর তলাপাত্তর। তার দরকার হতে পারে। আর তোমাদের কথা আমার মনে থাকবে গুরুচরণ, কাশীপতি। সরকার মশাইকে বলে যাচ্ছি, উনি নিজেও বিবেচক লোক—বলে সিংহরায় যখন মোটর গাড়িতে উঠল মজুদের ফলার তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, রাত্রির অন্ধকারও কেটে আসছে, উর্ধ্বে মহাশূন্যের দীপগুলি নিভছে এক এক করে। আর রাত্রি জাগরণের শ্রান্তি ও দই চিঁড়ের আমেজে

মানুষগুলোর চোখও আসছে জড়িয়ে।

দু'তিন দিন মাটি কাটার কাজ চলল খুব জোর—সিংহরায় যেন তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছে। সবাই চায় তাকে খুশি করতে।

মনি শীল নিজে ভবানীর মজুর নয়। তার কিন্তু মনে হল পিঠ চাপড়ে দই চিঁড়ে খাইয়ে বাবু তাদের বোকা বানিয়ে গেছে। সে কাশীপতিকে বলল ব্যাপার সুবিস্তা মনে হচ্ছে না। বাবুটো যেন কলকাতার ভেল্কি খেলিয়ে গেল।

কাশীপতি বলল, ও আর পেকাশ কর না ভাই, তাহলে মাণ্যি মানত থাকবে না। মোড়ল আমরা।

গুরুচরণ বলল, না শীলের পো, বাবুর উপর তোমরা অন্যায় করছ। অমন দরাজ দিল তানার।

কিন্তু তাঁর ছেলেই একদিন খবর নিয়ে এল, ওরা ছিরু কা'কে গুরি গাঁয়ের হাসপাতালে পাঠিয়েছে মেরে ফেলতে। সেখানে ওযুধ ইন্‌জেক্‌শন সবই কিনে দিতে হয়। তার একটাও পড়ে না। এক দিনেই শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। বাঁচবে কিনা সন্দ।

সিংহরায়ের ঔদার্য সম্পর্কে আরও দু'এক জনের সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু এই খবরের পূর্ব পর্যন্ত তারা ভেবেছে, যাক ছিরুর তবুও একটা সুরাহা হল। যা অবস্থা হয়েছিল দুদিন পরে এমনিই শয্যা নিতে হত, চিকিৎসা হত না—পথ্য জুটতো না, চোখের উপর কচি কাঁচারা না খেয়ে মরত।

কেউ হয়ত বলে, বেচারার ডান পা খানা যদি যায়? সে জিজ্ঞাসা আর পাঁচটা কথার ভিড়ে চাপা পড়ে।

হাসপাতালের খবরে ক্ষোভের সৃষ্টি হল, শোনা গেল শ্রীধরের বাড়িতেও উপোস শুরু হয়েছে। মজুরদের রাগ হল বাবুর উপর, নিজেদের উপর, সুযোগ এসেছিল, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। তারা, দু'আনা বাড়তি [illegible] দু' আনা—আট-পয়সা যা তাদের কাছে অনেক। এমন পরিবার আছে বাপে ছেলেয়, খুড়ো-ভাইপোয় মিলে চার পাঁচজন মানুষ কাজ করে। [illegible] রোজ হত আট দশ আনা, বুনো মজুর পরিবারের [illegible]। বাবু দেয়



নি। তাদের বোকা বানিয়ে গেছে। শুধু তাদের নয় মোড়লদেরও। এ মোড়লদের আর রাখবে না তারা, বদলাবে। সকলের আগে বদলাবে তোত্‌লা গুরুচরণকে।

তারা ঠিক করল কাজ বন্ধ করবে, কোদাল খন্তা তুলবে না, বাবুকে জব্দ করবে। কিন্তু দু'একদিন আলোচনা চলতে না চলতেই তাদের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেল।

বাঁধ তৈরী হয়ে গেছে। মাটির তলা থেকে জল উঠছে কুলকুল করে। মা গঙ্গাও প্রসন্ন হলেন, নালা পথে জল আসতে লাগল ভবানী সিংহরায়ের খালগুলিতে, খালগুলি মিলে হল প্রকাণ্ড এক ঝিল। নালাগুলি দিয়ে মাছ আসতে লাগল।

আর এল বন্দুকধারী পুলিশ, কলকাতা থেকে কুর্কি কোমরে গুর্খা পাহারা, মজুরেরা করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

বছর তিনেক পরে, সিংহরায়ের ফিশারির ফলাও হয়েছে খুব। বাঁধের উপর বসেছে নতুন উপনিবেশ শ্রীপুর। নতুন বাজার বসেছে। ফিশারিকে কেন্দ্র করে বেশ জমেছে বাজারটা। শ্রীপুরের বাসিন্দা ছাড়াও আশে পাশের লোক আসে, কলকাতা থেকে ফড়েরা আসে মাছ কিনতে। ভিখারীও বসে কয়েকজন

সেদিন পাইপ টানতে টানতে অলস্টার গায়ে স্থূল বপু এক বাবু বাঁধের উপর ঘুরে ঘুরে নতুন কলোনি দেখছে, জল দেখছে, দেখছে মাছের বাজার।

এসবই তার, এই জমি, ঐ জল, ফিশারি, শ্রীপুর। তার সঙ্গে তিন চারজন লোক। একজনের দু'হাতে ঝুলছে বড় বড় কয়েকটি মাছ।

একটি গাছ তলায় বসে এক খঞ্জ ভিক্ষা করছিল। এইখানেই ছিল গোমস্তার বিশ্রামের ঘর। মাছ দেখে খঞ্জ বলে উঠল, বাঃ খাসা মাছ তো। এক একটা নিদেন পাঁচ সেরি, কালিয়া হবে বুঝি? খাবেন রাজাবাবু, ভালো করে তেল ঘি দিয়ে খাবেন।

শ্মশ্রুল দেহরক্ষী ধমক দিল, চোপ রও।

ও আমার রুধিরে পুরুষ্টু জীব। আমায় দুটো পয়সা দিয়ে যান হুজুর। কাল থেকে মা মরা ছেলে মেয়েগুলো না খেয়ে আছে।

রুধিরে পুরুষ্টু শুনে ভবানী সিংহরায় চেয়ে দেখে পা কাটা এক বৃদ্ধ, মাথার চুল সব সাদা, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে।

সে হন্ হন্ করে চলে যায়।

শ্রীধর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। পয়সা তো পেলই না, মাছগুলো যে তার রক্তে পুষ্ট বাবুর কানে হয়তো সে কথাও যায় নি। হায় ভাগ্য!

তখন রাজাবাবুকে সে চিনতে পারেনি। পরে শুনল।

দুদিন পরে কলকাতা থেকে হুকুম এল—সে আর ওখানে বসতে পাবে না।

শ্রীধর বুঝতে পারল না কি তার অপবাধ।

কামরু আর জোহরা

সোমনাথ লাহিড়ী



সোমনাথ লাহিড়ি রাজনীতিক হিসাবে সমধিক পরিচিত হলেও, সাংবাদিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক এবং অনুবাদকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। অবিভক্ত বাংলায় যাঁরা কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। শ্রমিক আন্দোলনকে সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে তিনি বহুকাল কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কাজ করেন। কলকাতা ট্রাম ওয়ার্কাস ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি একজন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র স্বাধীনতার একসময় সম্পাদক ছিলেন। তাঁর অনেক গল্প পরিচয় এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ছোট গল্প সংকলন 'কলিযুগের গল্প' সেই সময় ভীষণ সাড়া জাগিয়েছিল। এরেনবুর্গের 'নবমতরঙ্গ' এবং 'ক্যাপিটাল' এর কিছু অংশের অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিরিশের দশকে লেনিনের State & Revolution-এর অনুবাদ তিনি করেন। কিন্তু 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' নামকরণে বইটা বেআইনী হয়ে যাবার আশঙ্কায় 'রাষ্ট্র ও আবর্তন' নামে প্রকাশিত হয়।

কামরুন্নেসা আত্মহত্যা করাই স্থির করল।

মানুষের আত্মহত্যা করার নানান মত আছে। সেইজন্যেই কারণটা ঠিক করে বলা শক্ত। সাময়িকভাবে মাথা খারাপ হওয়ায় লোকে আত্মহত্যা করে বসে, এ হল ডাক্তারদের মত। কিন্তু কামরুন্নেসা ওরফে কামরুর মাথা খারাপ হয়নি। অন্তত কামরু তা মনে করে না। মাথা খারাপ হলে, ও ভাবে—ও বেঁচে যেত, দুশ্চিন্তায় তিলে তিলে জ্বলতে হত না। আত্মহত্যাও করতে হত না।

অবশ্য ডাক্তারী মত সকলে মানে না। আগে যারা আমাদের শাসনকর্তা ছিলেন তাঁদের মত অন্যরকম। আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তাঁরা ছ-মাসের জেল দিতেন—বলতেন, যে আত্মহত্যা করতে পারে, সে সবকিছু গোনাহ্ করতে পারে। কামরু কিন্তু আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন অপরাধ করতে পারে না। এমন কি একটা খুনও করতে পারে না। তা যদি পারতো, তাহলে কি সেদিন ঐ শুয়োরের বাচ্চাটাকে ও ছেড়ে দিত? পারেনি বলেই আজ তাকে আত্মহত্যা করতে হচ্ছে।

আজাদী পাবার পর আত্মহত্যা সম্বন্ধে আমাদের পাকিস্তানের উজীর ওম্‌রাহদের মত বদলেছে। বিশেষ করে সিভিল সাপ্লাই দপ্তরের মালিকদের। নিজেদের নাক কেটে হিন্দুরা যেমন পরের যাত্রা ভাঙে, তেমনি শুধু সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্যেই লোকে খুদকশী করে—এ হল তাঁদের মত। কিন্তু কামরু বেচারী খোদ সরকারকে বেকায়দায় ফেলবে কি, একটা সরকারী মোলাজিমকেও টিট্ করতে পারেনি। যদি পারত, তাহলে আজ তার খুদকশীর ফিকির করতে হত না।

কামরু অবশ্য এতসব মতামত জানে না। ও শুধু জানে যে ও আর পারছে না। সারা দেমাক দিয়ে ভেবে ভেবেও ও কোন কুলকিনারা দেখতে পাচ্ছে না। তার চেয়ে ডোবা ভালো, সব ঝঞ্ঝাট চুকে যাবে তাই আত্মহত্যার সঙ্কল্প ওর মগজে দানা বেঁধেছে।

আত্মহত্যার পেছনে আপনারা স্বভাবতই একটা 'অজীব ও গরিব কিস্‌সা' কল্পনা করেন। কামরুর কিস্‌সা গরিব বা করুণ হতে পারে,

কিন্তু তাতে অজীব অথবা আশ্চর্য কিছু নেই, ওর মতো বদকিস্‌মতী আজকাল হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়।

বর্ধমান না ২৪পরগনা, পশ্চিম বাংলার কোন্ এক জেলা থেকে কামরুরা পাকিস্তানে আসে। একমাত্র রোজগেরে ভাইটা আসতে পারেনি, কারণ ওখানেই দাঙ্গায় ফৌত হয়ে গিয়েছিল। অথর্ব বুড়ো বাপ-মা চাচী পক্ষাঘাতগ্রস্ত চাচা আর অনেকগুলি অপোগণ্ড ভাইবোন—দেশের সম্পত্তি বিক্রি করা সামান্য টাকা আর ক দিন চলে? শরমের মাথা খেয়ে কামরুকেই বার হতে হল রোজগারের তল্লাশে।

সামান্য লেখাপড়া জানা কামরুকে কে চাকরী দেবে? বাংলা ও ভালোই জানে বটে, কিন্তু প্রজাদের ভাষায় তো রাজকাজ চালানো যায় না, তাহলে রাজায় প্রজায় তফাৎ থাকে কই? কাজেই কামরু কাজ পায় না, নাহক ঘুবে ঘুরে হায়রানি। শেষ সম্বল যা ছিল তাও বন্ধকের দোকানে বিকিয়ে গেল।

একদিন খবর পেল ওদের দেশের জোহা সাহেব এখানে পুলিশের বড় অফিসার, অনেক চাকরী নাকি তাঁর মুঠোয়। জোহা সাহেবের সঙ্গে খুব বেশী পরিচয় ছিল না। তবু ভয় সঙ্কোচ সব ঝেড়ে ফেলে কামরু একদিন সোজা ঢুকে গেল তাঁর অফিসের খাস-কামরায়। আর্দালীটা বাধা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু পঁচিশ ত্রিশ বছরের যুবতী মেয়ে দেখে কি জানি কেন জোর করেনি।

জোহা সাহেবের অফিসে অনেক লোক, অনেক কাজ। বহুক্ষণ বসে থাকার পর কামরু তার পরিচয় আর প্রয়োজন বলবার সুযোগ পেল। কাজের ভিড়ে অন্যমনস্ক জোহা সাহেব কিছু শুনলেন, কিছু শুনলেন না। আর একদিন আসতে বললেন। এমনি আসা যাওয়ায় ক'দিন গেল। জোহা সাহেব কখনো তার কথা শোনার সময় পান না, কখনও খানিকটা শোনেন। কখনও বা একটু দরদ দেখান, একটা কাজ হতে পারে বলে আশা দেন।

শেষ-দিন একেবারে ছুটির সময় গড়িয়ে গেল। সব কাজ শেষ করে,

সবাইকে বিদায় দিয়ে জোহা সাহেব অপেক্ষারত কামরুর দিকে চাইলেন। হাসি মুখে চাইলেন। আশায় কামরুর মনটা লাফিয়ে উঠল। সত্যই আশার কথা।

কাল তোমাকে পুলিশে চাকরী করে দেব; সব ঠিক করে রেখেছি,—জোহা সাহেব স্পষ্ট আশ্বাস দিলেন। আরও একটু দিলখোলা হয়ে বললেন,—চাকরী দেওয়া কি সহজ? কত উমেদার, কত বড় বড় লোকের চিঠি নিয়ে আসছে, কাকে ফেলি কাকে রাখি? তবে তুমি আমাদের ফাহিমের বোন, তোমার জন্যে একটা কিছু করতেই হয়। আহা ফাহিম বেঁচে থাকতে আমাদের ওখানে অকসর্ আসত, বেগম সাহেবা তাকে বড় ভালোবাসতেন।

একটু থেমে আরও মোলায়েম করে বললেন,—তোমার কথা শুনে তোমাকে দেখার জন্যেও বেগম সাহেবার বড় ইচ্ছে হয়েছে। যাবে তুমি? চল না আজ আমার সঙ্গে। পরে আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব।

কৃতজ্ঞ কামরু সহজেই রাজী হল। ওকে মোটরে তুলে নিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে চললেন জোহা সাহেব। প্রথমে গেলেন একটা বিলায়েতী হোটেলে। বললেন,—এস, আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

কত খানা! অত রকম খানা কামরু কখনো চোখে দেখেনি। আর তার সঙ্গে শরবত। ওঃ, সে যেন আগুনের শরবত, জিভ থেকে বুক পর্যন্ত ঝাঁঝে পুড়িয়ে দিয়ে যায়। দিলদরিয়া হাসিতে সমস্ত ভয় দূর করে দিয়ে জোহা সাহেব গ্লাসের পর গ্লাস তার মুখে তুলে দিলেন। বললেন,—এ হল আসল হেকিমী শরবত, তাকত আর কুওতের ফোয়ারা। পুলিশে কাজ করবে, তাকত না হলে চলে?

পা থেকে মাথা পর্যন্ত কামরুর সমস্ত রক্ত তোলপাড় করে উঠল। মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। জোহা সাহেব হাত ধরে ওকে গাড়িতে ওঠালেন।

কোথা দিয়ে কোন বাড়িতে জোহা সাহেব নিয়ে গেলেন, কামরু তা এখনও মনে করতে পারে না। আধা-বেহোশ সেই মুহূর্তগুলির মধ্যে শুধু একটা দুঃস্বপ্নই তার সমস্ত স্মৃতিতে রগরগিয়ে আছে। জাপটে জড়িয়ে ধরে জোহা যখন তার শেষ সর্বনাশ করতে যাচ্ছে, তখন একবার

সমস্ত সত্তা নিয়ে সে জেগে উঠেছিল। দুর্বল মুষ্টি দিয়ে, দাঁত আর নখ দিয়ে সে যুঝেছিল। কিন্তু পারেনি, আবার শ্লথ হয়ে ঢলে পড়েছিল। পারেনি, পারেনি, জানোয়ারটাকে সে রুখতে পারেনি।

পরদিন ডাকে অবশ্য ও পুলিশে চাকরীর নিয়োগ-পত্রটা পেয়েছিল। জোহা সাহেব খোশরাতের বখ্‌শিস্‌ দিতে ভোলেননি। কে বলে আমাদের পাকিস্তানে ইন্‌সাফ নেই ?

চাকরির চিরকুটটা যেন কামরুর কলঙ্কের ইশ্‌তেহার। অক্ষরগুলো ঘেন্নার কালি দিয়ে লেখা। নখে টিপে ধরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল কামরু।

পারেনি। অপোগণ্ড ভাই বোনগুলো কাঁদছে, দুদিন ধরে ওরা শুধু মাড় খেয়ে আছে। অর্থব বুড়ো বাপ ছেঁচড়ে ছেঁচড়েই রাস্তার মোড়ে মাল ফেরি করতে গিয়েছিল। পুলিশ-হল্লা এসে সব মাল কেড়ে নিয়ে গেছে, নেহাত বুড়ো বলে হাজতে পোরেনি। দুঃখে ভয়ে আব্বাজানের ভিমরি লেগে গেছে ; আম্মা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর মুখে পানির ঝাপট দিচ্ছেন। অসুস্থ চাচা আজ দুদিন ধরে নাড়ীর যন্ত্রনায় অনবরত চিৎকার করছে ; কিন্তু আট-আনা পয়সাও নেই যে মালিশেব ঔষধটা আনিয়ে যন্ত্রনার উপশম করে।

পারেনি কামরু চিরকুটটাকে ছিঁড়ে ফেলতে। চোখের জল শুকিয়ে ফেলে সে পুলিশ অফিসে হাজির হয়েছিল চাকরী করতে।

তাও তো ভা'ব চাকরী! অ্যাসিস্টেণ্ট সাব ইনস্পেকট্রেস, শাদা বাংলায় জমাদারনী। গোয়েন্দা অফিসে মেয়ে আসামীদের পাহারা দিতে হবে। মাইনে ষাট টাকা।

এতগুলো প্রাণীর সংসারে ওতে দুবেলা ভাতের সংস্থানও হয় না। তবু কামরু লড়াই ছাড়েনি। হা-হা করা পুড়ন্ত মনটাকে পাথর বানিয়েছিল—দেখি যে কদিন সইতে পারি!

কিন্তু মাস দুই পরে যে দিন ও চমকে উঠে নিশ্চিত করে জানল ঐ জানোয়ারের ভ্রূণ ওর পেটের ভিতর তিলে তিলে ওর হৃদপিণ্ড শুষে বড় হচ্ছে—সেদিন ও আর পারল না। আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন উপায় দেখল না।

তবু কামরু শেষ চেষ্টা করেছিল।

ও শুনেছিল, লুকিয়ে চুপি চুপি ভ্রূণ নষ্ট করা যায়। কিন্তু পাঁচ সাত শো টাকা লাগে, অনেক কারসাজি লাগে। দুবেলা ভাত জোটে না, অত টাকা কোথায় পাবে? ক্ষতবিক্ষত দিলটাকে ও শেষবারের মতো দুহাতে চেপে ধরল। চূড়ান্ত পরাজয়ের কালি ওর সমস্ত রক্ত কেড়ে নিল। দাঁতে দাঁত চেপে একদিন গিয়ে দাঁড়াল জোহা সাহেবের দরজায়—সাহায্যের প্রার্থনা জানাতে।

জোহা সাহেব ওকে চিনতেও পারলেন না, দুয়ার থেকেই ফিরে আসতে হল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথার শিরাগুলো কি ছিঁড়ে গেল? গোনাহ্‌গারির বীজাণুগুলো কি রক্তের মধ্যে মাতাল হয়ে উঠল? জানি না। শুধু এই জানি যে, জিন্দগীর বোঝা বয়ে চলার ও আর কোন কারণ খুঁজে পেল না।

কি করে আত্মহত্যা করবে। গলায় দড়ি দেবে? অন্ধকার রাত্রে নদীর নীচে তলিয়ে যাবে? রেলগাড়ির চাকার তলে মাথা পেতে দেবে? না আজকাল যেমন মাঝে মাঝে শোনা যায়, আফিস বাড়ির তেতলা থেকে রাস্তার পাথরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? সুঠাম নারীদেহটা মুহূর্তের মধ্যে বিকৃত হয়ে যাবে একটা বীভৎস রক্তমাংসের পিণ্ডে?

ভাবতে ও শিউরে উঠল। আবার, হাসি পেল। বাতি যদি চিরদিনের মতোই নেভাতে হবে, তবে কতখানি কালি পড়ল ভেবে লাভ কি?

কিন্তু যদি না নেভে? ঝাঁপ দিয়ে তখনই যদি প্রাণ না যায়, আধা মরণের যন্ত্রনায় শরীরটা যদি কাতরাতে থাকে? না, না, সে যন্ত্রণা ভয়ঙ্কর মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। যন্ত্রণা ও সইতে পারবে না।

তার চেয়ে আফিং খাওয়া ভালো। তাতে কোন যন্ত্রণা হয় না ও শুনেছে। তন্দ্রা ছেয়ে যায় সারা চেতনার ওপর, ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুজে আসে। দুশ্চিন্তার সমস্ত জ্বালা মুছে দিয়ে যায় কালো রাত্রি—ঘুমের ভারী পর্দা ঢেকে দেয় জীবনকে। যন্ত্রনাহীন চরম মুক্তি।

মাথার মধ্যে ভাবনাগুলো দিনরাত স্থচ ফোটায়। চিন্তাতপ্ত কপালের ঘাম মুছে ফেলে আফিং খেয়ে মরাই স্থির করল। তখনকার মতো মন শান্ত হল।

দোকান থেকেই আফিং কিনে আনতে হবে, তাছাড়া উপায় কি? আফিংয়ের দোকানের পাশ দিয়ে কামরু ঘুরে এসেছে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। দেখেছে দু-একজন মেয়েছেলেও আফিং কেনে। বোরখায় আপদমস্তক ঢেকে ও কিনতে যাবে। কেউ চিনবে না, জানবে না।

আফিং কেনার টাকা জোগাড় করাও এক সমস্যা। মাইনের সবকটা টাকাই পয়লা তারিখে গুনে গুনে আম্মার হাতে তুলে দিতে হয়, তাতেও মাসের শেষ দিকে খাওয়া জোটে না। ওদের মুখের গ্রাস থেকে কি করে টাকা নেবে ভেবে ওর কপালের শিরা কুঁচকে উঠল। পরক্ষণেই আবার ঠোঁটের কোণে বিষন্ন হাসি জাগল। যখন থাকব না···মরে যাব (মরে যাব কথাটা উচ্চারণ করতে ওর এখনও বাধ বাধ লাগে), তখন ওদের মুখের গ্রাসের কথা ভাবব কি?

তবু ও টাকা চাইতে পারে না। কি বলে চাইবে? আম্মা দেবে কেন? একবার এগোয়, আবার পেছোয়। অনেক ভেবে কিনারা বার করল। পয়লা তারিখ মাইনাটা হাতেই রাখল। বাড়িতে বলে দিল কি এক কারণে এবারে ৭।৮ তাবিখে মাইনা হবে। নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, সাত-আট তারিখ আর আমাকে দেখতে হবে না। আজই আফিং কিনে আনব।

···গোয়েন্দা আফিসে মেয়ে আসামীদের পাহারা দিতে দিতে কামরু এই কথাই ভাবছিল—আজ আফিসের পর আফিং কিনে বাড়ি যাবে। মগ্ন চেতনার মধ্যে করুণ ক্ষীণ স্বর ভেসে এল: আমাকে একটু পানি দা—ও।

কামরু সম্বিত ফিরে পেল। এ ঐ নতুন আমদানী মেয়ে আসামীটার স্বর, থেকে থেকে ও শুধু এই একটা কথাই বলছে।

পুলিশের চাকরিতে কামরু এখনও কাঁচা। তাই মনটা মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে। আহা, উনিশ-বিশ বছরের মেয়েটা, কচি মুখ থেকে এখনও ছেলেমানুষির ছাপ মোছেনি! এ-বয়সে হাসবে-খেলবে, বাপ-মা-সওহরের

বুকে আনন্দের ঢেউ তুলে হাল্কা হাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াবে—তা না আবার এসব সিয়াসী হাঙ্গামায় জড়ানো কেন বাপু ?

আসামীর খাতায় মেয়েটির নাম লেখা আছে জোহরা। চার-পাঁচ দিন হল ওকে ধরে নিয়ে এসেছে। ইনস্পেক্টর সাহেবদের মুখে মুখে কামরু ওর বৃত্তান্তও কিছুটা শুনেছে। ওদের নেতা আনওয়ার নাকি সরকারের ভয়ঙ্কর দুশমন। কেবল লোক খেপিয়ে বেড়ায়। বলে, পাকিস্তান না খাকিস্তান, সরকারের মেহেরবানিতে গরিবের কপাল পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। জালিম সরকার কিসানের জমি কেড়ে নিয়েছে, দানা কেড়ে নিয়েছে, সোনার পাকিস্তানকে করেছে ভুখা নাঙ্গা। নামাও, নামাও এই সরকারকে টেনে নামাও, ফিরিয়ে আনো লুটেরাদের হাত থেকে কিসানের সোনার জমিন। উঠুক আজাদীর ঝাণ্ডা, অওআমের রাজ—বলে বলে চষে বেড়ায় পাকিস্তানের এ মুড়ো থেকে সে মুড়ো পর্যন্ত। কিন্তু কিছুতেই পুলিস তাকে ধরতে পারে না। ওর মাথার জন্যে পাঁচ হাজার টাকার ইনাম জারি হয়েছে তবু ধরা পড়ে না। খবরও কেউ ফাঁস করে না। শালা রুশিয়া থেকে যাদু শিখে এসেছে···যাদু,—ইনস্পেক্টর সাহেব বলেন বিরক্ত হয়ে।

জোহরার উপরও সাহেবদের খুব রাগ। সামান্য কিসান মেয়ে ওকে তো পুলিশ চিনত না। সেই সুযোগে ও নেতাদের নিজের ঘরে লুকিয়ে আশ্রয় দিত, এখান থেকে ওখানে খবরাখবর নিয়ে যেত, আর গোপনে লোকের ভেতর ছড়াত আগুনে ইশ্‌তেহার।

কিন্তু অফিসের সাহেবদের এবার আশা হয়েছে। ঐ মেয়েটা সব জানে, ওর কাছ থেকে বার করতে হবে ওর নেতাদের হদিশ। একটা সামান্য জাহিল কিসান মেয়ে, ওকে জব্দ করতে কতক্ষণ ? 'বাপ বাপ' করে সব বলবে।

তবু শুধু মুখের কথায় ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে কাজ হয়নি। ও কোন কথার জবাব দেয় না, খালি বলে—আমি কিছু জানি না। আমি ঘরে যাব গো।

প্রথম দিকে ওরা অমন করে, খানিকটা তো ওদের শেখানো থাকে—ইনস্পেক্টর সাহেব বলেন। তাই এবার শুরু হয়েছে আসল দাওয়াইয়ের

পালা। আজ তিনদিন তিন রাত ওকে ডিগ্রিবন্ধ ফেলে রাখা হয়েছে—খানা বন্ধ, পানিও বন্ধ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও ছট-ফট করেছে, কিন্তু এক ফোঁটা পানিও পায়নি।

আবার জোহরার ক্ষীণ স্বরে ভেসে এল,—একটু পা···নি।

কামরু উঠে পড়ল। পাশাপাশি কটা অন্ধ কুঠরী তার নাম ডিগ্রি। এই কটাতেই কামরুর পাহারা। অবশ্য জোহরার ডিগ্রির সামনে স্বয়ং ছোট দারোগা তদারক করছেন। কামরু কাছে এসে দাঁড়াল।

মোটা লোহার গরাদে দেওয়া কবাট তালা বন্ধ। ভেতরে স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় একখানা ছেঁড়া কম্বলের উপর জোহরা বসে আছে। এক কোণে একটা শৌচের পাত্র। ব্যাস, ঘরে আর কিছু নেই, আছে শুধু ঐ উঁচু ছাত পর্যন্ত খাড়া পাথরের দেওয়াল সাদা চুনকাম করা।

বন্ধ কবাটের বাইরে জোহরার নাগালের বাইরে থরে থরে খাবার সাজানো, সোরাই ভরা ঠাণ্ডা পানি; গেলাসে গড়াবার জন্যে যেন উন্মুখ। ক্ষুধা আর পিপাসার বিবর্ণ জোহরার তৃষিত দৃষ্টি বারে বারে সেদিকে, কিন্তু পাবে না।

পানি? শুধু পানি কেন? খানা পাবে, সব পাবে,—মোলায়েম করে ছোট দারোগা বললেন.। দেখছ কত খানা! গরম ভাত আর তাজা পাকানো গোসত। ঠাণ্ডা মিঠা শরবৎ। সব পাবে শুধু আমাদের সওয়ালের জবাবটা দিয়ে দাও।

—কি বলব?

—বল আনোয়ার কোথায় থাকে? কোথায় আসে? এবার দলের আড্ডা হয়েছে কোথায়?

—আমি জানি না, আমি কিছু বুঝি না।

—তবে রে হারামজাদী! রাগের চোটে ঝপ করে গরাদের ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছোট দারোগা জোহরার চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেন। ঠকাস করে ওর মাথাটা লোহার শিকে ঠুকে গেল। ও নেতিয়ে পড়ল। কামরু আর ওদিকে চাইতে পারল না। চোখ ফিরিয়ে নিল।

—আরে আরে, কি করছ, বেচারীকে কষ্ট দিচ্ছ কেন? ডেপুটি

সাহেব হাজির হয়ে বললেন। এত মোলায়েম কথা শুনে কামরু শিউরে উঠল, এ কথার অর্থ ও জানে।

খোল, দরজা খোল,—বলে ডিগ্রিতে ঢুকলেন ডেপুটি। সব কিছুর জন্যে যেন ছোট দারোগাই দায়ী এমনভাবে তাকে ধমক দিলেন, ...আসামীকে কি তোমরা মেরে ফেলবে? দাও দাও, ওকে পানি দাও, খানা দাও।

বলে সত্যিই খানা পানি দিলেন। অবাক হয়ে জোহরা চাইল। তারপর একটুখানি খেয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কিছু ভেবো না তুমি। বিশ্রাম কর। শীগগিরই তুমি ছাড়া পাবে,—বলে মিষ্টি হেসে ডেপুটি চলে গেলেন।

ডিগ্রির বাইরে পায়চারী করে রাউণ্ড দিতে দিতে কামরু ভাবে—চাতুরীর ফাঁদে কি জোহরা ধরা পড়বে? আহা কেউ ওকে একটু হুঁশিয়ার করে দেয় না? থাকগে ওর মধ্যে মাথা গলানোর কি দরকার, নিজের ঘায়েই জ্বলছি...

নিজের কথা ভাবতেই কামরুব মনটা টনটন করে উঠল। তুনিয়ার আর সব কিছু গেল লেপে পুঁছে একাকার হয়ে। প্রাণটাকে শেষ করতেও এত হ্যাঙ্গামা? অভিশপ্ত জীবনের বাকী ক'ঘণ্টাই ওকে পাগল করে তুলছে।

সন্ধ্যায় অফিস থেকে ছাড়া পেতে না পেতেই পা বাড়াল আফিংয়ের দোকানের দিকে।

সর্বাঙ্গ বোরখায় ঢাকা। তবু ভাবে অত লোকের মধ্যে কি করে কিনব? গলার স্বরে যদি কেউ চিনে ফেলে? গলা দিয়ে স্বরই যদি না বার হয়?

দূর থেকে দেখা যায় দোকানের সামনে কোন ভিড় নেই। দেখে কিন্তু থমকে দাঁড়ায়। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে গেল কী কতগুলো এলোমেলো চিন্তা। অজানিতেই পা তুটো পিছন ফিরল, ফিরে চলল। আবার দাঁড়াল। কতক্ষণ পরে পা তুটোকে ঘুরিয়ে যেন টেনে টেনে নিয়ে চলল দোকানের দিকে।

দোকান বন্ধ। সাইনবোর্ডে লেখা আছে: গভর্নমেন্ট লাইসেন্সপ্রাপ্ত

আফিংয়ের দোকান। রবিবার ও ছুটির দিন ছাড়া প্রত্যহ সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোলা থাকে।

সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। পরদিন রবিবার তার পরও কদিন ছুটি আছে। এ ক'দিনই দোকান খুলবে না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল কামরুর বুকের ভেতর থেকে। ব্যর্থতার মনস্তাপে সে নিঃশ্বাস ভরা ছিল। কিন্তু শুধু তাই নয় হয়তো। দুঃসহ জীবনের মেয়াদ আরও কত ঘণ্টা বাড়ল ; কিন্তু যন্ত্রণায় গাটা রিরি করে উঠল না তো! আসার সময় ও এসেছিল চোখ বুঁজে, পথঘাট পৃথিবী কিছুই নজরে পড়েনি। ফেরার সময় দেখল শহরের আলো। বাতি জ্বেলে পিঠ দুলিয়ে দুলিয়ে ছেলেরা পড়ছে, মার হাতের তালে তালে দোলনায় খোকা হাসছে, মসজিদের গম্বুজের ওপাশ দিয়ে ধীরে ধীরে চাঁদ উঁকি মারছে···

রাতে, দিনে জোহরা ভালোই খেতে পেল। কেউ বিরক্ত তো করেইনি, উল্টে সাহেবের হয়ে তাঁর আর্দালী খোঁজ নিয়ে গেল ওর সঙ্গে কেউ গোলমাল্ করেনি তো ?

কিছু পরে ডেপুটি নিজে উপস্থিত। জোহরার পাশে ঐ ছেঁড়া কম্বলের ওপরই বসে পড়ে বললেন,—আহা এরা বড় কষ্ট দিয়েছে, না মা ? যাকগে তুমি ভেব না, কাল পরশুর মধ্যেই যাতে ছাড়া পাও তার ব্যবস্থা আমি করছি।

বিশ্বাস-অবিশ্বাস মাখানো সন্দেহের দৃষ্টি জোহরার চোখে। দেখে ডেপুটি হেসে বললেন,—বিশ্বাস হচ্ছে না ? সত্যিই তোমাকে ছেড়ে দেব। এখন তোমার কাছ থেকে জানবার কিছুই নেই, আনোয়ারের প্রধান সাকরেদ হাবিবই তো ধরা পড়ল।

—কবে ? কোথায় ? সব ভুলে কাতরে উঠল জোহরা।

এই তো কাল। পলাশ বাড়ীর কাছে,—বলে ডেপুটি কান খাড়া করে রইলেন।

—তা কি করে হবে ? তাঁর তো থাকার কথা বিরি···। আবেগে

বলতে বলতে হঠাৎ জোহরা দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরল।

—হ্যাঁ, বল বল কি বলতে যাচ্ছিলে, কোথায় তার থাকার কথা। আগ্রহে লাফিয়ে উঠলেন ডেপুটি।

—কই আমি তো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম না। তখন জোহরা সামলে নিয়েছে।

—কেন এই যে বলছিলে হাবিবের কোথায় থাকার কথা?

—আপনি ভুল শুনেছেন। হাবিব আবার কে?

ডেপুটির মুখ লাল হয়ে উঠল। সভ্যতা, ভদ্রতা, ইলমদারীর মুখোসটা খসে গেল মুহূর্তের মধ্যে। বেরিয়ে এল গোয়েন্দা অফিসার রূপ জানোয়ারের স্বমূর্তি। জঘন্য ইতর গালাগালিতে ফেটে পড়ল ডেপুটি,—বেজন্মা রাড়ী বেশ্যা মাগী। হাবিবকে নিয়ে থাকিস, আর তাকে চিনিস না! বল বল বলতেই হবে।

জোহরা লা-জওয়াব। জানোয়ারটা পাগলের মতো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল চড় ঘুষি মেরেই চলল। জোহরার ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ল, কিন্তু সে ঠোঁট দিয়ে শব্দ উচ্চারিত হল না আর একটিও।

ব্যর্থ ডেপুটি হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকল,—দরওয়াজা।

যে সিপাই দরজার কাছে থাকে তার ঐ পুলিশ নাম।

সেপাই ছুটে আসতেই ডেপুটি হুকুম দিল,—লাগাও খাড়া হাতকড়া। দেখব মাগী কতক্ষণ চুপ করে থাকে।

জোহরার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে ওকে দেওয়ালের কাছে হিড় হিড় করে টেনে আনল সেপাইটা। দেওয়ালে মাথার চেয়েও উঁচুতে আংটা লাগানো। জোহরার হাতকড়া বন্ধ হাত দুটোকে সেই আংটার সঙ্গে তালা দিয়ে আটকে দিল। দেয়ালের দিকে মুখ করে মাথার উপর হাত তুলে জোহরাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পাগুলো ঝিঁঝিঁতে ঝনঝন করবে, কাঁধ থেকে বাহু যেন মুহূর্তে মুহূর্তে ছিঁড়ে খসে খসে পড়তে চাইবে—কিন্তু ছুটি নেই যতক্ষণ না মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছে।

প্রথমে যখন অনেকক্ষণ ধরে পা দুটো ঝিঁঝিঁ করল, মনে হল

পায়ের চর্বি মাংস ভেদ করে রগরগে শিরাগুলোর উপর দিয়ে যেন ফোঁটা ফোঁটা গরম পানি গড়িয়ে যাচ্ছে। জটে জটে ফোস্কার জ্বালা। তখন ও লাফিয়েছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনবরত মাটিতে পা ঠুকেছিল, যতক্ষণ পারে।

জ্বালাটা উঠল। পায়ের শিরা বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠলো। কোমরের মাঝখানটা জ্বালিয়ে দিয়ে পিঠের পেশীগুলোকে আক্ষেপে কোঁচকাতে কোঁচকাতে। গভীর রাত্রে বাহু আর কাঁধের জোড়টা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে পড়ল। না, না, মোটা সুঁই দিয়ে কে যেন দুটোকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে জুড়ছে, কাঁচা মাংস আর হাড় ভেদ করে পটপট সুঁই বিঁধছে।

যন্ত্রণায় বিবর্ণ মুখ আর নিদ্রাহীন ক্লান্ত চোখের ওপর ভোরের আলো এসে লাগল,—একটা নতুন দিন জন্ম নিচ্ছে। যন্ত্রণায় তীব্রতা বোঝার ক্ষমতা তখন ওর হারিয়ে গেছে। কিংবা হয়তো ব্যাথার ভয়কেই ও তখন জয় করেছে। নতুন দিনের আলোর পানে চেয়ে ও স্বপ্ন দেখে: সে আলোর পেছনে আরো আরো আলো—দূরে দূরে গাঙের ধারে ওদের শ্যামল গাঁয়ের মাঠে যেখানে সবুজের শীষের ওপর সোনালী দিন ছুঁল। কত মানুষ জাগল। এল হাবিব, এল আনোয়ার, এল তার পেছনে লক্ষ পায়ের শব্দ। চুরি গেছে, লুট গেছে তাদের মাটি—তাই মাটির সন্তানরা জাগল, মাঠে, জঙ্গলে, শহরে, বন্দরে—শেকল বাঁধনে ঠক ঠক ঠং ঠং ছাপিয়ে উঠল শেকল ভাঙার উন্মাদ ঝঞ্ঝনা—আগুনের হল্কা এসে বুকে বেঁধে, আগেই মাথা হয়তো লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, বন্ধু, সাথী সমব্যথীর বাড়ানো হাত তাকে কোলে তুলে নেয়। এক আর লাখ, লাখ আর এক একাকার। সেই তো সেখানে নতুন দিনের আভাস।

এমনিভাবে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা। এমন সময় সেপাই সঙ্গে নিয়ে ডিগ্রিতে ঢুকল ডেপুটি। একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য ও হন্যে হয়ে উঠেছে। মুখ খিঁচিয়ে বলল,—কিরে মাগী, ঠেলা টের পেয়েছিস?

ভালো চাস তো সব বলে ফেল, নইলে রক্ষা নেই।

জোহরার কোমর থেকে পা পর্যন্ত দেহটা কি হারিয়ে গেছে? অসাড় পাথরের থামের মতো মাটির বুকে গেঁথে গেছে? আধা-অজ্ঞান আবেশে ও ফ্যালফ্যাল করে চাইল।

পিত্তি জ্বলে গেল ডেপুটির। আচ্ছা তবে ছাখ,—বলে সেপাইকে ইশারা করল।

সাধারণ সিপাইরা এ কাজে আসে না। তাই সরকারী পয়সায় শরাব খাইয়ে একটা মাতাল সেপাইকে তৈরী করে এনেছিল ডেপুটি। মাতালটার চোখে লোলুপ উত্তেজনা। জোহরার বুকের আচ্ছাদনটাকে ও ছুহাতের টানে ফ্যাড় ফ্যাড় করে ছিঁড়ে ফেলল, তারপর কদর্য চোখে জুলজুল করে তাকিয়ে রইল।

সে দৃষ্টি আঘাতের চেয়ে ভয়ঙ্কর। লজ্জায় অপমানে মন্থর রক্ত-স্রোতেও জ্বালা ধরিয়ে দেয়। দেওয়ালে হাত-বাঁধা জোহরা ছটফট করতে লাগল।

ডেপুটি আর সেপাই বিকট হাসি হেসে উঠল। এগিয়ে গিয়ে জোহরার কোমরের কাপড় খুলে ফেলল। তারপর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করে বলল,—এবার বলবি না আরও চাস্? ওদের চোখে জয়ের কুৎসিত উল্লাস। সে চোখে চোখ পড়তেই জোহরা হঠাৎ ঘেন্নায় কালো হয়ে গেল। লজ্জা আর অপমান রূপান্তরিত হল শান্ত, নীরব ক্রোধের দৃষ্টিতে। আগুনভরা চোখে ও আবার দাঁড়াল নিশ্চল, সোজা হয়ে।

উল্লাস মিলিয়ে গেল ডেপুটির। ব্যর্থতায় ক্ষিপ্ত হয়ে দাঁত কিড়মিড় করে লাফিয়ে জোহরার চুলের গোছা ধরে টান দিল পাগলের মতো। বল্, বলবি কিনা বল্,—চীৎকার করতে করতে রাগে দিশাহারা হয়ে হাতের রুলটা দিয়ে আচমকা প্রচণ্ড আঘাত করল ওর ঘাড়ের দুর্বল জায়গায়।

একবার শিউরে উঠেই জোহরার মাথাটা হঠাৎ অবশ হয়ে ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ল। হাঁটুর কাছে পা-ছুটো যেন তুমড়ে গেল; দেওয়ালে আটকানো হাত থেকে ঝোলানো শরীরটা অজ্ঞান হয়ে ছুলতে লাগল।

ঘরে ঢুকলেন বড় সাহেব। ইনি পাকিস্তানী সাহেব নন, খাস বিলাতের গোরা সাহেব। সম্প্রতি গোয়েন্দা দফতরের কর্তা হয়েছেন। আজাদীর পর কি আর গোরাদের রাখা হয়? তাই ছোটখাট পোস্ট থেকে তাদের সব তাড়ানো হয়েছে ; বড় বড় পোস্ট ছাড়া কিছু আর তারা পাবে না।

বিলায়েতী স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বাছাই করা লোক ইনি, পাকিস্তানী খরচায় মার্কিন পুলিশ দফতর থেকেও খাস তালিম নিয়ে এসেছেন। ভেতরে ঢুকেই ডেপুটিকে ইংরাজীতে ধমকালেন,—আরে, ওখানে অমন করে মারে বেওকুফ!

—কেন স্যর, আদালতে মাবের দাগ দেখতে পাবে ভাবছেন? না না স্যর, ও দাগ থাকবে না। ডেপুটি বিনীতভাবে জবাব দিলেন।

—দূর! দাগে কি পাকিস্তানেব হাকিমদের ভোলানো যায়? তাঁরা দেখেই বুঝতে পারেন, যে ও হয় মশার কামড়, আর না হয় আসামী নিজের ঘাড় নিজেই কামড়েছে। দাগের কথা বলছি না। বলছি যে, ওরকম মাবাতে আসামী অজ্ঞান হয়ে পড়ল ; তাতে তো ও বেঁচেই গেল। যতক্ষণ জ্ঞান না হচ্ছে, ততক্ষণ আর তুমি কিছু করতে পারবে না।

অপ্রস্তুত ডেপুটিকে একটু ভাববার সময় দিয়ে বড়সাহেব আবার বলেন,—ও সবে হবে না ; হালফিলের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ধব—যাতে দণ্ডে দণ্ডে কথা টেনে বার কবে আনে। এটা বিজ্ঞানের যুগ জান তো! কাল থেকে ওকে 'লাইট ট্রিটমেণ্ট' লাগাও, ব্লাডি বিচকে কথা বলতেই হবে। কালকের জন্যে ওকে তাড়াতাড়ি চাঙ্গা করে তোলাও বুঝলে?

আসামীকে নার্স করে তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফেরানোর জন্য জমাদারনী কামরুকে হুকুম দিয়ে সাহেবরা চলে গেলেন।

…মেঝেয় কম্বলের উপর জোহরাকে শুইয়ে কামরু ওর মাথায় হাওয়া করছিল আর মাঝে মাঝে অতি সন্তর্পণে কালশিরা-পড়া ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। জোহরার জ্ঞান ফিরেছে কিছুক্ষণ আগে, কিন্তু কামরু ওকে ছেড়ে যেতে পারেনি। আজাদীর মাল ও দওলত তো কামরুর

কপালে বখশায়নি, তার জওয়াহেরের জ্বালাই বরং ওকে দিওয়ানা বানাতে চলেছে। তাই এই রোগা কালো মজলুম কিসান মেয়েটার দুঃখে ওর মায়া পড়ে গেছে। যেন আদরের ছোট বোনটি।

ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কামরু দরদ দিয়ে ভাবে··· মেয়েটাও দিওয়ানা! যন্ত্রনার কাতরানির মধ্যেই আবার খোয়াব দেখে, বলে,—আপা আমরা কি একা? না না, আমরা হাজার লাখ, আমরা বাড়ব। ঘাড়ে হাত দিয়ে কাতরায়,—উঃ বড় দরদ! তারপর আধ-বোজা চোখে তন্দ্রা ছায়, জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করে কী আশায় স্বপ্ন—আপা, আপা, ঝাণ্ডা উড়ল, আকাশ লালে লাল। বাজনা বাজছে, গোলা ভরছে, ধানে ধানে ভরা মাঠ সব মজলুম মানুষের জায়দাদ, বোন। গাও গাও জয়গান গাও···

স্বপ্নের আবেশে কামরু শরীরেও কাঁটা দিয়ে ওঠে। তারপর ওর যন্ত্রনা কোঁচকানো মুখের দিকে চায়, স্বপ্ন ভেঙে যায়।

দুর্বল ক্ষীণ গলায় জোহরা ডাকে,—একটু পাশ ফিরিয়ে দাও! উঃ মাগো, বড় যন্ত্রনা ; আর পারিনে মা।

ছাঁৎ করে ওঠে কামরুর বুকের ভেতরটা। ভেঙে পড়বে কি জোহরা? পারবে না, সইতে পারবে না? না না, দোহাই আল্লা ওকে রক্ষা কর! তারপর অতি সন্তর্পণে ওকে পাশ ফিরিয়ে দেয়। চোখের পাতা দুটো ভিজে আসে।

স্বপ্ন ভাঙার রূঢ় বাস্তব দুর্ভাবনাকে ছড়িয়ে দেয়। মনে পড়ে ঘরের কথা। বুড়ো চাচা ইলাজের অভাবে কাতরাচ্ছে ; ছোট ভাই-বোনগুলো খিদেয় কাঁদতে কাঁদতে মেঝের উপরই ঘুমিয়ে পড়েছে। আর অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে হাসছে একটা চোখ। শয়তানী চোখ, জোহা সাহেবের···

ছুটির দিনও গোয়েন্দা দফতর খোলা থাকে, কিন্তু আফিংয়ের দোকান বন্ধই ছিল। যেদিন দোকান খুলবে সেদিন কামরু একটু সকাল সকাল আফিস থেকে বার হল। নইলে সূর্যাস্তের পর আবার দোকান বন্ধ হয়ে যায়।

দোকানে পৌঁছাল প্রায় শেষ সময়। তখন আর খরিদ্দার নেই। দেখে ও একটু আশ্বস্ত হল। তবু পা সরে না। মনে হয় রাস্তার সব লোকই যেন ওর দিকে চাইছে, ওর দিকেই আঙুল দেখাচ্ছে। বোরখায় ঢাকা মাথাটা হেঁট করে ও হন হন করে দোকান ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু গতি ক্রমে মন্থর হয়ে এল, একটু দূরে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। পাশে বাসনের দোকানে সাজানো মালগুলোই যেন ও পরীক্ষা করছে, এমনভাবে দাঁড়িয়ে তারপর আফিংয়ের দোকানের দিকে চাইল।

চাইতেই বুকটা ধক্ করে উঠল। দোকানী দোকান বন্ধের উদ্যোগ করছে। আজঁও বুঝি ফসকে যায় এই ভয়ে মুহূর্তের মতো ও আবার সব ভুলে গেল। দ্রুতগতিতে দোকানীর সামনে হাজির হয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল,—এক ভরি আফিং দেন তো।

বুকটা তখনও ধকধক করছিল। দোকানী হয়তো সন্দেহ করবে, কত হয়তো জেরা করবে। দোকানী কিন্তু কেনা বেচার অতি-সাধারণ নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে বলল—পারমিট খাতা? পারমিট খাতাটা দিন।

আজাদ পাকিস্তানে ব্যক্তি স্বাধীনতা বড় পবিত্র অধিকার। তাই নেশা করার স্বাধীনতায় সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবু দস্তুর মতো হিসাবপত্র রাখা হয়। প্রত্যেক আফিংখোর তার নাম, ঠিকানা, সাপ্তাহিক আফিং খরচা প্রভৃতি সবকিছু লিখিয়ে তবে আফিং কেনার পারমিট পায়। একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। পারমিট খরচার জন্য ফি নেওয়া হয় অতি সামান্য, এতেও যারা বলে, সরকার মানুষকে আফিং খাইয়ে লাখ লাখ টাকা করছে, তারা গদ্দার; দেশদ্রোহী।

বেচারী কামরু অতশত জানে না। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, —পারমিট তো নেই।

পারমিট ছাড়া এক সঙ্গে দু'আনার বেশী আফিং পাবেন না, সরকারের মানা আছে,—দোকানী জানাল।

সরকারের কী বিবেচনা! পারমিট অভাবে বেচারা আফিংখোরদের মৌতাত না মাটি হয় তার জন্যেও দু আনা বরাদ্দ!

কামরু দু'আনাই কিনে নিল। দু-দু'আনা করেই ভরি ভরে তুলবে।

বাসায় ফেরার পথে ক'টা মুহূর্ত মন্দ লাগেনি। তিক্ত জীবনের দুর্ভোগ শেষ করার দিন আরও পিছিয়ে গেল কিন্তু সে ব্যর্থতাকে ক্ষণেকের জন্যে ছাপিয়ে উঠেছিল জীবন্ত দুনিয়ার বিচিত্র রঙ।

মনের সঙ্গে শরীর তাল রাখতে পারে না। গা কিরকম ঘোলাচ্ছিল। বাসায় পৌঁছাতেই মাথাটা ঘুরে গেল। অবসন্ন হয়ে ও শুয়ে পড়ল।

ব্যস্ত হয়ে আম্মা এলেন। সারাদিনের খাটাখাটুনিতে নাড়ী চুইয়ে গেছে; একটু কিছু মুখে দে, ভালো হয়ে যাবে,—বলে খাবার এগিয়ে দিলেন।

খাবার দেখেই মোচর দিয়ে উঠল সারা শরীর। উঠে যাবারও তর সইল না। ঘরের পাশেই বমি করে ফেলল।

একটু আরাম তারপর বুকটা ভয়ে ধড়াস করে উঠল। আম্মাজানের চোখে কি সন্দেহের ছায়া? কিছু আঁচ করেননি তো?

নাঃ, তোর বোধ হয় পেটেই কিছু গোলমাল হয়েছে। দাঁড়া, পেটে তেল পানি মালিশ করে দিই,—কইলেন আম্মা।

কামরু চমকে উঠল। প্রায় আর্তস্বরেই বলল,—না, না, কিছু করতে হবে না। খাটনীতে মাথাটা একটু ঘুরে গেছে মাত্র। আমাকে খানিকক্ষণ একলা চুপ চাপ শুয়ে থাকতে দাও, আপনি ভালো হয়ে যাবে। বলে বালিশটা আকঁড়ে ধরে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল।

রাত্রে খাবার নিয়ে আম্মা আবার ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু ও উঠল না। মনের ভেতর তখন তোল পাড় করছে, আত্মহত্যার সঙ্কল্পে ক'দিন ধরে বাধা পড়ায় বিনিদ্র দুশ্চিন্তায় ও শিউরে শিউরে উঠছে! না, না, এ কলঙ্ক কেউ ঘুণাক্ষরে টের পাবার আগেই অভিশপ্ত জীবনকে শেষ করতে হবে; জীবনের সব আলো এই কলঙ্কের কালিতে কালো হয়ে যাবে, সে আমি সইতে পারব না। হায় খোদা, আমাকে মাফ কর।

সূর্যোদয়ের জন্যে ও তন্দ্রাহীন রাত্রের প্রহর গুনছিল। সকালেই গিয়ে দু'আনার 'আফিং কিনবে, তারপর আবার বিকালে, পরদিনের ভেতর

আধ ভরি পুরে যাবে, একটা জীবনের হিসাব চোকাতে তাই যথেষ্ট। সময়ই যেন এখন ওর বড় দুশমন।

অফিসে বিশেষ কাজ আছে বলে অফিসের অনেক আগেই ও বেরিয়ে গেল।

তখনও আফিংয়ের দোকানে ভিড় জমেনি। এবার আর কামরুর পা কাঁপল না, সোজা এগিয়ে গিয়ে দু-আনি আফিং চাইল।

গতদিনের সেই দোকানীই। কামরুর দিকে প্রথমে একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বলল,—কালই আপনি দু'আনি নিয়ে গেলেন না? বিনা পারমিটে হপ্তায় দু'আনির বেশী দেওয়া তো নিয়ম নেই।

কামরু কি জবাব দেবে। তবু ফিরে যেতে পা সরে না। আফিং যে ওর চাই।

ওর ভাব দেখে দোকানী একটু নড়ে বসল। গলাটা নামিয়ে সহানুভতির সুরে বলল,—আপনার বুঝি খুব জরুরী দরকার? তা···মানে আর একজনের ভাগ থেকে ভরি খানেক আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু দাম লাগবে পঞ্চাশ টাকা। আইনের ঝুঁকি, তার ওপর সরকারী কর্তাদের ঘুষঘাষ দেওয়ার খরচ জানেনই তো—পঞ্চাশ টাকা না হলে আমার কিছুই থাকে না। নেবেন পঞ্চাশ টাকায়?

প-ঞ্চা-শ টাকা! এ মাসের মাইনে, যা সঙ্গে রয়েছে, তার প্রায় সবটাই। জানাজার খরচার পয়সাও থাকবে না? ভাবতে ভাবতে কামরু হাত দুটোকে পেটের ওপর জোড় করল। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন পেটের ভেতর নড়ে উঠে সমস্ত দেহটাকে মুহূর্তের জন্য যন্ত্রনায় অবশ করে দিল। দুশমনের সন্তানটা পেটের মধ্যেও দুশমনি করছে।

দোকানের খুঁটিটা ধরে ফ্যাকাশে মুখে কামরু বসে পড়ল। অবসন্ন মাথার ভেতর দিয়েও কতকগুলো দুশ্চিন্তা যেন আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে গেল। আর ক'দিন পরে কাপড় বা বোরখার আচ্ছাদনেও এ কলঙ্ক ঢাকবে না। আম্মা জানবে, অফিসের লোকগুলো কুৎসিত ইশারা করবে; কলঙ্কের ঢেউ উঠবে···

আর কথা না বলে ও পঞ্চাশ টাকা বার করে দিল। তারপর আফিং-এর মোড়কটা সন্তর্পণে মুঠোয় ধরে ভাবতে ভাবতে চলল অফিসের দিকে। ··আজই শেষ। আপিস থেকে ফিরে রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে তখন ও আফিং খাবে। ব্যস! রাত দশটার পর চুকে যাবে তুনিয়ার দেনা পাওনা। জীবনের মেয়াদ আর বারো ঘণ্টা মাত্র।

শুধু বারো ঘণ্টার ওয়াস্তা! ভাবতেই হঠাৎ এক পরম প্রশান্তিতে মন ভরে এল। যে-কলঙ্কের তুর্ভাবনা ওকে মাথা হেঁট করে রেখেছিল, যে তুশ্চিন্তার পোকাগুলো দিনরাত মগজের মধ্যে হুল ফোটাচ্ছিল, হঠাৎ সেগুলো যেন খসে পড়ল। ও সোজা হয়ে চাইল সামনের দিকে। আফিং-এর মোড়কটাকে হাতে চেপে অনুভব করে আরামে চোখ বুজল। রাত দশটা, তারপর আর কোন দায়িত্বের যন্ত্রণা থাকবে না। চোখ বুজে আসবে গাঢ় ঘুমে। সে ঘুমের জাগরণ নেই, তুঃস্বপ্ন নেই। জ্ঞান আর ভাবনার ভারী বোঝা তুটো একেবারে নেমে যাবে। আসবে শান্তি। আঃ···

আজ তিন দিন ধরে জোহরার উপর 'লাইট ট্রিটমেণ্টের' বৈজ্ঞানিক উৎপীড়ন চলছে।

ডিগ্রির মেঝেতে ওকে চিত করে শুইয়ে রেখেছে। ওপর থেকে চোখ মুখের ওপর পড়ছে একটা সার্চ-লাইটের ধাঁধালো আলো—অনবরত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন আর পাশে বসে অফিসারেরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে, দিনেরাতে সর্বক্ষণ।

পাশ ফিরবার জো নেই। চোখ আর মস্তিষ্কের এক মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। ঝলসানো আলো চোখের স্নায়ুগুলোকে অনবরত জ্বলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত তুর্বল শরীর অবসাদে ঘুমের জন্য টনটন করে, কিন্তু শয়তানী আলো চোখের শিরায় শিরায় রক্তকে তোলপাড় করে নাচিয়ে বেড়ায়!

আমাকে একটু ঘুমতে দিন,—ক্ষীণ স্বরে জোহরা কাতরায়।

সরকারের পার্শ্বচরেরা ব্যঙ্গের হাসি হেসে ওঠে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘুমোতে দেব বৈকি, নিশ্চয় দেব। শুধু আর একটু জবাব দাও দেখি। হবিবকে শেষ কোথায় দেখেছিলে? ও হবিবকে চেন না? আচ্ছা মনসুরকে? তাও না! আচ্ছা তোমার ফুফার নাম কি? তোমাদের ক'বিঘে জমি আছে? বাঃ এই তো ভালো জবাব দিচ্ছ। হ্যাঁ, গত বছর ফসল হয়েছিল কত? জোতদার ফসল নিয়ে গেল? আ-হা! তা আনোয়ারেরা কিছু বলল না? বলল? ও ভুলে বলেছিলে, আনোয়ার কে চেন না? আচ্ছা, তোমার চাচা মারা যান কোন্ সালে? ··

এমনি অনবরত, অনর্গল প্রশ্ন। এলোমেলো! কখনো বাজে কথা, কখনো তার মধ্যে দু'একটা বাস্তবিক সওয়াল। জবাব না দিলে খোঁচা দেয়, এলিয়ে গেলে কঠোর ধাক্কায় ফিরিয়ে আনে, আবার প্রশ্ন করে। নিদ্রাহীন, উন্মত্ত স্নায়ুগুলো কোন্ সময় মনের শাসনকে ভেঙে ফেলবে, অবাস্তব কথার জবাবের ফাঁকে সত্য জবাব বেরিয়ে আসবে, সেই পরিণতির জন্যেই ওরা পিশাচের আগ্রহে প্রহর গোনে। প্রশ্ন করতে করতে এক অফিসার হাঁপিয়ে যায়, আর একজন তার স্থান নেয়, কিছুতেই বিরাম নেই।

জোহরা পাশ ফিরেছিল। রূঢ় ধাক্কায় ওকে চিত করে দিয়ে অফিসার আবার জিজ্ঞাসা করে চলল।

চোখ বুজল জোহরা। একটুখানি ঘুম আসুক, মুহূর্তের জন্যেও স্নায়ুগুলো বিশ্রাম পাক, তা হলেও ও যে বেঁচে যায়। কিন্তু তার উপায় নেই। বন্ধ চোখের পাতা ভেদ করে ঝলসানো আলোর ঝাঁঝ প্রবেশ করে, চোখের নাড়ীতে নাড়ীতে উত্তেজনা জাগিয়ে পাগল করে তোলে।

অনর্গল বকিয়ে চলে অফিসার—তোমার এখনো শাদী হয়নি কেন? গরীব বলে? কেন, গরীবরা তো সবাই শাদী করে। তা না, হবিবের সঙ্গে তোমার আশনাই বলেই আজো শাদী হয়নি, না? ও আশনাই নেই, আশনাই থাকলে শাদীই হতে পারত? তা বটে। তা তোমাদের ভেতর তো শাদীর্ দরকার হয় না—আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে ঘর করো! মিথ্যে কথা? কেন ঐ আমিনা আর আনোয়ার তো বিনা শাদীতে এক সঙ্গে থাকে। তাদের শাদী হয়েছে? বেশ বেশ। তবে আমিনা

আবার বিষ্টুর সঙ্গে থাকে কেন ? বাজে কথা ? সে শুধু লোক দেখানোর জন্যে, লুকিয়ে থাকার সুবিধার জন্যে ? তা হবে। কিন্তু তারা যে এক ঘরে শোয়, তাদের এখনকার আড্ডায় ঘর তো একখানাই ! দু খানা ঘর ? ছোঃ তুমি জান না, কোন্ আড্ডার কথা তুমি বলছ ? কোন্ গাঁ বললে ? শাহবাজ না কি, কি বল, বল সাফ্ করে বল !

জোহরা হঠাৎ কাঠ হয়ে গেল। ক্লান্তি আর নিদ্রাহীন উন্মত্ততার আধা-চৈতন্য মনের শাসন অজানিত কখন ভেসে গেছে ; ঝিমানো মস্তিষ্ক কখন যন্ত্রবৎ জবাব দিয়ে ফেলেছে। ওদের লুকিয়ে থাকা গাঁয়ের নামটা পর্যন্ত আর একটু হলে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল !

হায়, হায়, এতগুলো মানুষের বিশ্বাস কি ভেঙে পড়বে আমার হাতে ? এত বড় লড়াইয়ে আমার জিভটাই হবে দুশমনের হাতিয়ার ?—এই ভাবনার তীব্র আঘাতে জোহরার ক্লান্ত, উৎপীড়িত মাথাটা হঠাৎ ঘুরপাক খেয়ে গেল। ঠাণ্ডা অবশ হয়ে এল হাত পা। অচৈতন্য হয়ে ও এলিয়ে পড়ল।

ডিগ্রির বাইরে পাহারারত কামরুর বুকের ভেতরটাও মোচড় দিয়ে উঠল। উৎপীড়িত মেয়েটার প্রতি দরদে ওর সারা দিলটাই যেন আজ ভরে গেছে। নিজের যন্ত্রণা থেকে চরম মুক্তি পাবার ভরসায় সারা দুনিয়ার যন্ত্রণাকেও আজ আপনার করে নিতে চায়।

পুলিস সার্জন এসে অচৈতন্য জোহরাকে কি ইনজেকশন দিয়ে গেল। সেই সঙ্গে অফিসাররাও চলে গেল, কামরুকে বলে গেল আসামীর জ্ঞান ফেরবার চেষ্টা করতে, আর জ্ঞান হলেই খবর দিতে।

তারপর ডিগ্রির ভেতর কামরু আর জোহরা একা। ব্যথিত কামরু আস্তে আস্তে হাওয়া করছে জোহরার মাথায়।

অনেকক্ষণ পরে জোহরা নড়ল। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে অস্ফুট প্রশ্ন করল, —কে ? কামরুর দিকে চেয়ে তাকে চিনল, বলল,—আমি কি বেহুঁশ হয়েছিলাম ?

ক্রমে ক্রমে সারা অবস্থাটা মনে পড়তেই শিউরে উঠে ও কামরুর

হাত চেপে ধরল। করুণ মিনতিতে ক্ষীণ আর্তনাদ করে উঠল,—আমার জ্ঞান ফিরেছে ওদের জানতে দিও না, দিও না আপা!

চোখের জলে ভেজা ম্লান হাসিতে জোহরার দিকে চেয়ে কামরু ওর হাত দুটো কোলের উপর তুলে নিল। বলল,—ভয় নেই।

তুমি না থাকলে অনেক আগেই অসহ্য হয়ে উঠত,—দুর্বল স্বরে জোহরা কৃতজ্ঞতা জানাল।

তারপর ঠিক কামরুর ছোট বোনের মতোই ওর কোলে মুখটা গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কান্নার মধ্যে থেকে থেকে শোনা গেল ওর টানা টানা স্বর,—কিন্তু আর আমি পারিনে, আর সইতে পারিনে গো! শয়তানদের অত্যাচারের কি শেষ নেই?

ব্যথায়, দুঃখে কামরুর মন ভরে গেল। এত সয়েও কি শেষকালে ও শয়তানদের কাছে হার মানতে বাধ্য হবে? সাহস দিয়ে জোহরাকে বলল,—না, না, শয়তানরা হারবেই। বেশি নয়, আর একটু সবুর কর!

—কি করে করি? এলিয়ে-পড়া সুরে জোহরা বলল,—শরীরের কষ্ট হলে দাঁতে দাঁত চেপে হয়তো সইতে পারতাম, কিন্তু এখন আধা-তন্দ্রার ঘোরে কোন কথা কখন বেরিয়ে পড়ে তার যে ঠিকানাই পাইনে।

একটু থেমে শিউরে-ওঠা ভয়ের সুরে ও বলে চলল,—আমার মুখ দিয়েই কখন সাথীদের সর্বনাশ হবে, সেই ভাবনা আমার মনকে ভেঙে দিয়েছে। মনের জোর যে ফেরাতে পারছিনে! উঃ মাগো, একটু বিষ দাও! হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু বিষ দাও, তাহলে আর শয়তানদের ভয় থাকবে না।

বলতে বলতে একটা হঠাৎ আশার উত্তেজনায় জোহরা উঠে বসল। কামরুর হাতটা চেপে ধরে বলল,—তুমি পার তো বাইরে যাও। দোহাই আল্লার, তুমি আমাকে বিষ কিনে এনে দাও। আপা, আপা, সাথীদের সর্বনাশ থেকে আমাকে বাঁচাও! দয়া করে একটু বিষ এনে দাও। নইলে আর নিজেকে সামলাতে পারব না।

চমকে উঠল কামরু। কিন্তু কোন জবাব দিল না। গভীর চিন্তার মধ্যে ও তখন হারিয়ে গেছে। উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় জোহরা আবার নেতিয়ে পড়ল। চিন্তামগ্ন কামরু ধীরে ধীরে ওর মাথায়

হাত বোলাতে লাগল।

কিছু পরে জোহরা প্রকৃতিস্থ হল। কথা বলার শক্তি ফিরে পাবামাত্র তার ঠোঁটে ভাষা পেল সেই একই আবেদন,—তুমি আমার অনেক উপকার করলে। এবার শেষ উপকার কর। আমাকে মরতে দাও, যাতে সবাই বাঁচে।

চিন্তামগ্ন কামরু তখনও নিরুত্তর।

এমন সময় সার্জন আর অফিসারেরা কামরুকে ডিগ্রির বাইরে ডেকে জিজ্ঞাসা করল জোহরার জ্ঞান ফিরেছে কিনা। অম্লান বদনে কামরু মিথ্যে জবাব দিল,—না।

কি রকম ডাক্তার আপনারা, একটা মূর্ছা ভাঙাতে পারেন না— সার্জনের প্রতি অফিসার খিচিয়ে উঠল। আজ সারা রাত আসামীকে লাইট ট্রিটমেণ্টের উপযুক্ত করে দিতেই হবে। আ-হা-হা, আড্ডার ঠিকানাটা প্রায় বলেই ফেলেছিল, মূর্ছা গিয়ে ফস্কে গেল। নিন, নিন, ডাক্তারী শাস্ত্রের সমস্ত বিদ্যে লাগিয়ে চাঙ্গা করে দিন। ওর কাছে কথা বার করতে আর দেরী হলে অ্যাবস্‌কণ্ডারদের ধরা যাবে না, ব্যাটারা সরে পড়বে। কে জানে হয়তো সরে পড়েছেই!

ডাক্তারী শাস্ত্রের কসুর নেই, আসামীর হার্টটা বড় উইক কিনা, শকে মাঝে মাঝে ভেঙে পড়ছে—সার্জন কৈফিয়ৎ দিল। তবে ভাববেন না, একটা স্পেশাল ইনজেকশন তৈরি করছি ; আধ ঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে যাবে। ওটা লাগাতে পারলে আজ সারা রাত আপনাদের ট্রিটমেণ্ট চালানোর অসুবিধা হবে না।

বলে তারা বিদায় হল। তখন কামরুর ছুটির সময় হয়েছে। ওর বদলী ওর বন্ধু দ্বিতীয় জমাদারনী সুফিয়া এসে পৌঁছেছে, দূর থেকে দেখা গেল। চট করে কামরু ডিগ্রির ভেতর ঢুকল। ব্লাউজের মধ্যে বুকের কাছ থেকে আফিং-এর মোড়কটা বার করে ধীরে ধীরে জোহরার হাতে গুঁজে দিল। অস্ফুট ভাঙা গলায় বলল,—এই বিষ।

চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। নীচু হয়ে আস্তে আস্তে জোহরার কপালের উপর একটি চুমা এঁকে দিল। তার সঙ্গে মেশানো ছিল চোখের জল।

পরদিন কামরু আফিস যায়নি। একদিন বাদ দিয়ে আবার যখন সে ঐ পাষাণ পুরীতে পৌঁছালো তখন দ্বিতীয় জমাদারনী সুফিয়া এদিক-ওদিক চেয়ে সন্তর্পণে ওকে একটা মোড়ক দিল। বলল,—সেই ডিগ্রির আসামী তোকে দিয়ে গেছে। কিছু দামী জিনিস থাকলে ভাগ দিস্ কিন্তু।

কামরুরই আফিং-এর মোড়ক সেটা। আফিং তেমনই আছে, শুধু মোড়কের কাগজটায় মাথার কাঁটা দিয়ে ফুটো ফুটো আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা:

—আপা, এমন করে মরলে শয়তানরা ভাববে আমরা ভীতু, এরপর সকলকেই এমনি করবে। ওদের কাছে হার মানব না, তাই ফেরত দিলাম। তোমাকে সেলাম, তুমি আমার আপনার আপা।

জোহরা।

কামরু গলায় একটা দলা ঠেলে উঠল। কোন রকমে সুফিয়াকে জিজ্ঞাসা করল,—আসামী কেমন আছে।

আসামী? জোহরা? আ-হা-হা, আজ সকালে ও মারা গেছে,—সুফিয়া জবাব দিল।

—মিথ্যা কথা! কামরু প্রায় চীৎকার করে উঠল।

ও—মরেনি, ওকে মেরে ফেলেছে,—বলে পাথরের মুর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মন্ত্রশক্তি

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য



স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য সাংবাদিক, গল্পকাব, অনুবাদক। অধুনা বাংলাদেশে জন্ম। একাধিক পত্র পত্রিকাব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতাব অব্যবহিত পবে 'অগ্রনী' পত্রিকা নতুন কবে তাব সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'অন'মী' ছদ্মনামে 'অরণি' পত্রিকা তাঁর যে সব বচনা প্রকাশ কবেছিল বিদগ্ধ পাঠক মহলে তা সমাদৃত হয। প্রগতি লেখক ও শিল্পী স'ঘেব সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং বাংলাব প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন কবেন। তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিশ্বাস তাঁর প্রতিটি লেখায় বিভিন্নভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁব গল্পগুলি জীবনধর্মী—জীবনকে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, তাকে অনুভব কবেছেন। এই অনুভব ছিল অত্যন্ত সতেজ এবং সাবলীল ও রিপোর্টাজধর্মী। তাঁর গল্প সংকলন 'ছোট বড মাঝাবি'-তে এর আস্বাদ পাওয়া যায়।

অদূরে ডেকে উঠল একপাল শেয়াল। এ-বাড়ির ও-বাড়ির একদল কুকুর এক সঙ্গে তার পালটা জবাব দেয়। রাত্রি সবে এক প্রহর।

আমিনা তার স্বামীর ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করে। বারকয়েক ডাকা-ডাকির পর রসুল একটা অস্ফুট আওয়াজ তোলে। পরক্ষণেই পাশ ফিরে আবার নাক ডাকতে থাকে।

মায়া হয় আমিনার। উমেদপুরের মুখুজ্জেবাড়ির খিড়কির পুকুরের সমস্ত পানা সাফ করে পাড়ে তুলে রেখে লোকটার আজ বাড়ি ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। গুমট গরমেও বেশ তেল মেখেছে সর্বাঙ্গে। তবু নেয়ে এসে খেতে বসে রসুল বাঁ হাতে তার বুকপিঠ চুলকে মরেছে সারাক্ষণ।

সন্ধ্যার পর বারকয়েক হাই তুলে চাটাই-এর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে সে এই ঘণ্টাখানিক আগে। এই কাঁচা ঘুম ভাঙাতে হবে, জাগাতেই হবে। ঘরে একটা কানাকড়ি নেই। হাঁড়িতেও চাল বাড়ন্ত।

—ওঠো! ওঠো এবার।

বিরক্তির ঝাঁজ মিশিয়ে রসুল একটা অর্ধচেতন প্রশ্ন করে,—কী?

—উঠবা না আজ?

—উহু।

কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা রাতের চাঁদ চোখের আড়াল হয়েছে বহুক্ষণ। বাকি রাত এখন একটানা অঢেল অন্ধকার। সিঁধেল চোরের বউ এবার সারা গায়ের জোর দিয়ে ধাক্কা মারে।

—ওঠো শিগগির।

রসুল এবার চোখ মেলে। উঠে বসে একবার আড়মোড়া ভাঙে। ঘুমের ঘোর কাটাবার জন্যে চোখ রগড়ায় ঘন ঘন।

—শরীলটা আজ ভালো ঠেকে না লো আমিনা।

—ডাক দিবার কইছিলা, তাইনা ডাকলাম।

আমিনা বিরক্তি চেপে চুপ করে থাকে। রসুল নিজেই স্ত্রীকে বলে

রেখেছিল যথাসময় ডেকে দিতে। দুপুর রাত শেষ হওয়ার আগে এক আধ ঘণ্টার সঙ্কীর্ণ সময়টুকুই প্রশস্ত সময়। ভাতের নেশায় গৃহস্থের তখন গভীর ঘুম।

বিছানার উপর চুপ করে বসে আছে রসুল। দেহ চায় না, মন চায় না, তবু বার হতে হবে। বাগ হয় আমিনাব উপর, নিজেব উপর, সারা দুনিয়ার উপর। পর মুহূর্তে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে মুখুজ্জেবাড়ির মেজোকর্তার উপব। পানা পুকুর সাফ করার নগদা মজুরিটা আর দিনদুই বাদে গিয়ে নিয়ে আসতে বলল শালা কোন আক্কেলে।

বসে বসে রসুল খালি হাই তোলে আর পিঠ চুলকায়।

—চোখে মুখে একটু পানি দিবা?

রসুল বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। আমিনা এবাব নিশ্চিত মনে অন্ধকারে ঘরের এক কোণে গিয়ে কুপিটা জ্বালায়।

—কানে ঢোকে আওয়াজ?

তিন বছরেব ঘুমন্ত ছেলেটার বুকের কাছে জমে আছে একগাদা কফ।

—একেবারে বেহুঁশ তুই। বিকালে কতবার তোবে কইলাম, একটু সরষের তেল গরম কবে বুকে পিঠে মালিশ কব। আমাব কথা মাগি কানেও তোলে না।

বোতলের বাকি তেলটুকু সব নিজের সারা গায়ে মেখে এখন ঐ গালভরা নালিশ একেবারেই অসহ্য লাগে। একটি কঠিন জবাব তাব জিভের আগায় এসেই আবার ফিরে যায়। ঐ গোঁয়াব লোকটাকে ঘাঁটাতে এখন সাহস পায় না। হয়ত বেঁকে বসবে। বাইরে আজ আর বারই হবে না।

রসুল দুয়ার খুলে বাইরের থেকে একবার ঘুরে এল।

সানকি থেকে খানিকটা ভাত তুলে রসুল আর একটা ছোট মাটিব বাসনে তা সরিয়ে রাখে। আমিনা বাধা দেয় না। কাল ছেলেটাকে নাস্তা দিতে পারবে।

ঘুমের ঘোর কেটেছে। পেটেও পড়েছে ভাত। রসুল এবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। রুক্ষ মেজাজ মোলায়েম হতে শুরু করেছে।

—দেখিস, আজ আবার মড়ার মতো ঘুমাস না।

—ফিরে এসে জোরে জোরে টোকা দিও দরোজায়।

—হু! পাড়ার লোকে টের পাক।—দরোজায় খিল দিস না তুই। বেতের মোড়াটা দিয়ে ঠেক দিয়ে রাখিস।

ব্যবস্থাটা আমিনার মনঃপূত হয় না। সে চুপ করে থাকে। ঘরের মধ্যে আছে তার যথাসর্বস্ব—একটা পেতলের বদনা, একটা লোহার কড়াই, কাঠের হাতা, খুন্তি আর মাটির হাঁড়ি, কলসি, মটকি, মালসা।

এত দুঃখেও রসুলের হাসি পায়। চোরের ঘরেও চুরির ভয়।

—ডরাস ক্যান? তোর ঘরে শেয়ালও মুততে আসবে না।

এতক্ষণে আসল রসুল প্রকট হল, তার মনে ক্ষোভ, দ্বেষ, দুঃখ, নৈরাশ্য কচুপাতার উপরে বৃষ্টির জলের মতো বেশিক্ষণ তিষ্ঠতে পারে না। কলমি শাক দিয়ে ভাত মেখে নিয়ে গোগ্রাসে গিলতে গিলতে রসুল গদগদ হয়ে ওঠে,—কী রান্ধাই আজ রেঁধেছিস আমিনা। তোর হাতখান শুদ্ধা খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করে।

কেরোসিনের কুপির কৃপণ আলোয় আমিনার হাসি-হাসি মুখখানা দেখে রসুল ভুলে গেল আজ রাত্রের দায় আর কাল সকলের দায়িত্ব।

—ছাখ আমিনা! ঘাটেপথে অন্দরে-বন্দরে কত খুবসুরুত মেয়েমানুষ দেখলাম জীবনে। এই তো আজ সকালে মুখুজ্জেবাড়ির বউগরে দেখে এলাম। পায়ে আলতা, কপালে টিপ, কানে দুল, পরণে জরির পাড়ের রঙিন শাড়ি। কেমন সোন্দর ফিটফাট। কি না ঠমক।

—লালচ লাগছে তোমার?

—লাগবে না! মুকুজ্জেবাবুরা রাত্তিরে ঘুমায় এক-একটা পরী নিয়ে।

—আর তুমি?

—আমি? আমি ওই এক পেত্নী নিয়ে?

—কী? আমি পেত্নী? আমিনা ফোঁস করে ওঠে।

—আরে মাগি গোসা করিস না। আগে শোন আমার সব কথা। রসিয়ে রসিয়ে বলতে থাকে রসুল,—তুইও যদি সাবুন মেখে গোছল করিস রোজ দু-বেলা, অমনি করে পায়ে আলতা লাগিয়ে, মাথায় গন্দ তেল মেখে, আশমানি রঙের শাড়ি পরে, চোখে সুরমা লাগিয়ে তুইও যদি সামনে

এসে দাঁড়াস, তালে মুকুজ্জেবাড়ির বউগুলোকে সেই ডানা-কাটা পরীর কাছে মনে হবে এক একটা বাঁদী।

—যাও, শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না।

—বিশ্বাস কর আমিনা! দিলখোলা সাফ কথা তোরে কইলাম। তোরই নশিব খাবাপ। তা নাইলে আমার লগে তোর শাদি হবে ক্যান ?

মুখ ধুয়ে এসে এক ছিলিম তামাক খেয়ে রসুল তৈরি হল।

—নে, এবার তোর মন্তরটা পড়ে দে।

কৈলাস মণ্ডলের বুড়ি ঠাকুরমার কাছ থেকে শেখা এক গুপ্ত মন্ত্র আমিনা ফিশফিশ করে আউড়ে যায়ঃ

কপপল, ঝপপল, খপপল
সাপা-বাঘা-লোহা-লাঠি
নিচ্চল, নিব্বল, নিফফল।

আমিনার স্থির বিশ্বাস, হিন্দুর মন্ত্র হলেও ঐ মন্ত্রশক্তিরই কল্যাণে এখনো পর্যন্ত স্বামী ও তার বমাল ধরা পড়েনি। রসুলেরও দৃঢ় ধারণা, বউ-এর ঐ মন্ত্রগুপ্তিরই গুণে আজ দেড় বছরের মধ্যে তাকে অমাবস্যার অন্ধকারে সাপেও কাটেনি, বাঘের মুখেও পড়তে হয়নি, লোহার অস্ত্রে বা লাঠির আঘাতে কেউ এখনো জখম করতে পারেনি।

—মন্তরটা মন লাগিয়ে বলেছিস তো ?

—হুঁ !

—দেখিস যেন বিপদ না ঘটে ? দত্তপাড়ায় একটা সরাইল-এর কুত্তা আনিয়েছে। শালা বাঘের বাচ্চার কান কী পাতলারে। সেদিন আর এটটুক হলে দফা নিকাশ করে ছাড়ত।

মনে মনে আল্লার নাম নিয়ে ঘুটঘুটি অন্ধকারে রসুল বার হয়ে পড়ে।

দত্ত পাড়ায় যাবে, না কাঁসারীপাড়ায় যাবে সে সম্পর্কে এখনো রসুল মন স্থির করতে পারেনি। ভাবতে ভাবতে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের বড় সড়কে

এসে পড়ল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। অদূরে জোরালো আলো। গোটা কয়েক ছোট-বড় লণ্ঠন। কারা আসছে?

দলের মধ্যে থেকে সামনের দিকে সহসা একটা-টর্চলাইট জ্বলে উঠে পরক্ষণে নিবে যায়। রসুল একলাফে সামনের একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

চারদিকে ভনভন করে একরাজ্যের মশা, চোখেমুখে বুকেপিঠে অজস্র আক্রমণ। এতকুটু নড়েচড়ে বসবার উপায় নেই। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে কান খাড়া করে থাকে। একসঙ্গে অনেকগুলো জুতোর আওয়াজ। এক, দুই, তিন, চার···

লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পায়—থানার বড় দারোগা, আই বি ইন্সপেক্টর, জন-তিনেক কনস্টেবল, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট রজব আলি খাঁ। আর চৌকিদার রহমত আলি।

ঐ দলবল রাস্তা কাঁপিয়ে দিয়ে বেশ খানিক দূর এগিয়ে গেলে পরে রসুল ঝোপের বাইরে এসে অন্ধকারে এদিক-ওদিক একবার দেখে নেয়। বুকের তোলপাড়, তখনো বন্ধ হয়নি। একদৃষ্টে চেয়ে আছে। হুজুরের দল যাচ্ছেন কোথায়?

সামনের চৌমাথায় গিয়ে ওরা উমেদপুরে যাবার পাকা রাস্তা ধরল। রসুল একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। মনে পড়ে গেল, আজ রাত্রে উমেদপুরে রায়বাড়িতে কালীকান্ত নাগের দলের মানভঞ্জন পালাগান। বাবুরা সেখানেই চলেছেন সন্দেহ নেই।—কিন্তু একটা ছোট্ট লণ্ঠন দলছাড়া হয়ে রসুলদের পাড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চৌকিদার রহমত আলি ছাড়া আর কেউ নয় তো?

রসুল দ্রুতপদে বাড়ি ফিরে গেল। আস্তে আস্তে টোকা দেয়—হোগলা পাতার বেড়ার গায়। আমিনা জেগেই ছিল। দুয়ার খুলতেই বাইরে থেকে অনুচ্চ কণ্ঠে রসুল প্রশ্ন করে।

—আমারে কেউ ডেকেছিল?

—না তো।

—চৌকিদার?

—কেউ না।

অদূরে চৌকিদারের গলার আওয়াজ শোনা যায়। রসুল তাড়াতাড়ি ঘরের দাওয়া ছেড়ে ঘরের মধ্যে আসে। দুয়ার ভেজিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রহমত আলির সুপরিচিত অভ্যস্ত চিৎকার ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আর বেশি দূরে নয়। কয়েক সেকেণ্ড বাদে তার পদধ্বনিও কানে আসে।

—রসুল মিঞা বাড়ি আছে নি?

ঘরে থাকলে রসুল সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দেয়। আজ কী ভেবে চুপ করে রইল।

চৌকিদারের পায়ের আওয়াজ উঠোন পারে হয়ে এখন দাওয়ার কাছে এসে পৌঁছে গেল। দুয়ারের গায়ে একটুখানি লাঠি ঠুকে রহমত আলি আবার হাঁক ছাড়ে,—রসুল মিঞা ঘরে আছে?

রসুল সশব্দে দুয়ার খুলে দিয়ে হেসে বলে,—বিশ্বাস হয় না? নিজের চোখে দেখে যাও চাচা,—ঘরেই আছি।

—হুকুমের চাকর আমি, হুকুম তামিল করি। তুই ঘরে থাকলেও ডাকব, না থাকলেও ডাকব। তুই ঘরে থাকলেই বা আমার কী লাভ, না থাকলেই বা আমার কোন লোকসান!—এক ছিলিম তামাক খাওয়াতে পারিস?

রসুল ঘরের মধ্যে গিয়ে পুরনো বেতের মোড়াটা এনে দাওয়ার উপরে পেতে দেয়।

—শালারা খাওয়ায় তপ্ত, হাগায় রক্ত। চৌকিদার কণ্ঠস্বর কয়েক পর্দা নামিয়ে আনে, যেন উঠানের এককোণেই এই অঞ্চলের থানা,—সন্ধ্যা থিকা এতক্ষণ খামকা আমারে থানায় আটকে রাখল। বাবুগরে লগে লগে পিছনে পিছনে ফেউ হয়ে আসতে হবে। আবার হুকুম দিয়েছে রাত্তিরে দুবার করে চৌকি দিতে। চাষিপাড়ার ভালোমন্দ সব খবর জোগাড় করা চাই।

ঘরের মধ্যে রসুল তামাক সাজতে বসেছে।

—রসুল। তোদের পাড়ায় আজকাল নাকি তেভাগার মিটিন হয়?

বাইরে থেকে স্বদেশীবাবুরা নাকি মাঝে মাঝে আসে। মুনসীবাড়ি রাত কাটায় ?

ঘরের মধ্যে থেকে রসুল জবাব দেয়,—তাই তো শুনি ।

—তুই যাস না ?

—না চাচা !

—ক্যান ?

—উসব ভজঘটের মধ্যে গিয়ে ফয়দা কী ? রসুল হুঁকো নিয়ে বাইরে আসে।

—কী লাভ কও। উয়াগরে বুলি, লাঙ্গল যার, জমি তার। আমার জমিও নাই, লাঙ্গলও নাই।

—গেলে ক্ষেতিটা কী ? দশজনের ভালোমন্দের কথাই তো সেখানে হয়।

—রাখো তোমার ভালোমন্দ ! ল্যাংটা-কাল থিকা ভালোমন্দের কথা শুনতে শুনতে চুলদাড়ি সব পাকতে চলল এবার।—আমি চাচা ভালোতেও নাই, মন্দতেও নাই। আমি ভালোরে ডরাই, মন্দরেও ডরাই

—ঠিক বলেছিস রসুল !

রহমত আলি একটা মতলব নিয়ে এসেছে। হুঁকোয় জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে সে এবার ভূমিকা শুরু করল,—'আজকাল তালে কাজকাম ভালোই পাস ?

—কাজকাম আর-তেমন জোটে কই ? উমেদপুর আর পলাশগঞ্জের হিন্দুপাড়ার আদ্দেকই তো সাফ হয়ে গেল। কামলা খাটাবে কারা ?

—রসুল ! চৌকিদার একটু ঢোক গিলে বলতে থাকে,—আমার ঘরের চালখান একেবারে হলহল করে। সারাব সে পয়সা নাই। শালারা যে মাইনা দেয়, তা দিয়ে এক বেলাও পেট ভরে না।

চৌকিদারের পেটের কথা টের পেয়ে রসুল তার পূর্বপ্রসঙ্গের জের টেনে চলল, যেন অপর পক্ষের মাঝখানের বক্তব্য তার কানেই যায়নি।

—চাচা নগদ কাম আর কটা পাই ! তার উপর টাকার তাগাদা দিলেই মিঞাঁরা তখন মুখ ব্যাজার করে। এই ছাখো না, মুজিবর

রহমনের ঢেঁকিবেড়া বেঁধে দিয়েছি তিন মাসের উপর হয়ে গেল। ঘষা পয়সাও ছোঁয়ায়নি এখনো। তারিণী ঘোষালের দক্ষিণের বাগানের চার-চারটা মাদার গাছ কেটে উয়াগরে ছ-মাসের লাকড়ি ফেঁড়ে দিয়েছি তা-ও, হ্যাঁ, ছ-সাত মাসের কথা। সেই পাওনারও অদ্দেকই বাকি।

রসুলের এতক্ষণের এই অভিযোগ রহমত আলীরও যেন কানে ঢোকেনি এমনি তার ভাবখানা। সে আর ইতস্তত না করে সোজা বলেই ফেলল,—সময় করে একদিন গিয়ে আমাব ঘরের চাল ছেয়ে দিয়ে আয় রসুল! ভয় নাই। টাকাটা আস্তে আস্তে দেব।

—তোমার শখ ত কম না চাচা! বেশ একটু তিক্ততা মিশিয়েই রসুল কথাটা বলল। কিন্তু পরক্ষণেই রাগ সামলে নেয়। শত হলেও চৌকিদার —থানার তাঁবেদার। কেঁচো হলেও দেখতে শুনতে সাপেব জাত! রসুল এবার কৈফিয়তের সুরে জানায়,—আমার সময় কই চাচা! আমি আছি পেটের ধান্দায়। দশ দুয়ারের ঘুরি কাজকামের তালাশে।

চৌকিদার হাসে। গলা খাটো করে হেসে হেসেই খোঁচা দেয়,—হুঁ! রাত দুপুরে বাইরে যাস বুঝি কাজকামেরই তালাশে?

রসুলও তার কানের কাছে মুখ নিয়ে সহাস্যে পালটা খোঁচা দেয়, —আমি রাত্তিরে বার হলে তুমিও তো ভাগ পাও। পাও না?

—হ্যাঁ, পাই। দফাদার আর ছোটবাবুরে বখরা দিয়ে আমার হাতে কি থাকে শুনি? জানিস তো সবই।

ঘরের মধ্যে দুয়ারের ওপিঠে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণু আমিনা কাচের চুড়ির আওয়াজ করে স্বামীকে নোটিস দেয়। রসুল তা শুনেও শোনে না। চৌকিদারেরও উঠবার লক্ষণ দেখা যায় না। পরস্পরের সুখদুঃখের কথায় দুজনে মেতে উঠেছে।

রহমত আলি এবার সমবেদনার সুরে বলল,—রসুল! তুইও ঠকিস, আমিও ঠকি। সব রজব আলি খাঁর পেটে যায়।

—তার আর দোষ কী চাচা! আমি একেবারে ঘরে হাঁড়ি চড়িয়ে গিয়ে হাজির হই। নগদ-নগদ যা পাই তখন তা-ই সই।

—তুই একটা উজবুক রসুল! অত ভালো মানুষ হলে চলে! চাপ দিবি, দরাদরি করবি। বখরায় এত ফারাক হলে শুনব ক্যান?

পোদ্দারের পো নিজে এসে থানায় এজাহার লিখিয়ে গেল, দেড় ভরি সোনা। শালা খোলতদার বলে কিনা এক-আনি-কম এক ভরি!

মাসখানিক আগে মধ্যরাত্রে উমেদপুরের রসিকলাল পোদ্দারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর আড়াই বছরের মেয়েটার গলা থেকে দেড় ভরির একটা সোনার হার ছিঁড়ে ছিনিয়ে নিয়ে এসে রসুল পেয়েছিল সতের টাকা সাড়ে দশ আনা।

চাপা গলায় চৌকিদার তড়পাচ্ছে,—হারামির বাচ্চা ভাবে সোনার বাজার দর আমরা জানি না।

—জেনে লাভ কি চাচা! থানার বাবুগরে কাছে ঐ হারামজাদার খাতির কত! সে-কথা তুমিও জানো, আমিও জানি।

চৌকিদার চুপ করে যায়। খানিক ধোঁয়া ছোড়ে রসুলের হাতে হুঁকোটা দিয়ে আবার বলতে থাকে,—ব্যাটার পেটে পেটে সন্দ—তুই মাল নিয়ে আর-কারো কাছে যাস।

রসুল জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকে।

—মাস-দুই রাত্তিরে তুই বার হোসনি, মনে আছে? শালা আমারে কয়, রসুল আজকাল পীরপয়গম্বর হল নাকি রে! রোজ রাত্তিরে চৌকি দিতে বার হয়ে খোঁজ নিবি বাড়ি থাকে কিনা।

রসুল একটু উত্তেজিত হয়ে বলে,—বাইরে বার হব কি উ-শালার গরজে না আমার নিজের গরজে?

চৌকিদার হেসে ওঠে,—তোর চেয়েও উয়ার গরজই বেশি।

রসুল গরম হয়ে ওঠে।

—চাচা! মাঝে মাঝে আমার কী ইচ্ছা হয় জানো? একদিন সিঁধ কেটে ঢেমনির বাচ্চার ঘরের মধ্যে ঢুকে টুঁটি চেপে বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসে বলি, খোল তোর লোহার সিন্দুক। এদ্দিন ধরে ঠকিয়ে এসেছিস, তার সব আজ একদিনে সুদে-আসলে উসুল করে নিয়ে তবে যাব।

চৌকিদার হো হো করে হেসে পরক্ষণেই ফিশফিশ করে বলে,—সে কী করে হবে রে! শালার যে পাকা ভিটা। শক্ত ইটের গাঁথনির উপর তুই লোহা ছোঁয়ালেই পাড়ার লোকেও যে জেগে যাবে।

রসুল নিরাশ হয় অপরিসীম। বেশ জানে, তার এই প্রচণ্ড সাধ

এ-জীবনে সে মেটাতে পারবে না। মুহূর্তের বজ্রমুষ্টি অন্ধকারে আবার মুহূর্তেই শিথিল হয়ে গেল।

রাত্রির দ্বিপ্রহরের শিবাকুল ডেকে উঠল। আমিনা ঘনঘন চুড়ির আওয়াজ করে। স্ত্রীর অসন্তোষ এবার রসুলের কানেও যায়, মনেও যায়। একটা হাই তুলে বলে,—বড় ঘুম পেয়েছে চাচা। শরীলটা আজ ভালো নাই।

রহমত আলি মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—তুই তো এখন আরামে ঘুমাবি। আমার বুঝি ঘুম আছে! রায়বাড়ির গানের আসর ভাঙলে বাবুগরে আবার থানায় রেখে আসতে হবে।

দাওয়া ছেড়ে উঠোনে নেমেও চৌকিদারের মুখ কামাই নেই,—হারামির বাচ্চারা না পড়ে পাঁচ-ওক্ত নামাজ, না রাখে রোজা। আবার কেষ্ট ঠাকুরের লীলাকেত্তন শুনতে গেছে!

চৌকিদার চলে যেতেই আমিনা বাইরে এসে দাঁড়ায়। তার সরোষ গাম্ভীর্যের আঁচ পেয়ে রসুল নরম হয়ে গিয়ে বলে,—রাগ করিস না বিবি! ঘাবড়াস ক্যান? কত আর রাত হয়েছে?

আমিনাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রসুল হনহন করে উঠোন পার হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝুপঝুপ করে শুরু হয়ে গেল এক পশলা বৃষ্টি।

আবার ফিরে আসতে যায়। ঘরে ঢুকে প্রথমেই রসুল বউকে নিশ্চিন্ত করতে চায়,—উটকো বিষ্টি। এখনই থেমে যাবে। ভালোই হল। বিষ্টির পানিতে ভিটার মাটি নরম হয়ে থাকবে খন। চুপ করে আছিস ক্যান? ঘুম আসছে?

—না।

—তবে?

—চৌকিদারের কথা তুমি শুনো না।

—কোন কথা?

—খবরদার! খাঁ সাহেবের লগে কাজিয়া করতে যেও না।

—ভয় লাগে তোর? রসুল হেসেই প্রশ্ন করে।

—হুঁ।

—পিঠটা একবার চুলকে দে তো। শিরদাঁড়ার উপরে—হ্যাঁ এই ঘাড়ের নীচে।

স্বামীর পিঠ চুলকে দিতে-দিতে আমিনা উপদেশ দেয়,—আমাদের গরিব-গরবার উসব তুষ্টু লোকের মন রেখেই চলতে হয়। ত্যাখো না, হিঁতুরা শীতলার পূজা দেয়, মা-মনসার পূজা করে। ক্যান করে ?

বাইরের জোর বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রসুল অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে, —কী সোন্দর কথা বলছিস আমিনা! উ শালা সাপ! হাজার গোখুরো সাপ মরে গিয়ে এক রজ্জব আলি খাঁ পয়দা হয়।

আমিনাও সশব্দে হাসে স্বামীর বাকপটুতায়। রসুল দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে বলল,—চৌকিদার হয় কী করে শুনবি ? হাজার হাজার শকুন মরলে তবে রহমত আলি জন্মায়।'

আমিনা আরো জোরে হাসে—অন্ধকারে খিলখিল হাসি।

—আর, জানিস আমিনা, হাজার হাজার পাতিশেয়াল মলে একটা আবতুল্লা রসুল জন্ম নেয়।

মুহূর্তেই আমিনার হাসি বন্ধ হল। জোর প্রতিবাদ জানায়,—না-না-না।

—তুই 'না' বললেই তো আর 'না' হয় না—আমার নসিব মন্দ! তা নাইলে ঐ বেজন্মাগুলোর খপ্পরে পড়ি!

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে আসে। রসুল নির্বাক। চুপ করে বসে রইল আমিনাও। বৃষ্টি এবার থামি-থামি করে। গাছপালা আর ঘরের চালা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় আকাশের অশ্রুবর্ষণ যেন এই তুটি প্রাণীর মনের মধ্যেও নেমে এসেছে।

কিন্তু বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকা রসুলের ধাতে নেই। এক প্রসঙ্গ থেকে আর এক প্রসঙ্গে সে লাফিয়ে চলে বেড়ালের বাচ্চার মতো। খানিক বাদেই আবার স্বাভাবিক গলায় বলে,—আমিনা! চৌকিদার কিন্তু ঠিক কথা কইল না।

—কী ?

—হিঁতুবাড়ির কেষ্টলীলা দেখলে মোছলমানের গুনাহ হবে ক্যান ?

হিঁদুরা পীরের দরগায় শিন্নি দেয় না ? মুশকিল আশানে পয়সা ছায় না ? ইতে বুঝি উয়াগরে পাপ হয় ?

আমিনার কাছে এসব কথা নতুন নয়। এক বিশেষ ক্ষণে স্বামীর মুখে ধর্মসমন্বয়ের এই উদার তত্ত্বকথা সে বহুবার শুনেছে।

—ঠিক কিনা বল। হিঁদুঘরে ঝাড়ফুঁক তুকতাকের সবই যদি ঝুটা হয়, তবে এতকাল উয়ারা বেঁচে-বর্তে রইল কী করে ? আর, মোছলমানের কোরান আর হাদিস যদি সাচ্চাই না হবে, তবে কবে জাহান্নমে যেত তামাম ছনিয়া।

বৃষ্টি থেমেছে। রসুল উঠে দাঁড়ায়। পিছনে আমিনাও যায় দোর-গোড়া পর্যন্ত।

—এবার ঘুমা দিকিন। তোরে আমি ভালো করে একটু ঘুমাতেও দেই না। কী নশিব নিয়েই এসেছিস আমার কাছে। আমিনার নাকের ডগা আদর করে টিপে ধরে রসুল হেসে হেসে বলে,—আমি যদি তোর বউ হতাম আমিনা, তবে কবে ছেড়ে চলে যেতাম তোর এই পোড়া সংসারের মুখে লাথি মেরে।

স্বামীর গা ছুঁয়ে আমিনা মন্ত্র পড়ে দিল।

—কপপল, ঝপপল, খপপল···

খালের উপরের বাঁশের সাঁকোটি জলেকাদায় পিছল হয়ে আছে। বেশ হুঁশিয়ার হয়ে পার হতে হল। পার হতে না-হতেই আবার এক হুর্বিপাক। বহুলোকের গলার আওয়াজ এগিয়ে আসছে। একেবারে কাছাকাছি এসে পড়ল। রসুল উলটো দিকে খানিক দৌড়ে যায়। সামনে একটা বাঁশঝাড়। তার আড়ালে গিয়ে রসুল নিশ্চিন্তে গা-ঢাকা দিল। অন্ধকারে মিশে গেল ভিজা মাটির সঙ্গে, এত রাত্রে এরা সব কোথা থেকে আসছে, কোথায় গিয়েছিল, কেন গিয়েছিল সব কথা রসুল জানে। জানে বলেই এত ভয়, এবারের ভয় ধরা পড়ে থানায় যাবার ভয় নয়—লজ্জায় মরে যাবার ভয়, ইজ্জত খোয়াবার ভয়···

আজকের দিনটা কি অপয়া। রসুল কান খাড়া রেখে ভাবতে থাকে

বিসমিল্লাতেই অযাত্রা—থানার শকুনের পাল। তারপরেও পদে পদে কেবল বাধা—নাছোরবান্দা চৌকিদার, অসময়ে অন্যায় বৃষ্টি, রাত দুপুরে গাঁয়ের লোকের এই অকাল উৎপাত······

একটা টিমটিমে হ্যারিকেনের আলোয় স্পষ্ট করে কারো মুখ দেখা যায় না। কানে আসে কেবল অনেকগুলি চেনা গলার আওয়াজ: ফররুক আহমদ, শাহেদ আলি, আশরাউদ্দিন, সিরাজুল, ইসলাম, মনসুর চাচা, ভাইসাব শামশের, আলি আহসান, হাতেম খালি, মনসব চাচার তের-চোদ্দ বছরের একমাত্র পুত্র সন্তান খালেদ—

থানার লোকজনের মতো এরা কেউ রসুলের পর নয়। তারা তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের উদয়াস্ত জীবনের, একান্ত কাছের মানুষ তারা সকলেই। তবু এই মধ্য রাত্রে মনে হয় এরা এক আলাদা জগতের লোক, যেন এক আলাদা জাতের মানুষ, দলছাড়া গোত্রছাড়া রসুলের এই সৃষ্টিছাড়া জগতের সঙ্গে তাদের, এখন, কোনো মিল নেই কোনখানে।

নিরুদ্ধ নিশ্বাসের কয়েক মুহূর্ত। রসুল গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। আবার রাস্তার উপরে এসে দাঁড়ায়। চাষিপাড়ার মধ্য দিয়ে যেতে আজ ভরসা পায় না। এইটুকু পথ আসতে-আসতেই সে টের পেয়ে এসেছে, চাষিপাড়ারও চোখে আজ ঘুম নেই তারই মতো, ঘরে ঘরে চাপা উত্তেজনা কাল সকালের শক্তিপরীক্ষার মানসিক উদ্যোগ-আয়োজন।

মাঠের ঘুরপথে রসুল দত্তপাড়ার দিকে চলল। সরাইলের কুকুরটার অতিসজাগ কান আর রসুলের অতি সতর্ক পদক্ষেপের মধ্যেও আজ চূড়ান্ত একটা শক্তি পরীক্ষা হবে।

মাঠের জলকাদা ভেঙে খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে কী ভেবে রসুল আবার ফিরে চলল। চাষিপাড়ায় মধ্য দিয়েই সে সোজা পথ ধরল সময় বাঁচাবার জন্যে।

আমিনা দুয়ার খুলে দিতেই ঘরে ঢুকে রসুল গম্ভীর হয়ে জানায়, —আজ গতিক ভালো না লো! একটার পর আর-একটা ফ্যাকড়া! তোর মন্তরটা আর-একবার মন লাগিয়ে পড়ে দে।—একটু সবুর কর। এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাই।'

তামাক সাজতে বসে রসুল বলে,—আমিনা! তুফান উঠবে।

—তালে আজ আর বার হয়ো না।

—আরে মাগি, ই-তুফান সে-তুফান না। গাঁয়ের মধ্যে এক চক্কর ঘুরে আয়, টের পাবিখন। তোর চুলার উপরের গলা-সমান ফ্যানা-ভাতের হাঁড়ির মতন খালি টগবগ টগবগ করে।

—কী ব্যাপার ?

—বাঘে-মোষে লড়াই হবে। কুতুবপুরের পাঁচ-আনির জমিদার কাল লেঠেল লাগিয়ে তার খেতের ধান সব কেটে নিয়ে যাবে। হেঁ হেঁ। অতই সহজ! তার আগেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে দেখে নিস। গেরামের চাষিরাও কোমর বেঁধেছে। শেষ রাত্তিরে আবার সব মুন্সীবাড়ি গিয়ে জমা হবে। তার দু-ভাগ বুঝে পেলে তবে নাকি জমিদারের ভাগ।

—তা হলে একটা লাঠালাঠি কাণ্ড হবে ?

—হবেই তো।

আমিনা বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করে,—উই-এর পাখনা গজিয়েছে, এবার পুড়ে মরবে।

—লেজ্য কথা বলেছিস আমিনা। দরিয়ায় বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে ফয়দা হবে কচু! মাঝখানে থে দু-দশটার মাথা ফাটবে, দশ-বিশজন হাজতে যাবে, এক-আধটা লাসও ভাসবে আইরাল খাঁ নদীয় সোতে।

হুঁকোয় একটা জোর টান মেরে রসুল বলল,—বল দেখি খালেদটা নাচে কোন্ শখে!—তোর বয়সটা কীরে ? তোরে জন্মাতে দেখলাম এই তো সেদিনের কথা—আমার আব্বা সেবার ফাটকে গেল।—জানিস আমিনা, আজ সকালে হাতেম আলি আমারেও সন্ধ্যার পরে মুন্সীবাড়ি যেতে কয়েছিল।

—খবরদার! আমিনা আঁতকে ওঠে,—তুমি কৈল উ-সব হাঙ্গামা-হুজ্জতের মধ্যে থাকতে পারবা না।

—তুই পাগল নাকি! রসুল বউকে অভয় দেয়,—আমি কি কুত্তা ? আ-তু করে ডাক দিলেই ছুটে গিয়ে হাজির হব! ক্যান যাব ? আগে মিঞারা কবুল কর : ক মণ ধান পাব—ধান না পাই, ক গণ্ডা টাকা পাব। তবে তো!

—তালেও না।

অন্ধকারে অনুমানে রসুল অনুমান করে আমিনার ভয়াতুর মুখখানি।

—ডরাস না তুই। উ-সব খুন-খারাবির মধ্যে আমি নাই। জানিস তো, আমার আব্বা চরদখলের হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে নিজেও ডুবল, আমারেও ডুবিয়ে রেখে গেল। তোরে আর ছেলেটারে আমিও বুঝি মাঝ-দরিয়ায় ভাসিয়ে দেব? তুই খেপেছিস?

আমিনা চুপ করে রইল। তার ভয় ভাঙল কিনা বোঝা যায় না। অন্ধকার বিছানাটা একবার হাতড়ে রসুল বলে,—ছেলেটা একেবারে উদ্‌লা। আমার গামছাখানা বুকের উপর দিয়ে রাখ। শেষ রাত্তিরে ঠাণ্ডা পড়বে।

রসুল উঠে দাঁড়ায়। আমিনা অনুরোধ জানাল,—আজ দরকার নাই বাইরে যাবার! কাল সকালে না হয় বদনাটা বেচে দিও।

রসুল চুপ করে রইল। বাপের আমলের একমাত্র নিদর্শন ঐ বদনাটা। ওটা হাতছাড়া হবার আগে রসুল একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে কাঁসারী পাড়ায়। আজ দুপুরে বাড়ি ফেরার পথে দেখে এসেছিল দীননাথ কাঁসারী উঠানের মাঝখানে রৌদ্রে ধান শুকোচ্ছে। সে ধান মুড়ির ধান বা যে কোনো ধানই হোক না কেন, সের কয়েক ধান আজ রাত পোহাবার আগেই তার চাই।

বদনাটার উপর স্বামীর টান যে কতখানি তা আমিনা ভালোই জানে। ভুল বুঝতে পেরে এবার অনুচ্চ কণ্ঠে সে আর-এক উপায় বাতলে দেয়,—আজ আর দূরে যেয়ো না। আমাগরে পাড়ার মধ্যে একবার···

—কী! শেষকালে চাষির ঘরে সিঁধ কাটতে হবে? আমি চাষির ব্যাটা না? আমার আব্বাজানেরও জমিজমা ছিল, হালের গরু, জোয়াল-মই সবই ছিল। তুই আমারে দোজক এ পাঠাতে চাস মাগি!

চাপা গলায় তর্জন করতে করতে রসুল দুয়ারের দিকে এগিয়ে গেল, আমিনা অপরাধীর মতো তার পিছনে এসে দাঁড়ায়। রসুল এবার কিছুটা নরম হয়ে ভারি গলায় বলতে থাকে,—তোর জিবের লাগাম নাই। যা মুখে আসে তাই বলিস।

আমিনা চুপ করে রইল।

—নে, তাড়াতাড়ি কর। রাত আর বেশি নাই। মন দিয়ে বলিস। বড় ডর লাগছে আজ। মনে তেমন জোর পাই না।

আমিনা স্বামীর গা ছুঁয়ে মুখ বিড়বিড় করে,—সাপা-বাঘা-লোহা-লাঠি নিব্বল নিচ্চল নিস্ফল।

—এবার ঘুমাগে যা। ডরাস ক্যান? আমি বেঁচে থাকতে না খেয়ে মরবি না।

আমিনা স্বামীকে একবার সতর্ক করে দেয়,—মুন্সীবাড়ির সাঁকোটা সাবধানে পাব হয়ো। বাঁশের ধরনি কিন্তু নড়বড় করে।

উঠোন পার হবার আগেই রসুলের কটা-কালো রঙ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল মিশকালো পরিবেশের সঙ্গে।

নিশুতি রাত্রির নিঃশব্দ আকাশের তলে সারা দুনিয়া এখন ঘুমে অচেতন। কিন্তু, এবাবেও রসুল টের পায়, উদ্বিগ্ন উত্তেজনায় ঘুমোতে পারছে না এই ছোট্ট গ্রামখানি। রসুল চলেছে কাঁসারীপাড়ায় ধান চুরি করতে, আর কাল সকালে এরা যাবে মাঠ থেকে ধান কেড়ে আনতে!

শেষ রাত্রি।

বাইরে থেকে গলা ছেড়ে হাঁক দেয় রসুল,—আমিনা! আমিনা!'

আমিনার তখন গভীর ঘুম। রসুল সজোরে লাথি মারে দরজায়। আমিনা ধড়ফড় করে উঠে পড়ে।

—শিগগির দরোজা খোল।

আমিনা তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলে দিল। ঘরে ঢুকেই রসুল ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে,—কুপিটা জ্বালা।

—আস্তে কথা কও। শুনতে পাবে লোকে।

—শুনুক! তুই কুপিটা জ্বেলে দে শিগগির।

আমিনা আলো জ্বালতেই রসুল ঘরের মধ্যে চারিদিকে তার সন্ধানী দৃষ্টি চালায়।

—আমার লাঠিখানা কোথায় জানিস?

—শঙ্কিত আমিনা প্রশ্ন করে,—'লাঠি দিয়ে কী করবে?

—উ-সব কথায় তোর মেয়েমানুষের কী দরকার! লাঠি কোথায় রেখেছিলাম দেখেছিস ?

—সে কি! আমিনা অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে।

—চিল্লাস না মাগি! ধমকে ওঠে রসুল।

—খোদার কশম! রক্তারক্তি কাণ্ডের মধ্যে তুমি যেতে পারবা না।

আমিনা স্বামীর পথ রোধ করে দাঁড়ায়। হাতের এক ঠেলায় বউকে পাশে সরিয়ে রেখে রসুল এগিয়ে যায় মাচানের কাছে। পিছনে পিছনে আতঙ্কিত আমিনা। লাঠি মাচানের নীচে নাই। রসুল একবার বিছানার শিয়রের কাছে খোঁজে। পিছনে নির্বাক আমিনা। খোঁজে ঘরের একোণে ওকোণে। সঙ্গে সঙ্গে আমিনাও তার পায়ে-পায়ে। আবার ফিরে গেল মাচানের কাছে। বাণবিদ্ধ পলাতক হরিণের পিছে-পিছে এক বেদনাতুর বিহ্বল হরিণীর মতো আমিনাও লেগেই আছে। মাচানের উপরে রাজ্যের মাটির হাঁড়ি কলসির মধ্যে থেকে লম্বা একটা লাঠি টেনে বার করল।

ঘণ্টা দুই আগের মেষশাবকের এখন বাঘের বিক্রম!

আমিনা চেয়ে চেয়ে দেখছে খালি। মুখে কথা নেই। ভয়ে বুকখানা কাঠ হয়ে গেছে।

—জানিস ভাগের ধান পাব। কথা দিয়ে ফেলেছি। মরদের বাত। নড়চড় হবার জো নেই। যেতেই হবে। সবাই মিলে জান দেবে তবু ধান দেবে না।

—আল্লার দোহাই। আমিনা শেষ আবেদন জানায়।

—চুপ যা! তা নইলে এই লাঠি দিয়ে আগে তোর মাথাটাই এখানে রেখে যাব।

আমিনা দুয়ারের কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

একদৃষ্টে চেয়ে আছে উন্মত্ত স্বামীর দিকে। বুঝতে পারল, বাধা দিলে ফল হবে না। মানুষটা আর সে-মানুষ নেই। তাড়া-খাওয়া এক বুনো শুয়োরের গোঁ।

—আমার গামছাখান কই?

আমিনা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ার্ত চোখে দেখছে স্বামীর

অনাড়ম্বর রণসজ্জা! বিছানার কাছ থেকে ছেঁড়াখোড়া গামছাখানা কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় জড়িয়ে নেয়।

বাইরে তখন বহু লোকের গলার আওয়াজ। কে একজন হাঁক দেয়, —রসুল! আর কত দেরি?

—যাই।

দুয়ারের এপিঠে কম্পিত হস্তে আমিনা স্বামীর কাপড়ের খুঁট ধরে ফেলে জানায়,—একটুন দাঁড়াও। মন্তরটা পড়ে দেই।

—রাখ মাগি তোর মন্তর! বলেই রসুল একলাফে দাওয়া ছেড়ে উঠোনের মাঁঝখানে গিয়ে পড়ে। সে কি কোন গুপ্ত কর্মে যাচ্ছে যে, গুপ্ত মন্ত্র শুনবে? রসুল এখন আর-এক মন্ত্রের টানে দশ জনের সঙ্গে বুকটান করে সারা দুনিয়ার বুকের উপর দিয়ে প্রকাশ্যেই একটা পুরুষের মতো, একটা বাপের ব্যাটার মতো কাজ করতে চলেছে—একটা কাজের মতো কাজ!

আমিনার বুকের মধ্যে তখন উপর্যুপরি ঢেঁকির পাড়। তার প্রার্থনার ভাষাটাও কেঁপে কেঁপে ওঠে—খোদা-তালা তুমি দোয়া করো!

মোরগের ডাকে ডাকে অন্ধকার বিদায় নিচ্ছে। ভোরের পানসে আলোয় আমিনা স্পষ্ট দেখতে পেল, জন পঁচিশেক লোকের হাতে হাতে লাঠি-সড়কি। সেই চলন্ত ভিড় এগিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে এক অমঙ্গলের অন্ধকারে।

আমিনা তখনো বিপদের মন্ত্র আওড়াচ্ছে,—কপপল, ঝপপল, খপপল···

ছিনিয়ে খায়নি কেন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়



মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম সাঁওতাল পরগণার দুমকা অঞ্চলে ১৯শে মে, ১৯০৮ সালে। পৈত্রিক বাড়ি বর্তমান বাঙলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মালবাদিয়াতে। আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দোপাধ্যায়। প্রথম গল্প 'অতসী মাসী' তিনি বাজি ধরে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় লেখেন। লেখকজীবন শুরু হওয়াব অল্পদিনের মধ্যে তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৪৪ সালে 'তনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিমি কমিউনিস্ট পার্টিব সদস্য ছিলেন। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনেব ধাওা তিনি যেভাবে উর্ধ্বে তুলে ধবেন তা উত্তবসূরী লেখকদের ·প্রেরণা জাগায এবং পথনির্দেশ করে। রসিদ আলি দিবসেব স্মৃতি নিযে লেখা 'চিহ্ন', 'খতিয়ান' এবং 'আদায়ের ইতিহাস' ঐতিহাসিক কাবণে উল্লেখযোগ্য। তিনি অসংখ্য গল্প উপন্যাস লিখে গেছেন। উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' এবং ছোট গল্প 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'হারানের-নাতজামাই' এর মধ্যে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তাঁব অনেক লেখা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হযেছে।

'দলে দলে মরছে তবু ছিনিয়ে খায়নি। কেন জানেন বাবু?'

একজন নয়, দশজন নয়, শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে বরবাদ হয়ে গেছে, ভিক্ষের জন্যে হাত বাড়িয়েছে, ফেন চেয়ে কাতরেছে, কুত্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই করে ময়লার ভুর হাতড়েছে, কিন্তু ছিনিয়ে নেবার জন্যে, কেড়ে নেবার জন্যে হাত বাড়ায়নি, অথচ হাত বাড়ালেই পায়। দোকানে থরেথরে সাজানো রয়েছে খাবার, সামনে রাস্তায় ধন্না দিয়েছে ফেলে দেওয়া ঠোঙার রসটুকু চাটবার জন্যে। হাটবাজারে রয়েছে ফলমূল তরি-তরকারি, দোকানে আড়তে চাল ডাল তেল নুন, লুকানো গুদোমে চালের পাহাড়, বড়লোকের ভাঁড়ারে দশ বিশ বছরের ফুড —ফুড কথাটা চালু হয়েছে বাবু আপনাদের কল্যাণে, ভোঁতকা গাঁয়ের হোঁতকা তাঁতিও জানে কথাটা আর কথাটার মানে। গরিবের মুখে না উঠে যে চাল ডাল তেল নুন গুদোম থেকে গুদোমে কেনাবেচা হয়ে চালান যায়, তাকে বলে ফুড। হ্যাঁ, মাছ-মাংস দুধ-ঘিও ফুড বটে। দশটা জিনিসের দশটা নাম বলতে লিখতে কষ্ট হয় বলে আপনারা ফুড চালিয়েছেন, চেঁচিয়েছেন ফুড সমস্যার বিধান চাই। তা, অত কষ্টে কাজ কি ছিল! ফুড না বলে চাল বললেই হত। শুধু চাল কাঁড়া-আঁকড়া, পোকায় ধরা, যেমন হোক চাল। মাছ-মাংস, দুধ-ঘি, তেল-নুন এসব দশটা জিনিস তো চায়নি যারা না খেয়ে মরেছে। শুধু দুটি চাল দিলে হত তাদের, ফুডের জন্য মাথা না ঘামিয়ে, গাছে পাতা আছে, জঙ্গলে কচু আছে। তারা মরত না। রোজ দুটি আসেদ্ধ শুকনো চাল চিবিয়ে খেলেও মানুষ মরে না। আপনি মানবেন না, কিন্তু সত্যি মরে না বাবু। যত কেলিয়ে যাক, ধুকধুক প্রাণডা নিয়ে জীবন্ত থাকে।'

চালার বাইরে ক্ষেতখামার আম-জাম কাঁঠাল ঘেরা খড়ো ঘরগুলিতে বেলা শেষের ছায়া গাঢ় হয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যায়। উবু হয়ে বসে আনমনে যোগী জোরে টানে তামাকের ধোঁয়ায় বুক ভরে নিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়াটা বার করে দিতে থাকে। সামনেই টানছে তামাক, আড়াল খোঁজেনি, একটু পিছু ফিরে বা একটু ঘুরেও বসেনি। এটা লক্ষ্য করবার

বিষয়। তামাক সেজে আগে অবশ্য আমাকেই বাড়িয়ে দিয়েছে ডান হাতে খেলো হুঁকোটা ধরে, বাঁ হাতে সেই হাতের কুনুই ছুঁয়ে থেকে। জলহীন হুঁকোয় অত কড়া তামাকের তপ্ত ধোঁয়া টানবার ক্ষমতা প্রথম বয়সে ছিল, এখন আর পারি না। সিগারেট ধরিয়ে যোগীকেও একটা অফার করেছিলাম, মৃদ হেসে সিগারেটটা নিয়ে সে গুঁজেছিল কানে।

শুনেছিলাম সে নাকি নামকরা ডাকাত, তার নামে লোকে ভয়ে কাঁপে। যে রকম কল্পনা করেছিলাম, চেহারাটা মোটেই মেলেনি তার সঙ্গে। বেঁটে খাঁটো লোকটা, শরীরটা খুব শক্তই হবে, আর কিছুই নয়। বাবরি ছাঁটা ঝাঁকড়া চুল পর্যন্ত নেই। জেলে হয়তো ছেঁটে দিয়ে থাকবে কদম ছাঁট করে, এখনো বড় হবার সময় পায়নি। এদেশের রণ-পা চড়া, লাঠি ঘুরিয়ে বুলেট ঠেকানো, নোটিশ দিয়ে ধনী জমিদারের বাড়ি ডাকাতি করতে যাওয়া, বড় লোকের ওপর ভীষণ নিষ্ঠুর, গরিবের ওপর পরম দয়ালু, ধুর্ত, উদার বিখ্যাত ডাকাতদের কাহিনীতে তাদের বিরাট দেহ আর অদ্ভুত অমানুষিক শক্তির কথা পড়েছি। যাদের ভীষণ আকৃতি দেখলেই লোকের দাঁত কপাটি লাগত, হুঙ্কার শুনলে কয়েক মাইল তফাতে গর্ভপাত হত স্ত্রীলোকের। বড়লোকের টাকা লুটে তারা গরীবকে বিলিয়ে দিত। দুর্ভিক্ষের সময় যোগী ডাকাতও নাকি মানুষ বাঁচাবার মহৎ কাজে নেমেছিল। সেবাও করত পথে ঘাটে মুমুর্ষুর, সুযোগ মতো চুরি ডাকাতি করে খাদ্য জুটিয়ে বিলিয়ে দিত। কয়েকটা মেয়েকে ক্রেতার কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাঁচিয়েছে। শোনা যায় সাতকোশী খালে সরকারী চালের নৌকায় ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে দুবছর জেল হয় তার।

যোগী কথার সূত্র হারিয়ে ফেলেছে বুঝে মনে করিয়ে দিলাম,—'মরছে তবু ছিনিয়ে খায়নি কেন—যে কথা বলছিলে।'

'ও, হ্যাঁ বাবু হ্যাঁ। আমি জানি কেন ছিনিয়ে খায়নি, শুধু আমি, একমাত্তর আমিই জানি, কেউ জানে না, আর আপনার মতো অনেক বাবুকে শুধিয়েছি, তারা সবাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এটা সেটা বলেন, বড় বড়

কথা। আবোলতাবোল লম্বাচওড়া কথা।। আসল ব্যাপারে সেরেফ ফাঁক। বোঝেন না কিছু, জানেন না কিছু, বলবেন কি। এক বাবু বললেন, —বেশীর ভাগ তো গরিব চাষী, নিরীহ গোবেচারা লোক, কোন কালে বে-আইনী কাজ করেনি। লুট করে কেড়ে নিয়ে খাবার কথা ওরা ভাবতেও পারে না।

শুনলে গা জ্বলে বাবু! সাধ যায়, না চাঁছা গালে একটা থাপড় দিয়ে কানডা মলে দিতে? বে-আইনী কাজ, বে-আইনী। যে জানে মরে যাবে কেড়ে না খেলে, সে হিসেব করছে কাজটা আইনী না বেআইনী, ছিনিয়ে খেলে তাকে পুলিশ ধরবে, তার জেল হবে। জেলে যেতে পারলে তো ভাগ্যি ছিল তার। মেয়ে বৌকে ভাড়া দিচ্ছে, বেচে দিচ্ছে, সুযোগ পেলে তার চেয়ে কমজোরী মর-মর সাথীর গলা টিপে মেরে ফেলছে যদি একমুঠো খুদ জোটে, তার কাছে আইন। আরেকবাবু বললেন,—ওটা কি জান যোগী, ওরা সব মুখ্যু গরিব, চাষা-ভূষো মানুষ, অদেষ্ট মানে। না খেয়ে মরতে হবে, বিধাতার এই বিধান, উপায় কি— এই ভেবে মরেছে না খেয়ে, লুটে পুটে খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেনি।

শুনেছেন বাবু কথা, আঁত জ্বালানি পণ্ডিতি কথা? সাপে কাটে, রোগে ধরে, আগুন লাগে, বন্যা হয়, আকাল আসে সব অদেষ্ট বটেই তো, কে না জানে সেটা? তাই বলে সাপে কাটিলে বাঁধন আঁটে না, ওঝা ডাকে না? রোগে বড়ি-পাঁচন, শিকড়, পাতা খায় না, মানত করে না? ঘরে আগুন লাগলে দাওয়ার বসে তামুক টানে? ফসল বাঁচাতে যায় না বন্যা এলে? আকাল আদেষ্ট বলে কেউ ঘরে বসে হাত-পা গুটিয়ে মরেছে একজন কেউ ওদের? যা কিছু আছে বেচে দেয়নি বাঁচার জন্যে, ছেলেমেয়ে, বৌ, বোন শুদ্ধ? ছুটে যায়নি শহরে, বাবুদের রিলিফ খানায়? অদেষ্ট মানে, হ্যাঁ, অদেষ্টে মরণ থাকলে মরবে জানে, হ্যাঁ, তাই বলে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচতে পারলে চেষ্টা করে দেখবে না এক-বারটি? আরেক বাবু বললেন—'

'বাবুরা কি বলেন জানি যোগী। তোমার কথা বল।'

'শোনেন না বাবু মজার কথা, হাসি পাবে শুনলে। বললেন কি? না আধপেটা খাওয়া, উপোস দেয়া ওদের চিরকেলে অভ্যাস। ঘটিবাটি,

জমিজমা তো চিরজন্মোই বেচে আসছে পেটের জন্যে। আকাল তো ওদের লেগেই আছে বছর বছর। বলতে বলতে গলা সত্যি ধরে এসেছিল তেনার, দুঃখীর তরে দরদ ছিল বাবুর। নাক ঝেড়ে, গলা-খাঁকরে তারপর বললেন,—বড় আকাল এল, ওরাও এইভাবে লড়াই করল বাঁচতে, চিরকাল যেমন করে এসেছে, ঘরে ভাত না থাকলে যা করা ওদের অভ্যেস।

আমি বললাম, তা নয় বুঝলাম বাবু. না খাওয়াটা ওদের অভ্যেস ছিল। কিন্তু মরাটাও কি অভ্যেস ছিল বাবু?'

যোগী হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়ে। বুঝতে পারি অনেকবার অনেককে শোনালেও এই পুরানো মর্মান্তিক রসিকতার রস তার কাছে জোলো হয়নি।

'বললাম, ধরুন একটা দোকান, তাতে কিছু চাল আছে। দোকানে লোক মোটে দুটো কি তিনটে। সাতদিন উপোস দিয়ে আছে এক কুড়ি দেড় কুড়ি লোক, জানে যে চাল কটা পেলে বাঁচবে নয়তো মৃত্যু নির্ঘস। অত সব নয় নাই জানলো, পেটে তো-খিদে ডাকছে। হানা দিয়ে চাল কটা ছিনিয়ে নিলে ঠেকাবার কেউ নেই। তা না করে ফেউ ফেউ করে শুধু ভিক্ষে চাইল কেন ওরা? দোকানী দূর দূর করে খেদিয়ে দিতে আবার গেল কেন অন্য যায়গায় ভিক্ষে চাইতে? এমন কত দেখেছি, সহজে ছিনিয়ে নেবার খাসা সুযোগ কিন্তু ছিনিয়ে না নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে দয়া চেয়েছে, না পেয়ে মরেছে। বাবু আমতা আমতা করে একটা জবাব দিলেন। সেই অভ্যেসের কথা, দশজনে মিলে দল বেঁধে লুট করতে কি ওরা জানতো, না কথাটা ভাবতে পেরেছে, খুদকুড়ো নিয়ে বরং মারামারিই করছে নিজেদের মধ্যে। আসল কথাটার জবাব নেই। জানলে তো বলবেন? জবাবটা জানি আমি। শুধু আমি। আর কেউ জানে না। তবে বলি শুনুন।'

'ডাকতেছ?'

ঘরের-ভিতর অন্ধকারে হয়ে এসেছে, একটি প্রদীপ জ্বলতে সেদিকে নজর পড়েছিল। প্রদীপটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল কালা পেড়ে কোরা শাড়ি পরা ঢ্যাঙা একটি যুবতী। মনে হল, যোগীর উদ্ধার করা মেয়েদের

একজন নয় তো ? তার পরেই খেয়াল হল, যোগী প্রায় দুবছর জেলে কাটিয়ে মোটে মাস তিন চারেক আগে জেল থেকে বেরিয়েছে।

'তামাক দে।'

প্রদীপটা চৌকাটে বসিয়ে দিয়ে সে তামাক সাজতে গেল।

'আমার পরিবার।' যোগী বলল, 'হারিয়ে গেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে একমাস দেড়মাস ধরে খুঁজে খুঁজে বার করেছি সদরে।'

ব্যাপারটার ইঙ্গিত বুঝে চুপ করে রইলাম, বাইরে দিনের আলো নিভে গিয়ে প্রায় গোটা চাঁদটার জ্যোৎস্না তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'যা বলছিলাম বাবু। সর্বোনাশা দিনগুলির কথা জানেন তো সব, নিজের চোখে দেখেছেন সব। আপনাকে বলতে হবে না বন্ননা করে। আমি তখন হকচকিয়ে গেছি। না খেয়ে লোক পথেঘাটে মরছে দেখে মনে বড় কষ্ট। আর গায়ে জ্বালা, ভীষণ জ্বালা, সা জোতদার, নন্দ আড়তদার, সরকারী কর্তা করিম সায়েব, পুলিনবাবু—এদের কাণ্ডকারখানা দেখে এলাম। কোলকাতা গিয়ে পর্যন্ত কাটিয়ে এলাম সাতদিন, সাতদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে।

বুঝি না ব্যাপারটা কিছু, যত ভাবি মাথা গুলিয়ে যায়, অন্নের তো অভাব কিছু নেই, এত লোক মরে কেন ছিনিয়ে না খেয়ে ? গরু ছাগল তো মাঠে ঘাস না পেলে ক্ষেতে ঢোকে, মার খেয়ে নড়তে চায় না সহজে, বাগানে ফুলগাছ খায়, ঘরের চালা থেকে খড় টেনে নেয়। এগুলো মানুষ হয়ে করছে কি ? ধান চাল লুট করি দু'-এক জায়গায়, বিলিয়ে দি এদিক ওদিক, মন মানে না। একা আমি দু'-চারজনকে নিয়ে লুটে পুটে কটাকে খাওয়াবো ? বাঁধা দল আমার ছিল না বাবু কোন কালে, পেশাদার ডাকাত আমি নইকো, যাই বলুক লোকে আর পুলিশে আমার নামে অকথা কুকথা। আপনার কাছে লুকাবো না, মাঝে মাঝে দল গড়ে হানা দিয়ে লুট করেছি টাকা পয়সা, গয়না গাঁটি, মারধোর কোরেছি, কিন্তু মানুষ একটাও মারিনি বাপের জম্মে, বাপ যদি জন্ম দিয়ে থাকে মোকে। কাজ ফতে করে দল ভেঙ্গে দিয়েছি ফের।

টাকা পয়সার বদলিতে ধান চাল লুটের জন্মে দল একটা গড়তে চাইলাম, স্যাঙাতেরা কেউ স্বীকার গেল না দুজন ছাড়া। ডাকাতি

করব সোনাদানার বদলে ধান চালের জন্যে, তাও আবার বিলিয়ে দেব, শুনে ওরা ভাবল হয় মাথাটা মোর বিগড়ে গেছে একদম, নয় তামাসা করছি ওদের সাথে। দুজন যারা এল, তারা ছোকরা বয়সী, ওস্তাদ বলে মোকে মানত। দুজনকে নিয়ে মোটা দাঁও কি মারব বলুন, ছুঁক ছাঁক দু-দশ মন আলতো পেলে কেড়েনি, বিলোতে গিয়ে শুরু করতে না করতে ফুরিয়ে যায়। দেশ জুড়ে সবার পেটের চামড়া চামচিকে, কজনকে দেব আমি ? ভাবলাম দুত্তোর! এ শখের কের্দানি দেখিয়ে আব কাজ নেই। মোর দুমুঠো বালির বাঁধে কি এই মড়কের বন্যা ঠেকানো যাবে ? তার চেয়ে এক কাজ যদি করি তবে হয়তো ফল হবে কিছুটা। না খেয়ে মরছে যারা তাদের শেখাতে হবে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচতে। নিজের পেট ভরাবার ব্যবস্থা নিজে যদি না ওরা করতে পারে, আমার গরজ! না, কি বলেন বাবু ?'

সদরের মন্দ বস্তি থেকে খুঁজে উদ্ধার করে আনা যোগীর পরিবার ফুঁ দিতে দিতে কলকে এনে দেয়। কল্কের আগুনের লালিয়ে লালিয়ে ওঠা তার ভোঁতা লম্বাটে মুখে মন্দ মেয়ের বস্তির জীবনের কোন ছাপই চোখে পড়ে না, বরং শান্ত নিশ্চিন্ত নির্ভর খুঁজে পাই।

'সেই থেকে বসে আছেন', যোগী বলে কল্কেটা হুঁকোয় বসিয়ে। তার পরিবার দাঁড়িয়ে থাকে কথা শেষ হবার অপেক্ষায়। 'একটু চা দিয়ে সে ভদ্রস্থতা করব তার ব্যবস্থা নেই গরিবের ঘরে। দুটো চিঁড়ের মোয়া খাবেন বাবু, নতুন গুড়ের টাটকা মোয়া ?'

ভদ্র অতিথিকে নিয়ে তার বিপন্ন ভাব অনুভাব করে বলি, 'খাব না ? এতক্ষণ বলতে হয়। জোর খিদে পেয়েছে, আমি ভাবছি কি ব্যাপার, মুড়ি চিড়ে কিছু কি নেই যোগীর, খেতে বলছে না।'

যোগীরপরিবারের হাসিটা আধা দেখতে পাই প্রদীপের আলোয়।

'সদরে রিলিফখানা খুলেছে, খিচুড়ি বিলি করে। সটান গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। সেজে গুজে গেলাম, ছেঁড়া নেংটি পরে, উদলা গায়ে, মোচদাড়ি না কামিয়ে। তবু অন্নের অভাব তো ভোগ করিনি কোন

একটা দিন দু-চার বছরের মধ্যে, ওসব কাঁকলাসের সাথে কি মিশ খায় মোর। আড়চোখে আড়চোখে তাকায় সবাই, ভাবে যে এ আবার কোত্থেকে এল। ঝোলের মতো-ট্যাকটেকে পাতলা খিচুড়ি যে বিলোয় সে ব্যাটাচ্ছেলে মোকে দেখলেই বলে,—হারামজাদা, তুই এখানে কেন, খেটে খাবি যা।

মেয়েছেলে দু-একটা দেখে শুনে ভাব জমাতে চেষ্টা করে মোর সাথে, ভাবে যে মোর বুঝি সঙ্গতি আছে অন্তত দু-চার বেলা খাবার—চুপি চুপি শার্ট গায়ে দিয়ে ধুতি পরে শহর ঢুঁড়তে বেরুবার সময় হয়তো বা দেখে ফেলতে পারে। কান্না পেত বাবু মেয়েছেলে কটার রকম দেখে। মেয়েছেলে। হাড়ে জড়ানো সিঁটে চামড়া, তাতে ঘা-প্যাঁচড়া। আধ ওঠা চুলের জট, খ্যাপার মতো চুলকোচ্ছে উকুনের কামড়ে। মাই বলতে লবঙ্গের মতো শুকনো বোঁটা, পাছা বলতে লাঠির ডগার মতো, খোঁচানো হাড্ডি। আর কি দুর্গন্ধ গায়ে, পচা ইঁদুর, মরা সাপের মতো। তাদের চেষ্টা পুরুষের মন ভুলিয়ে একটা বেলা একটু খাওয়া যোগাড় করা পেটভরে।'

যোগী গুম খেয়ে থাকে যতক্ষণ না তার পরিবার ডালায় আট দশটি চিড়ার মোয়া আর ছোটখাট নৈবিদ্যের মতো নারকেল নাড়ু সাজিয়ে এনে আমার সামনে ধরে। পরিবারটিও তার রোগা ঢ্যাঙ্গা ছিপছিপে—তবে সুস্থ। কোরা কাপড়ের ভাঁজে ছোট মাই, আবার সন্তান আসতে চাইলে যা সুধায় ভরে উঠবে অনায়াসে।

মারাত্মক গুম খাওয়া ভাবটা কেটে যায়। যোগী ওর দিকে তাকিয়েই বলে, 'বাবুকে কি রাক্ষস ঠাওরালি নাকি, আঁ? দুটো মোয়া দুটো নাড়ু রেখে তুলে নিয়ে যা সব। গেলাস নেই তো কি হবে, ঘটিটা মাজা আছে, টিউবওয়েলের জলের কলসী থেকে জল এনে দে ঘটিতে।'

একটু থেমে বিনয়ের সুরে হঠাৎ অন্য একটা কৈফিয়ত। সে বলে তার পরিবারকে, 'মাছ আর আজ আনা হল না, বিন্দি।'

'মাছের তরে মরছি।' বিন্দি এতক্ষণে এবার প্রথম মুখ খোলে ঝঙ্কার দিয়ে।

'সবাইকে বলি, ছিনিয়ে নিয়ে খাও না? এসো, আমরা সবাই মিলে

ছিনিয়ে নিয়ে খাই। ব্যাপার বুঝছো তো, মোদের খিচুড়ি ভোগের জন্যে সে চাল ডাল আসে তার বেশীর ভাগ চোরাগোপ্তা হয়ে যায়, নইলে খিচুড়ি এমন নুনজলের মতো লাগে? এমনিও মরব, ওমনিও মরব, এসো বাঁচার তরে লড়াই করে মরি। কর্তারা ভোজ খাবেন, মোরা না খেয়ে মরব। কেড়ে খাই এসো। এমনি ভাবে কত করে কত রকমে বুঝিয়ে বলি, কেউ যেন কান দেয় না কথায়। কান দেয় না ঠিক নয়, কানে যেন যায় না কথা। ঝিমোতে ঝিমোতে বলে আঁ, আঁ, কি বলছিলে? বলে আবার ঝিমোয়। জলো খিচুড়ি একচুমুকে খাবার খানিক পরে যদি বা কেউ একটু উৎসাহ দেখায়, একটু জ্বালা জানায় যে সত্যি এত অন্ন থাকতে তারা না খেয়ে মরবে এ ভারি অন্যায়—বিকালে তারা নিঝুম হয়ে যায়। রিলিফখানায় সারি দিতে আগুপিছু নিয়ে কামড়া-কামড়ি করে, ছোট এক মগ সেদ্ধ চাল ডালের ঝোলের জন্য—ছিনিয়ে নিয়ে পেট ভরে ডালভাত খাবার জন্যে কারো উৎসাহ দেখি না।

একদিন খবর পেলাম, রিলিফখানার জন্যে মোটা মতো সরকারী চালান আরেকটা এয়েছে অ্যাদ্দিন পরে, সাত দিন কেন পুরো আধ মাস সত্যিকারের ঘন খিচুড়ি বিলানো চলবে। কিন্তু দেখে শুনে তখন অভিজ্ঞতা জম্মে গেছে বাবু। যত চালান আসুক, একটা দিনের বিলানো খিচুড়িও সত্যিকারের খিচুড়ি হবে না, চাল ডাল বেশীর ভাগ চলে যাবে চোরা বাজারে। সদরে জানা চেনা লোক ছিল কটা। মানে আর কি, আপনার কাছে ঢাকঢাক গুড়গুড় করব না, শহরের চোর, ছ্যাঁচড়, গুণ্ডা. বজ্জাত, চোরগোপ্তা ছোরা মারা গোছের লোকের সর্দার কজন আর কি। ওপরওলাদের সাথে খাতির ছিল ওদের, ওদের ছাড়া চলে না সরকারী বে-সরকারী বড় কর্তাদের চোরাকারবার। ওদের একজন একটা ব্যাপারে সাথে ছিল মোর কবছর আগে, বড় বাঁচান বাঁচিয়েছিলাম দু-দশ বছরের জেল থেকে। একটু খাতির করল, খানিকটা মাত্তর। ওর মারফতে আর দু-চারজনকে জড়ো করে, তারাও চিনত জানত মোকে, চাল চেলে ভাঁওতা মেরে কাণ্ড করিয়ে দিলাম একটা রেলের ইস্টিশানে, চাদ্দিকে হৈ চৈ পড়ে গেল, চালানী চাল ডাল সব গেল রিলিফখানার গুদামে, শেষ বস্তাটি।

বল্লে না পিত্যয় যাবেন বাবু, পুরো চারটে দিন ঘন খিচুড়ির সাথে একটা করে আলু সেদ্ধ খেল ভিখিরির দলকে দল সবাই। আদ্দেক লোককে দিতে না দিতে ফুরিয়ে গেল না খিচুড়ি, কেউ বলল না ধমক দিয়ে, ওবেলা আসিস, এখন ভাগ্‌ শালার ব্যাটা শালা। আর এটাই আসল কথা মন দিয়ে শোনেন বাবু। ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচবার কথা যারা কেউ কানে তোলেনি, দুটো দিন দুবেলা এক মগ চাল ডাল আর একটা করে আলু সেদ্ধ খেয়ে সকলে কান পেতে শুনতে লাগল আমার কথা, সায় দিতে লাগল যে এই ঠিক, এ ছাড়া বাঁচবার উপায় নেই, মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বজ্জাতরা, কেড়ে নিতে হবে সব, পেট পুরে খেয়ে বাঁচতে হবে দুবেলা। আমি যা বলি, সবাই সায় দিয়ে তাই বলে। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারি না, মাথা গুলিয়ে যায়। পরদিন যেন উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। পরের দিন তাদেরই কজন আমার কাছে এসে ব'লে যে তারা গুদোম থেকে চাল ডাল ছিনিয়ে নিতে রাজী, নিজেরা রেঁধে বেড়ে খাবে। আমি অ্যাদ্দিন জপাচ্ছি তাদের, আমাকে ঠিকঠাক করে চালাতে হবে কখন কি ভাবে কোথায় কি করতে হবে গুদোম থেকে মালপত্তর সব লুটপাট করে নিতে হলে।

কি বোকামিটাই করলাম সেদিন বাবু। ভাবলাম কি, এমন আবোলতাবোল ভাবে নয়, মাঝে মাঝে তিন বন্দুকওলা জমিদারের বাড়ি হানা দেবার আগে যেমনভাবে দল গড়েছি শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম দিয়ে, তেমনিভাবে এদের গড়ে তুলব টাকা-পয়সা লুটতে নয়, ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচবার কায়দা শিখিয়ে। এই না ভেবে পিছিয়ে দিলাম সবাইকে নিয়ে হানা দেওয়াটা কদিনের জন্যে। রাতারাতি মিলিটারি লরিতে চালান হয়ে গেল রিলিফখানার গুদোমের আদ্দেক মাল। পরদিন সেই রঙ করা জলো খিচুড়ি।

তাতে যেন জোর বেড়েছে মনে হল সকলের দল বেঁধে ছিনিয়ে খাওয়ার সাধটার। মোকে ঘিরে ধরে শ' দেড়েক মাগীমদ্দ বলতে লাগল, চলো না যাই, ছিনিয়ে আনি ধান চাল। বাচ্চাগুলো পর্যন্ত তড়পাতে লাগল।

বৈকুণ্ঠসা'র গুদোমে কম করে তিন হাজার মন চাল আছে জানতাম।

চালান দেবার ব্যাপারে কত্তাদের সাথে ভাগ বাঁটোরায় মীমাংসা না হওয়ায় ব্যাটার গুদোমে মাল শুধু জমছিল মাসখানেক। গুদোমটার হদিশ টদিশ নিয়ে কালক্ষণ সুযোগ ঠাহর করতে দুটো দিন কেটে গেল। যখন বললাম কিভাবে কি মতলব করেছি সা'র গুদোমের জমানো অন্ন ছিনিয়ে নেবার, তেমন যেন সাড়া এল না সবার কাছ থেকে। শুধু তাদের নয়, চাদ্দিকের কম করে হাজারটা ভুখা মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-কাচ্চাদের বাঁচবার উপায় হবে বললাম, সায় এল কেমন মন-মরা ঝিমোনো মতন।

পরদিন কেউ যেন কান দিল না আমার কথায়। জ'লো খিচুড়ি বাগাবার ভাবনায় সবাই যেন ফের আবার মসগুল হয়ে গেছে, আর কিছু ভাববার ক্ষেমতা নেই, মন নেই।

সেদিন বুঝলাম বাবু কেন এত লোক না খেয়ে মরেছে, এত খাবার হাতের কাছে থাকতে ছিনিয়ে খায়নি কেন। একদিন খেতে না পেলে শরীরটা শুধু শুকোয় না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচাব তাগিদও ঝিমিয়ে যায়। দুচার দিন একটু কিছু খেতে পেলেই সেটা ফেব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দুদিন খেতে না পেলে ফের ঝিমিয়ে যায়। তা এতে আশ্চর্য কি। এ তো সহজ সোজা কথা। কেউ বোঝে না কেন তাই ভাবি।

শাস্তরে বলেনি বাবু, অন্ন হল প্রাণ? খেতে না পেলে গরু দুধ দেয় না বলদ জমি চষে? কয়লা না খেয়ে ইঞ্জিন গাড়ি টানে? মহাভারতে সেই মুনির কথা আছে। না খেয়ে তপ করেন, একদিন দ্যাখেন কি, গর্তের মুখে পুতুল মতো জ্যান্ত জ্যান্ত মানুষ ঝুলছে ঘাসের শিকড় ধরে, শিকড়গুলি দাঁতে কাটছে ইঁদুর। মুনি বললে, করছ কি তোমরা সব, ইঁদুরে শিকড় কাটছে দেখছ না, গর্তে পড়বে যে ধপাস করে? খুদে খুদে লোকগুলি বললে, বাপু মোরা তোমার পূর্বপুরুষ। বংশে শুধু তুমি আছ। তুমি হলে এই শিকড়টা, যা ধরে মোরা ঝুলছি, হা দেখো নীচে নরক। শিকড় যিনি কাটছেন চোখা ধারাল দাঁত দিয়ে, তিনি হলেন ধম্মো মশায়। বিয়ে কর, পত্তুর জন্মাও, মোদের বাঁচাও নরক থেকে।

মুনি ভড়কে গিয়ে 'তাড়াতাড়ি বিয়ে করলে এক রাজার মেয়েকে, রাজভোগ খেয়ে পুষ্ট মেয়ে, চটপট ছেলে হবে, পূর্বপুরুষ উদ্ধার পাবে। বছর কাটে দুটো তিনটে, গরভো হয় না রাজার মেয়ের। মুনি চটে

বলে, একি কাণ্ড বলতো বৌ, তুমি বাঁজা নাকি? রাজার মেয়ে বলে ঝঙ্কার দিয়ে, নজ্জা করে না বলতে? উপোস করে শুকনো কাঠি হয়ে উনি বনে গিয়ে তপস্যা করবেন, এক রাত্তির খেতে শুতে বসবাস করতে পারবেন না বিয়ে করা বৌয়ের সাথে, ফের বলবেন যে ছেলে হয় না কেন, বৌ তুমি বাঁজা নাকি, নজ্জা করে না? না খেয়ে, না খেয়ে নিজে বাঁজা হয়েছো, শক্তি নেই, খেমতা নেই, বৌকে বাঁজা বলতে লজ্জা করে না? কথার মানে বুঝে, তপস্যা করেও যে সোজা কথা বোঝেনি, সেটা চট করে বুঝে নিয়ে মুনি ঠাকুর তাড়াতাড়ি গিয়ে বিত্তি চায় রাজার কাছে। দুধ-ঘি, লুচি-মাংস, পোলাও কালিয়া খায়, পেট ভরে যত খেতে পারে। বললে না পিত্যয় যাবেন বাবু, এক বছরে ছেলে বিয়োয় মুনির বৌ—'

'রাত হয়নি? যেতে হবে না বাবুকে দেড় ক্রোশ পথ?' যোগী ডাকাতের পরিবার এসে বলে।

মনে হয়, সত্য কি মিথ্যা জানি না মেয়েটার গড়ন এমন রোগাটে ছিপছিপে বলেই বোধ হয় আগামী মাতৃত্ব এতখানি স্পষ্ট হয়েছে। মনে হয় তিন-চার মাসের মধ্যে যোগী ডাকাতকে সে ছেলে বা মেয়ের বাপ করবেই। জ্যোৎস্নায় গেঁয়ো পথে চার মাইল দূরের স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবি, যোগী কি এতই বোকা, সে এত জানে আর এই সহজ সত্যটা জানে না, খুব কম করেও কটা মাস অন্ততঃ লাগে মেয়ে মানুষের মা হয়ে ছেলে বা মেয়ে বিয়োতে?

আমার দেশের মাটিতে আমি সমান তালে চলতে পারি না যোগীর সাথে। আলের বাঁকে হোঁচট খাই, কাটা ধানের গোড়ার খোঁচায় ব্যাথা পাই, কাঁচা মাটির রাস্তায় উঠতে দেড় হাত নালায় পড়ে যাই। যোগী সামলে সুমলে টেনে নিয়ে চলে আমায়। তার মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারি আমার হিসাব নিকাশ বিশ্লেষণের ভুল। যোগী ডাকাত মহাভারতের সেই মুনি নয়। স্বর্গ নরক তার কল্পনায় আছে কি নেই সন্দেহ। বংশ রক্ষায় সে মোটেই ব্যগ্র নয়। ইংরেজের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে খুঁজে খুঁজে

মন্দ বস্তি থেকে হারানো বৌকে ফিরে এনে সে আজ শুধু এই কারণে অখুশী হতে নারাজ, যে বৌ তার যে ছেলে বা মেয়ের মা হবে সে তার জন্মদাতা নয়। সে বাপ হবে তার পরিবারের বাচ্চার, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক সেটা। আজেবাজে খেয়ালে—যে সব খেয়াল তাদেরি মানায়, তাদেরি ফ্যাসান, যারা ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার প্রবৃত্তিটা পর্যন্ত কেঁচে দিয়ে মারতে পারে লাখে লাখে মা বাপ ছেলে-মেয়ে—অনর্থক অখুশী হতে রাজী নয় মানুষ।

তার পরিবার খেতে না পেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তো? যে ভাবে পারে খেতে পেয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে তো। তারপর আর কোন্ কথা আছে?

ঠিকাদার

মনোরঞ্জন হাজরা



মনোরঞ্জন হাজরার লেখক-জীবন থেকে অনেক বেশী মুখর—অনেক বেশী কর্মবহুল তাঁর রাজনৈতিক জীবন। কর্মবহুল রাজনৈতিক জীবনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি অনায়াসে কলম ধরেছেন। সংগ্রামের বাস্তবভূমি থেকে তুলে এনেছেন অনেক অলিখিত সংগ্রামী ঘটনা, অনেক জানা-অজানা মানুষ। শুধু শহর-গঞ্জের নয়, গ্রাম-বাংলার বিস্তৃত পটভূমিও তাঁর লেখায় এসেছে। 'স্বাধীনতা' এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকায় একসময় তাঁর অনেক গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ক্রাইপার রোডে ঝড়', 'নোঙর'। পশ্চিম বাংলা বিশেষ করে হুগলি জেলায় যাঁরা কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ার পুরোভাগে ছিলেন, মনোরঞ্জন হাজরা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনকে সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে তিনি আজীবন নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

পাহাড়ের গারে সাবুই ঘাসের সবুজ বিস্তৃতি।

তারি ফাঁকে পায়ে চলা সরু পথ। এঁকে বেঁকে চড়াই-উৎরাইয়ের তরঙ্গায়িত পথে উধাও হ'য়ে গেছে, প্রতিদিন বৈকালে আমি এই পাকদণ্ডীর পথ ধরে পাহাড়ের ওপর বেড়াতে যাই। দীর্ঘকাল রোগ ভোগান্তির পর হাওয়া বদ্‌লাতে এসেছি। কাজেই খুব বেশীদূর যেতে পারি না। তা' ছাড়া কিছুটা পথ ইচ্ছে ক'রেই হাতে রাখি, কারণ শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য সন্ধ্যার আগেই পাহাড় থেকে যদি না নেমে যেতে পারি তা'হলে হয়ত কোন বিপদ-আপদ ঘটেও যেতে পারে। তাই···

পাহাড়ের পাথরকঠিন পথ। চলতে আমার বেশ লাগে। গোটা দুই চড়াই উৎরাই পার হ'লেই আমার লক্ষ্যস্থলে এসে পড়ি। সেখানটায় এক ঝাঁক ইউকালিপ্‌টাস গাছ সুদক্ষ সেনানীর মত দাঁড়িয়ে। প্রতিদিন এইখানে এসে একটা বড় পাথরের ওপর বসি। বসে বসে তাকাই আকাশের পশ্চিম দিগন্তে। অস্তসূর্যের রক্তরশ্মি সারা আকাশটাকে দেয় রাঙা আলোয় ভরিয়ে। কোন কোন দিন হয়ত ধূমল মেঘের বিস্তৃতি থাকে আকাশে। শাড়ীর রূপালী আঁজলার মত সেই মেঘরাশির প্রান্ত ভাগ রূপায়িত হ'য়ে উঠে বিদায়ী সূর্য্যের কিরণ স্পর্শে।

এখান থেকে শহরের দৃশ্যটা চোখে পড়ে। ছোট্ট শহর। বড়লোকের বাগান বাড়ীর মত। পাহাড়ের প্রায় কোল ঘেঁষেই রেল স্টেশনের গম্বুজটা যেন প্রহরী। একটু দূরে জঙ্গলের ফাঁকে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের উঁচু মঞ্চ। শহরের মাঝামাঝি নীলকর সাহেবদের সেকেলে একটা গির্জার ছুঁচলো চূড়ো, আশেপাশের প্রকাণ্ড দেবদারু গাছগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশ ছুঁয়েছে। আরও ওদিকে শহর পার হ'য়ে নদী। নদীর ওপারে অস্পষ্ট প্রায় নীল-বনরেখা।

বাতাস এসে ঢেউ তুলে যায় সাবুই ঘাসের বনে। চেয়ে চেয়ে দেখি। বাংলাদেশের মানুষ আমি। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপসজ্জা প্রতিদিনই আমি নূতন চোখে দেখতে অভ্যস্ত। তা'ছাড়া এই দৃশ্য বৈচিত্র্যের মাঝে

আমি যেন দেখতে পাই আমারই চিরকালের বাংলাদেশকে। তাই দেখে ও আমার তৃপ্তি হয় না।

দিনের শেষে সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা শহর থেকে ফেরে। পাহাড়ের মধ্যে তাদের বাস। হিন্দুস্থানী আহিরেরা ফেরে পাহাড় থেকে। তারা শহুরে। পাহাড়ের বন্ধুর পায়ে চলা পথে, সাবুই ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে সাঁওতাল ছেলে-মেয়েরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে একচোট খেলা শুরু ক'রে দেয়। আহিরদের গরুগুলো ভরপেট খেয়েও খাওয়ার নেশা ভুলতে পারে না। বোধ হয়, তাই ফোঁস ফোঁস ক'রে সাবুই ঘাসের কচি কচি ডগা গুলোয় টান মারতে মারতে চলে।

প্রায়ই সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আহিরদের বচসা হয়, মারামারি হয়। মারামারিটা কখনো কখনো খুনোখুনির পর্যায়ে গিয়েও পড়ে। ননরেগুলেটেড প্রদেশ। তসিলদার অথবা নগর-রক্ষীদের কেউ এসে হয় ঝগড়া মিটিয়ে দেয় নয় জরিমানা করে। দু'পক্ষেরই আক্কেল হ'য়ে যায়।

এখানে একটি লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছে। কপালে চন্দনের ফোঁটা কাটা, মাথায় মাড়োয়ারী টুপি, শুঁড়তোলা লক্কড় নাগরা পায়ে, ঢিলে পাঞ্জাবী গায়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে লোকটা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যায় আর আসে। লোকটা রাজপুতানার কোন জায়গার অধিবাসী। ছেলেবেলা থেকেই এদেশে আছে। এখানে সে ঠিকাদারী কাজ করে অর্থাৎ এই বিহার প্রদেশেরই খনি অঞ্চলের কোন কয়লাখনিতে শ্রমিক সরবরাহ করে। বয়স হ'য়েছে লোকটার অনেক। মাথার চুল পেকে শাদা হ'য়ে গেছে কিন্তু শরীর ভাঙেনি এতটুকুও। নাম মহারাজ। নামটা আসল—কি, উপাধি প্রাপ্তির সূত্রে পাওয়া তা' সেই জানে। সাঁওতাল পল্লীতে মহারাজের খাতির খুব। শহরেও যে খাতির নেই তা' নয়। কয়লাখনিতে শ্রমিক চালান দেওয়া তো শুধু শ্রমিক চালানই নয় গোহাটার গরুর মত মানুষ বেচা। মানুষ বেচে পয়সা হয় না এমন নয় বরং তা'তেই আরও বেশি হয়। কাজেই পয়সার মালিক হ'লে খাতির ক'রবে না এমনতরো লোক পৃথিবীতে কেউ আছে কি? অবশ্য মহারাজ যে সাঁওতালদের খাতির সেইজন্যই পায় তা' নয়, মহারাজ সাঁওতালদের

বোঝাতে পেরেছে যে, সে তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।

প্রায়ই ইউকালিপ্‌টাস্‌ গাছের তলায় এসে মহারাজ আমার সঙ্গে গল্প করে। সাঁওতালই হোক আর আহিরই হোক সবাই তাকে সেলাম ঠুকে যায়। জিজ্ঞাসা করি,—হ্যাঁ মহারাজ শহববাসীরা তোমায় সেলাম ঠোকে সেটা না হয় বুঝতে পারি কিন্তু এই সাঁওতালদের হৃদয় জয় ক'রলে তুমি কি ক'রে ?

মহারাজ মাথার টুপিটা বাঁ-হাতের তালুতে বসিয়ে ডানহাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে,— বাবুজি আমি ওদের অনেক উপকার করিছি।

—কি রকম ?

মহারাজ বল্‌তে থাকে, জানো বাবুজি—আগে আমি এই সাবুই ঘাসের কারবার করতুম। ডেরী-অন্‌-শোন আর টিটাগড়ের কাগজ কলে চালান দিতুম্‌। সে সময়ে পাহাড়ের এই সাঁওতাল মহল্লাতে এসে প্রায়ই শুনতুম ওদের দুঃখের কথা। কয়লাখনিতে বড় বড় সাহেববা ওদের ঘরের ছেলেমেয়েদের দালাল দিয়ে নিয়ে পালাতো আব কংলা খাদে কম মজুবীতে খাটিয়ে নিতো।

—তারপর ?

—তারপর আর কি। একদিন শুনলুম এই ঘাসের ব্যবসা আর এই ভাবে চলবে না। সোজাসুজি কলের মালিকরা জমা নেবে। আমিও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। তখন আমার মনের ভেতরে তোলপাড় ক'রছে সাঁওতালদের কথা। কয়লাখনির সাহেবদের কাছে গিয়ে বল্‌লুম, এবার থেকে আমি তোমাদের মজুর যোগাবো। দিশী সাহেব—শুনে খুব খুশি হোল।

—কিন্তু তাতে সাঁওতালদের তুমি কি ক'রলে মহারাজ ?

বাঃ! কপাল কুঁচকে মহারাজ বলে, আমার হাতে পড়ে সাঁওতালরা তো বেঁচে গেল। ওদের ছেলেমেয়েদের গিয়ে আর কম মজুরীতে মেহনৎ ক'রতে হয় না। বছরে দু'বার তো দেশে আসেই। তারপর আগেকার মত বেয়াড়াপণা ক'রলে কয়লাখনিতে ডিনামাইট্‌ পুঁতে জাহান্নামে পাঠানো হয় না। আজকাল পাকা রেজিস্টার, কম্‌পেনসেসন্‌ এ্যাক্ট— এসব তো আমারই তদ্বিরে ?

—বল কি মহারাজ ?

—বাবুজি, গরীব আর কি ক'রবে ?

তা' ঠিক। মনে মনে ভাবি—মহারাজের এই কথাগুলোই হয়ত সাঁওতালদের এতখানি মুগ্ধ ক'রেছে। কেন না মহারাজ যেভাবে কথাগুলো বলে তা'তে লেখাপড়া জানালোক না হ'লে আমারও মুগ্ধ হবার কথা।

তবু মহারাজ লোকটাকে মন্দ লাগে না। হাওয়া বদ্‌লাতে এসে যেসব সমপর্যায়ভুক্ত নরনারীকে পথে ঘাটে দেখি, তাদের অনেকেই দেখায় নিজেদের অহঙ্কার, ঐশ্বর্যের অহঙ্কার। আমি সাধারন ঘরে মানুষ, সহ্য ক'রতে পারি না তাদের। তাই তার চেয়ে ঢের ভাল লাগে আমার এম্‌নিতরো মানুষ। হোক্ মহারাজ ভিন্‌দেশী লোক্ হোক তার পেশাটা ঘৃন্য, তবু তার মধ্যে নেই অহঙ্কার, মিথ্যা অহঙ্কার।

ক্রমে মহারাজের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে যায়। শহরের একটা বড় রাস্তার ধারেই আমার বাসা। জানালা দিয়ে বহুদূর অবধি পথের বিস্তৃতি দেখতে পাওয়া যায়। তারি ধারে আমার শোবার জায়গা। শুয়ে শুয়ে কখনো একটু আধটু পড়ি নতুবা জানালার ফাঁকে তাকিয়ে থাকি পথের দিকে।

এখানের আকাশ বাংলাদেশের আকাশ নয়। প্রখর রৌদ্রকিরণে আকাশে লেগে যায় আগুনের বন্যা। নিঃসীম নীলিমায় দেখা যায় তার দুরন্ত গ্রাস। তাকানো যায় না সেদিকে। কপাল টন্‌টন্ ক'রে উঠে, চোখের তারা যেন ঠিকরে যায়। ওদিকে পথও অসম্ভব তেতে উঠে দিনের বেলা। তবু আমি জানালা বন্ধ করি না। জানালা বন্ধ ক'রলে বাতাস না পেয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়ব। এম্‌নিতরো অবস্থায় যখন ছট্‌ফট্ করি তখন মহারাজের জন্যে মনটা কেমন করে। যদি লোকটা আসে তো বেঁচে যাই।

অবশ্য মহারাজ আসেই। হয়ত ঠিক সেই সময়েই আসে না কিন্তু আসেই। হঠাৎ নজরে পড়ে—ঘোড়ার ক্ষুরে পশ্চিমি পথের লালধূলো উড়িয়ে মহারাজ আসছে সত্যিকারের রাজপুতের মত। ঠাট্টা ক'রে আমি বলি, কি মহারাজ পূর্বপুরুষদের নাম রাখছ ঘোড়া ছুটিয়ে ?

মহারাজ হেসে বলে, দেখুন বাবুজি—ঘোড়া একটা নাইলে এখানে

চলে না!

বাস্তবিকই। শহরের পথ একটুখানি। বেড়াতে হ'লে পাহাড়েই বেড়াতে হয় এবং সেখানে যন্ত্রযুগের সহজলভ্য প্রত্যেকটি যানবাহনই অচল। তাই ঘোড়া সেই জায়গায় সত্যিই কার্যকরী। আমি মহারাজকে বলি,—আমায় ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে দেবে মহারাজ?

মহারাজ বলে,—আচ্ছা বাবুজী।

দু-একদিন পাহাড়ে গিয়ে ঘোড়ায় চাপা অভ্যাস করি। দুর্ব্বল শরীর খানিকটা যেতে না যেতে হাঁপিয়ে পড়ে।

মহারাজ বলে,—আপনার শরীর ঠিক নেই বাবুজী!

—তা ঠিক।

তবু এরি মধ্যে একদিন ঘোড়ায় চেপে সাঁওতাল পল্লীতে ঘুরে আসি। মহারাজের আর একটা বুড়ো ঘোড়া ছিল। সেটাকে নিলে মহারাজ আর ইদানীং সে নিজে যে ঘোড়াটা ব্যবহার ক'রছে সেটা দিলে আমাকে। দু-জনে মিলে চলি পাহাড়ের পথ বেয়ে।

ঘোড়ার পিঠে বসে দেখি পার্ব্বত্য প্রকৃতির অপূর্ব শোভা। ওদিকে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া রক্তসূর্য, নীচে গাছপালা ও পাহাড়ের ছোট ছোট চূড়া—তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মত নিঃসীম। আমরা চলেছি, কানে আমাদের অশ্বক্ষুরের ধ্বনি।

পাহাড়ের মাঝে মাঝে সমতলভূমি দেখে সাঁওতালরা ঘর বেঁধেছে। ছোট ছোট ঘর পাশাপাশি ঠাসাঠাসি। কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা যেমন গোবব দিয়ে ঘর নিকোয় ঠিক তেমনি ক'রেই সাঁওতাল বধূরা ঘর নিকিয়েছে। সাবুই ঘাসে ঘরগুলো ছাওয়া। দেয়ালে মানুষের সৌন্দর্যানুভূতির বিকাশ। দু-একটা জন্তু জানোয়ারের ছবি—যেন অজন্তার চিত্র। যারা চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি জানে না, তারা দিয়েছে দেয়ালের চারিদিকে গিরিমাটির অসংখ্য লাল ফোঁটা। মাঝে মাঝে দু-একটা চুনের ফোঁটাও দেখা যায়। প্রত্যেক বাড়ীরই উঠোন আছে। উঠোনের একদিকে গরু বাঁধা। অন্য সবদিকে পাল পাল

মুরগী আর ছাগল।

মহারাজ আর আমি একঠা উঠানে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ি। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে একটি কুড়ি একুশ বছরের মেয়ে। মাথায় তার এলো খোঁপা। খোঁপায় গোঁজা কি একটা সাদা পাহাড়ী ফুল। নিটোল স্বাস্থ্য মেয়েটির, যেন পাথরে কোঁদা! মেয়েটি এগিয়ে এসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বলে—সর্দ্দারকে ডাকিয়ে দিব মহারাজ?

হাঁরে লখিয়া,—মহারাজ বলে।

তবে বৈঠো জী,—বলে উঠোন পার হ'য়ে কোথায় যেন যায়।

মহারাজ ইসারা ক'রে আমাকে ডাকে। ঘোড়াটাকে নিয়ে মহারাজের সঙ্গে যাই। মহারাজ নিজের ঘোড়াটা একটা গাছের ডালে বেঁধে এসে তারপর আমারটা নিয়ে অপর একটা গাছে বাঁধে। তারপর দু-জনেই বসি লখিয়াদের খাটিয়ায়।

কিছুক্ষণ পরেই সর্দ্দার আসে। লোকটা বুড়ো হয়েছে। গলায় কুঁচের মালা। স্তিমিত চক্ষু। গায়ের চামড়া কোঁচ্‌কাতে সুরু ক'রেছে। আমাদের দেখে, বিশেষ ক'রে আমাকে দেখে সর্দ্দার যেন কেমন একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। মহারাজকে কৃত্রিম ধমক দেয়ার স্বরে সে বলে,—আস্‌মানের চাঁদ এনেছো মহারাজ, কিন্তু তাকে খাতির করোনি।

সর্দ্দার চেঁচায়,—লখিয়া—লখিয়া।

লখিয়া তার নাতনী। লখিয়া তখনো বাইরে। সাড়া দিতে দিতে ছুটে আসে। সর্দ্দার চেঁচিয়ে বলে,—সাদা গাইটাকে নিয়ে আয়। দুধ দুয়ে জ্বাল্ দে। বাবুকে খেতে দিব। আর জলদি খবর দে চিকন্‌কে। সে শহরে যাক্, ভাল প্যাঁড়া কিনে আনুক—

সর্দ্দারের কথা আমি একবর্ণও বুঝতে পারি না। মহারাজ আমাকে বুঝিয়ে দেয়। ব্যস্ত হ'য়ে বলি,—সর্দ্দার একি ক'রছ, আমি এমনি এসেছি বেড়াতে।

—এই আমাদের রীতি।

কথা চলে মহারাজের মধ্যস্থতায়।

আর কিছু বলা যায়না। সভ্যতার স্পর্শ লেগে সাঁওতালরাও ক্রমশঃ লৌকিক আচারের মধ্যে নিজেদের টেনে আনছে। সাদা গাইয়ের দুধ

জ্বাল দিয়ে আমাকে দেয়াটা লৌকিকতা নয় অবিশ্যি কিন্তু প্যাঁড়া কেনবার জন্য চিকন্‌কে শহরে পাঠানোটা নিশ্চয়ই তাই। শেষোক্ত ব্যাপারটা তাদের বাইরে থেকে আমদানী করা।

চিকন্‌ আসে। আশ্চর্য রকমের চেহারাটা তার। কোন্‌ বিশ্বকর্ম্মা যে তাঁর শিল্পীমনের সমস্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষ ক'রে তাকে তৈরী ক'রেছিলেন, তাই শুধু ভাবি। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কানে রূপোর আংটা, টিকালো নাক, টানা টানা দুটো চোখ, বুকের মাংসপেশীগুলো এতটুকু সঞ্চালনে মহাসমুদ্রের অসংখ্য ঢেউয়ের মত একই সঙ্গে দুলে দুলে উঠে। সে আসতেই সর্দ্দার তাকে হুকুম করে। কিন্তু আমি শেষ পর্য্যন্ত যেতে দিই না তাকে।

অতঃপরে চিকন্‌কে লখিয়ার কাজে সাহায্য ক'রতে বলে দিয়ে বুড়ো মহারাজের সঙ্গে নানারকম আলোচনা সুরু করে। তার বেশিরভাগ কথাই কতকগুলি সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে। অনেকদিন তারা কয়লাখনির কাজে গেছে, এবার তাদের কিছুদিনের জন্য ছুটি দেয়া দরকার। মহারাজ ছেলেমেয়েগুলির পুরো একটা লিষ্ট তৈরি ক'রে নেয়। তারপর বলে,—তাতে আর কি সর্দ্দার, ছুটিতে সবাই আস্‌বে।

সর্দ্দার বলে,—কিন্তু তাদের পুরো মাইনেটা আমাকে দিতে হবে মহারাজ।

উহু তা' হবে না,—মহারাজ বলে। সে আমাদের নিয়ম না আছে।

আসল কথা কিন্তু মহারাজ আমাকে বলে,—পুরো মাইনে মিটিয়ে দিলে বাবুজি ওরা আর খনির কাজে যাবে না। সেই টাকা নিয়ে এখানেই দু-একটা গরুভইস্‌ কিন্‌বে, আর দুধের ব্যবসা ক'রবে।

বুঝতে চেষ্টা করি মহারাজ এদের কোন দৃষ্টি নিয়ে ভাল ক'রছে বা ক'রতে চায়। খানিক বাদেই লখিয়ার জ্বাল দেয়া দুধ প্রকাণ্ড একটা জামবাটিতে ক'রে চিকন্‌ নিয়ে আসে। মহারাজ এদের হাতে খায় না, আমাকেই খেতে হয়। খাওয়া হ'লে চিকন্‌কে দেখিয়ে সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করি,—এটি তোমার কে ?

উত্তর দেয় মহারাজ। বলে,—নাতি।

আমি বলি,—লখিয়ার ভাই ?

সর্দ্দার এবার উত্তর দেয়। বলে,—হ্যাঁ ওদের মা-বাপ আমার কাছে ওদের দু-জনকে রেখে খনির কাজে যায় কিন্তু আর ফেরে না তারা।

মনে মনে ভাবি, খনি সম্বন্ধে এদের অভিজ্ঞতার কথা। আসবার সময় সর্দারকে বলি,—সর্দ্দার এবার পাহাড়ের মাঝে ঝরণার সন্ধান পেয়েছি মাঝে মাঝে উৎপাত ক'রে যাব।

সর্দ্দার বলে,—বেশতো,—এসো তুমি বাবুজি।

আমরা বেরিয়ে পড়ি যে যার ঘোড়া নিয়ে। মহারাজ বক্‌তে সুরু করে,—এদের মত সরল মানুষ তুমি পাবে না বাবুজি। তবু এদের, সাহেবরা খারাপ ক'রে দিয়েছে।

প্রশ্ন করি,—কি করে?

—বাবুজি! শহরের ওদিকে নীলকুঠির ভাঙ্গা-বাড়ীগুলো দেখেছেন কিনা জানি না! একদিন সেইখানে এদের মেহনৎ মাটি হ'য়ে যেত। ওরা সে সময় শুধুই ঠকেছে। তারপর সবচেয়ে বেশি ঠকেছে ওরা, যেদিন ওদের বুক থেকে ওদের যোয়ান যোয়ান ছেলেগুলোকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

পুনরায় প্রশ্ন করি,—সেটা কি রকম মহারাজ?

'মহারাজ হেসে বলে,—বাবুজি তুমি লিখাপড়া জানো—আর সে কথাটা জানো না?

চোখের সমুখ থেকে আমার একটা পর্দা সরে যায়। মনে পড়ে খৃষ্টান মিশনারীদের কথা। সে সব কথা ভোলবার নয়, ভোলাও যায় না। কিন্তু মহাত্মা কেরী বা মার্সম্যানের কথা যখন আমার মনে পড়ে তখন মিশনারী সাহেবদের আন্দোলন সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ ক'রতে আমার রীতিমত ভয় হয়,—ভয় হয় পাছে সেই সব মহাত্মা পুরুষদের সহকর্ম্মীদের ওপর না জেনে কোন কটাক্ষপাত ক'রে ফেলি। তবু ভারতের এই নিস্পাপ যাযাবর জাতিকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করার কোনই অর্থ বুঝতে পারি না!'

আমি কোন মতামত প্রকাশ করি না। মহারাজ অনর্গল বকে চলে। ক্রমশঃ ঘোড়া ছুটতে শুরু করে, জোর কদমে।

কয়েকদিন পরের কথা।

পাহাড়ের সেই ইউকালিপ্‌টাস গাছগুলোর নীচে আমার পরিচিত পাথরটার ওপরে এসে বসেছি। আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দিনান্তের সূর্য-কিরণে উদ্ভাসিত।

সঙ্গে মহারাজ নেই। কয়েকদিন আগে সে চলে গেছে তার কর্ম্মক্ষেত্রে। তার বড় সাহেব তাকে তলব ক'রেছে। কয়লা খনিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে। ভিতরের পিলার ধ্বসে নাকি সমস্ত খনিটাকে বরবাদ ক'রে দিয়েছে। অনেক লোকের প্রাণহানিও হ'য়েছে। বেশির ভাগই তারা মজুর। খবরের কাগজে আমি ও মহারাজ আগেই দেখেছিলুম। মহারাজ তো মুষড়ে পড়ল। কে জানে কে বা কারা মারা গেল! কাগজে কারো নাম বেরোয়নি। যাই হোক শেষপর্যন্ত মহারাজের বড়সাহেবের 'তার' এলো তার কাছে। মহারাজ মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব না ক'রে বেরিয়ে পড়ল খনির উদ্দেশ্যে।

সেই থেকে আমি ক'দিন একাই কাটাচ্ছি। মহারাজ ফিরেছে কি-না তারও কোন খবর জানি না। অবিশ্যি এলে সে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা ক'রত। এদিকে বাড়ী থেকেও চিঠি এসেছে: স্বাস্থ্য যদি তেমন ভাবে না ফেরে, তবে চলে এস। তাই কি ক'রব ক'দিন যেন এক সমস্যায় পড়েছি।

পাহাড়ের এই নির্জ্জন প্রান্তরে বসে বসে এইসব সাতপাঁচ ভাবছি এমন অবস্থায় সাবুই ঘাসের মাঝখান থেকে শুনলুম একটা প্রচণ্ড হট্টগোল। পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে উঠে দেখি, সাঁওতালদের সেই বুড়ো সর্দারটা তীর ধনুক হাতে নিয়ে ছুটছে। তার পিছনে আবার চিকন্! কি ব্যাপার! দেখতে পেলুম একদল আহির এক জায়গায় গরুচরানো লাঠি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে আর ঠিক তার সামনাসামনি চিকন্ তার হাতের ধনুকে তীর লাগাচ্ছে তাদেরই লক্ষ ক'রে। আমি শিউরে উঠে হাঁকি,—চিকন্?

চিকন্ আমার দিকে তাকায় না। শুধু পিছনদিকে হাতটা নেড়ে আমাকে থামতে ইঙ্গিত করে।

ওকি! একটি আহির বুকে তীরবিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল

যে! আরও একটা···আরও···আরও উপর্য্যুপরি কয়েকটা।

সহসা পিছন থেকে আমার কাঁধে একটা হাত এসে পড়ে। চম্‌কে উঠে সেদিকে তাকাই। দেখি মহারাজ! মহারাজের মুখে অদ্ভুত একরকম হাসি। জিজ্ঞাসা করি,—একি মহারাজ—তুমি?

হাঁ বাবুজী। মহারাজ বলে,—আমি চলে এসেছি কয়েকদিন আগে, সময় পাইনি বলে দেখা ক'রতে পারিনি।

সভয়ে ও সবিস্ময়ে আমি বলে উঠি,—কিন্তু এসব কি মহারাজ!

বলব সব। মহারাজ বলে,—আগে ফিরিয়ে আনি ওদের···

মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে মহারাজ এগিয়েযায় সেদিকে। আমি নির্ব্বাক-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটার সূত্র খোঁজবার চেষ্টা করি।

খানিক'পরে সাঁওতাল সর্দ্দার, চিকন্ এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে মহারাজ আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর সর্দ্দারকে বলে,—ভয় নেই সর্দ্দার আমি আছি। তোমাদের যদি কেউ ধরতে আসে তা'হলে আমাকে ডাকবে।

সর্দ্দার আর চিকন্ দলবলকে নিয়ে ফিরে যায়। মহারাজ সেইখানেই বসে পড়ে ক্লান্তভাবে। মাথার টুপিটাকে খুলে বাঁ হাতের তালুতে রাখে। তারপর ডানহাতে ক'রে পাকাচুল গুলোতে হাত বুলোয়। আজ যেন মহারাজকে সত্যিই বুড়ো বলে মনে হয়। আজ যেন তার ভিতর থেকে তার ঠিকাদারী মনটা কোথাও পালিয়েছে। কপালের শিরাগুলো ঠেলে উঠেছে। পোষাকটাও আজ কেমন যেন বিশ্রী। ময়লা পাঞ্জাবী, ময়লা ধুতি, ছেঁড়া নাগরা। মহারাজ বসে পড়ে যেন হাঁপায়।

ব্যাপার কি মহারাজ! আমি বলে উঠি,—কিছুই তো বুঝতে পারছি না!

মহারাজ হাসে, ম্লানহাসি। আঙুল দিয়ে দেখায় দিগন্তের সূর্য্যের দিকে। তারপর বলে,—বাবুজি! মানুষের জীবনও অম্‌নিতরো। তারও কাজ ফুরুলে সে অম্‌নিই ম্লান হ'য়ে আসে। রাজপুত আমি, বহুকাল ধরে মানুষের রক্তের বিনিময়ে রক্ত নেয়া আমাদের পেশা। কিন্তু রাজপুত কখনো ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেনি!

এসব কি বলে মহারাজ! তার কণ্ঠে যেন অনুশোচনার প্রচ্ছন্ন

ইঙ্গিত। আমি জিজ্ঞাসা করি,—মহারাজ এসব তুমি কি বলছ?

মহারাজ টুপিটাকে একটা পাথরের ওপরে রেখে বলে,—আমি ঠিকই বলছি বাবুজি। আপনি ভাবতে পারেন—এই যে খুন হ'য়ে গেল, এর মূলে আমি ছাড়া আর কেউ নেই?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাই। সে বলে,—বাবুজি কয়লাখনি ধসে গিয়ে সাঁওতাল মহল্লার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে খনির মালিকদেরও। যা হবার তা'তো হ'য়েই গেল। নতুন খাদে কাজ শুরু করাবে মালিকেরা। কিন্তু কোথাও আর একটিও মজুর নেই। সব পালিয়েছে। আমার ওপরে ভার পড়ল—মজুর আনতেই হবে। কিন্তু কদিন ধ'রে প্রাণপন চেষ্টা ক'রেও এদের আমি রাজি করাতে পারলুম না। এরা সবাই বল্‌লে,—নিশ্চয়ই খাদ ধসিয়ে অর্থাৎ ডিনামাইট পুঁতে ফাটিয়ে দেওয়া হ'য়েছে—আমরা আর যাব না। আমি তো একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলুম। তারপর ভেবে ভেবে এই পথ বের করলুম। এই যে কটা নির্দোষ আহিরের জান চ'লে গেল, এ আমারই জন্য!

বুঝতে পারলুম মহারাজের অবস্থা। একদিকে তার ঠিকাদারী বৃত্তির দুর্নিবার ক্ষুধা, আর একদিকে তার রক্তে জড়িয়ে আছে যে বীর রাজপুত জাতির ইতিহাস—এই দুইয়েরই দ্বন্দ্ব চলেছে তার মনে।

মহারাজ বলে চলে,—তাই একদিন লখিয়াকে চুরি ক'রে নিয়ে এলুম ঘোড়ায় চাপিয়ে। তাকে আটক রেখে দিলুম। সাঁওতাল পাড়ায় পঞ্চায়েৎ বসল। সেখানে বললুম—এ নিশ্চয়ই ব্যাটা আহিরদের কাজ। ওরাও তাই বললে। ব্যস! সাঁওতালরা তুলে নিলে তাদের কাঁড়। পালকবাঁধা তীরগুলোকে পাথরে ঘষে আগুনের ফুলকি কাট্‌লে বার কয়েক, তারপর বেরিয়ে পড়ল এই দাঙ্গায়—

—এরকম ক'রে তোমার কি লাভ হ'ল মহারাজ? জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

মহারাজ এবার বিস্ফারিত চোখে বলে,—লাভ তো হবে এইবার। তসিলদার আসবে, আসবে নগররক্ষক, তালুকের ম্যাজিস্ট্রেট। সাঁওতালরা ভয়ে কুঁকড়ে এসে পড়বে আমার কাছে। আর একটি একটি

ক'রে আমি ওদের চালান ক'রে দেব খনিতে। এই তো আমার ব্যবসা।

আমি শিউরে উঠি। সম্ভবতঃ মহারাজ বুঝতে পারে আমার অবস্থাটা, তাই উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর আমার পিঠে হাত রেখে বলে,—বাবুজি ঘাবড়াও মৎ···আমি রাজপুত।

শেষ কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে নীচু হয়ে টুপিটা তুলে নেয় পাথরের ওপর থেকে এবং তারপরই সুরু ক'রে দেয় চলতে।

পাহাড়ের একটা গাছে সে বেঁধে রেখে এসেছিল তার ঘোড়া। ঘোড়াটাকে খুলে নিয়েই সে এক লাফে তার পিঠে উঠে বসে। আমি তাকে অনুসরণ ক'রতে ক'রতে একেবারে তার কাছেই এসে পড়েছিলুম। বললুম,—এরপর কি ক'রবে মহারাজ ?

শুধু একটি মাত্র উত্তব,—লখিয়াকে আমি বাড়ী পৌঁছে দোব বাবুজি।

আর কোন উত্তর নেই। শুধু ঘোড়ার ক্ষুবের আওয়াজ খট্ খট্। আর সাবুই ঘাসের বনে মর্ম্মরিত হ'য়ে ওঠে যেন তার প্রতিধ্বনি।

আসন্ন সন্ধ্যায় আমি খুঁজতে লাগলুম আমাব পথ।

বউ

সুশীল জানা



সুশীল জানার জন্ম মেদিনীপুর জেলায়। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নাম অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে একটানা লিখছেন। বিস্তীর্ণ পটভূমির বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে তিনি অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। গ্রামের মানুষের সঙ্গে তাঁব নাড়ীব যোগ। সেই সব মানুষের প্রেম ও দুঃখ, সুখ ও সংগ্রাম এবং জীবন অতিক্রমনের সমস্যা ও জটিলতা আর সেই সমস্যা জটিলতার ঘূর্ণাবর্ত থেকে উত্তরণের একক অথবা যৌথ প্রচেষ্টা তাঁব কলমে আশ্চর্য মমতায় রূপায়িত হয়েছে। তিনি এখনও নিরবিচ্ছিন্নভাবে লিখে চলেছেন সেই একই ধারায়, সাধারণ মানুষদের নিয়ে, তাদের সংগ্রাম ও জীবন নিয়ে।

ঘর দোর সব নিকানো—ঝকমক করছে। আনাগোনা করছে দু-চারজন পাড়াপড়শী মেয়ে মরদ। হালকা কথা আর হাসি মস্করা—এদিক-ওদিক হাঁক-ডাক এক-আধটুক্ কারুর নাম ধরে। উৎসবের দিলখুশ মেজাজ সকলের। বর-বউ এখনও এসে পৌঁছয়নি। তাই এক লহমায় বোঝা যায়—সব কিছু তাদেরই অপেক্ষা করছে।

কে যেন বললে, 'অর্জুন এতক্ষণে বউ নিয়ে হাঁটা ধরেছে।'

'রোস—রোস।' কাঁথা মুড়ি দিয়ে দাওয়ার এক কোণে ঝিম মেরে বসেছিল বুড়ী গঙ্গামনি—কথাটা লুফে নিয়ে বললে, 'আসতে সেই এক পহর রাত।'

'বেলা তো গেল গো পিসি।'

'আঁ? তবে ঢের দেরি।' ছানি পড়া সাদা সাদা কানা চোখ দুটো তুলে গঙ্গামনি বলল, 'যাই যাই করতেও সেই সাঁঝ পহরের শেয়াল ডেকে যাবে। বেটির বাপের ঘর ছেড়ে আসা কি সহজ গ!'

'না গো পিসি—অর্জুনের সব টাইম ধরা কাজ। এসে পড়বে সন্ধ্যার আগে। দ্যাখ।'

'কত দ্যাখলম বাপ—জানি।' বুড়ী তারপর হুঁ-হুঁ করে একটু হাসল। বলল, 'মোর কি হল তবে শুন্।' ভাঙা দুমড়ানো কতগুলো বছর পেরিয়ে অর্জুনের ঠাকুমা গঙ্গামনি গিয়ে পড়ে কবেকার কথায়। ঝড়-ঝপটা খাওয়া ভাঙাচুরো মুখটায় ঝিলিক দেয় পুরাতন আমেজ। গঙ্গামনি তার শ্বশুরবাড়ী আসার কথা বলে। বরপক্ষ তাগিদ দিচ্ছে—উসখুশ করছে বর। ওদিকে মেয়ের প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার আগে কান্নার হাট বসে গেছে। মা-বাপ ভাই গুষ্টিশুদ্ধ যে যেখানে আছে সকলের গলা ধরে ধরে কান্না—তারপর সামনে পাড়াপড়শী যে পড়ে তাদের গলা ধরে ধরে কান্না। পথ চলতেও সে কান্না থামে না—অমন দু-তিনটে গাঁয়ের পথ ডাক পেড়ে পেড়ে কান্না। শুনে ভিন গ্রামের লোক যাতে বলে দিতে পারে—'অমুকের মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেল গো।'

গঙ্গামনি বলে, 'তারপর তিন দিন মোর গলা বসে গেল।'

মাহিন্দ্রের বয়স ষাট ধরো ধরো—তবু গঙ্গামনির চেয়ে সে বয়সে ঢের ছোট। তবু সে-কালের লোক সে। হেসে বললে, 'একালে অত কান্না-কাটি নাই গো পিসি।'

'কি জানি বাপ্!' গঙ্গামণি ঠোঁট উল্টে বললে, 'একালে সব উল্টা। ঝাঁটা মার।'—

বুড়ীর জরাজীর্ণ কালো মুখটা বিশ্রী বিকৃত হয়ে যায়। গর গর করে হুলো বেড়ালের ক্রুদ্ধ গোঙানির মতো। ক্ষেপে যায় একালের ওপরে। বলে, 'কাঁদবেনি কি গো! মেয়েমানুষ কাঁদবেনি কি! ছাতি ফেটে গেছে মোদের কাঁদতে কাঁদতে মা-বাপের দুঃখে, স্বামীর ঘরের ডরে। কি হবে না হবে—বাপ্ রে বাপ! বুড়ো হয়ে গেলম্ এমন করে। তবু চোখের জল শুকায়নি রে বাপ।'

ছানি পড়া ছলছলনো চোখ দুটো গঙ্গামনি একবার মুছে নিলে ময়লা আঁচলে। কোন্ পুরণো কথা মনে পড়ে গেছে আবার। বকর বকর করে নিজের মনে।

ভিন্ গ্রামের কে একটি যুবক এসে দাঁড়াল এমন সময়ে মাহিন্দ্র মণ্ডলের সামনে—চোখমুখ কেমন চন্‌মনে। বেশ খানিকটা পথ যেন ছুটে এসেছে সে। দম দিয়ে বলল, 'অর্জুন আসেনি এখনও?'

মাহিন্দ্র হাসি হাসি মুখে বললে, 'সে যে বিয়ে করতে গেছে গো!'

'জানি মণ্ডল। কিন্তু এদিকে এক ব্যাপার ঘটে গেছে যে!'

'কি?'

'হাটের পথ থেকে মোদের গাঁয়ের একজনকে ধরে লিয়ে গেছে জমিদারের লোক—গাওনার নাম করে।'

'বেদোর ব্যাটারা এখন মানুষজন গুম করতে লেগেছে তা হলে যে গো! এবার নিয়ে গেল কাকে?'

'পৈরাগ বোষ্টম। জানোই তো—লোকটার মনের জোর নাই মণ্ডল—চাষ আবাদেও মন নাই তার। গান গায় আর ভিখ মাগে। মোদের জ্বালা বুঝবেনি সে। সব কথা যদি বলে দেয়! অর্জুন গেছে বিয়ে করতে, কোন্‌দিক দিয়ে সে আসবে, কি করবে—যদি তাকে ধরিয়ে দেয়!'—

মাহিন্দ্র চুপ। ভাবছে।…

অর্জুনকে ধরার বহু চেষ্টা চলছে কিছুদিন থেকে। জমিদারের চর, গোয়েন্দা আর পুলিস যেন পাগলা ঘোড়া ছুটিয়ে চষে ফেলছে গ্রামের পর গ্রাম।

'বলো মণ্ডল—তুমি মোদের মাথা, বলো এখন কি করি। অর্জুন তো নাই'—

অর্জুন নেই,—কোথায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে মাহিন্দ্র মণ্ডলের চিন্তাতেও। চাষের ধান উঠে গেছে সব চাষীর ঘরে ঘরে মাঠ খালি করে। শূন্য মাঠ ছিপছিপে কাদায় পড়ে আছে আদিগন্ত। বিরাট জলার চারধারে ছড়ানো গ্রামগুলি শীতের পড়ন্ত বেলায় মিন মিন করছে। মাঠের সমস্ত জমি ভাগ হয়ে গেছে ওই ক্ষুধার্ত গ্রামগুলোর মধ্যে। জমিদারের পোড়া খড়ের ছাউনির কাছারি বাড়ীটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে পোড়ো ভূতুড়ে বাড়ীর মতো—তার পাইক-পেয়াদা, লোক-লস্কর গোমস্তা সব কে কোথায় উধাও। সামনে যতদূর দেখা যায়—সব এখন তাদেরই মুঠোর মধ্যে। এর চিন্তার দায়ও এখন তাদেরি। অর্জুন হল সেখানে একটা শক্ত খুঁটির মত। কিন্তু সে লোকটাই নেই।

মাহিন্দ্র বললে আস্তে আস্তে, 'সে আসবে কুমিরখালির চড়া দিয়ে —সন্ধ্যার আগেই এসে পড়বে।'

'বাস্। তবে মোরা সব উদিকে ঠিকঠাক রইলেম মণ্ডল। অর্জুনকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দেবো।'

লোকটি চলে গেল দ্রুত পায়ে।

মাহিন্দ্র মণ্ডল দাঁড়িয়ে রইল তেমনি। সূর্য অস্তোন্মুখ। আকাশে কালো ছায়া নামছে আস্তে আস্তে। নোনা মাটির কাঁকড়া-পচা গন্ধের গুমোট শীত সন্ধ্যার ঠাণ্ডায় ভারি হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। মনটাও ভারি হয়ে ওঠে ওইরকম—পুলিসী শঙ্কার নোংরা গন্ধে। মেজাজ এতক্ষণ হাল্‌কা হয়ে ছিল অর্জুনের বিয়ের উৎসবে। উঠোনের এক কোণ থেকে তখনও ভেসে আসছে বুড়ী গঙ্গামনির একঘেয়ে বকবকানি: 'কম কেঁদেছি গ! বলি মেয়্যালোকের কাঁদার কি আর শেষ আছে গ। পেটে দানা পাইনি, তবু খেটে মরেছি শুধু জল খেয়ে খেয়ে। আর কেঁদেছি মাথা ঠুকে ঠুকে'—

কথাগুলো কানে এসে লাগে মাহিন্দ্রের—হঠাৎ এক মুহূর্তে বুড়ীর কথাগুলো টেনে নিয়ে যায় তাকে কর্মক্লান্ত ক্ষুধার্ত নিঃস্ব দিনগুলোতে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। অনেক কষ্ট পেয়েছে তারা—অনেক সয়েছে, অনেক মরেছে। আজ এক দিগন্তবিসারী জলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে —যার প্রতি ইঞ্চি জমি শুধু এখন তাদেরই, আর যেখানে খেটে খেটে মরে গেছে তার বাপ-ঠাকুরদা-প্রপিতামহ। এক মুহূর্তে সবটা অসম্ভব মনে হয়। এতগুলো গ্রাম, তার এত ক্ষুধার্ত চাষী, তার এত লড়াই, তার সভা সমিতি সব।···সবটা স্বপ্ন বলে মনে হয়।

অত্যন্ত কঠোর সত্যের মতো এই সময়ে অর্জুনকে দেখা যায় জলার পূর্বদিকে। সেই অসম্ভব নাটকের দুঃসাহসী নেতা। আসছে বরযাত্রী দলবলের সঙ্গে। হলুদ জলে চোবানো বর-কনের কাপড় ঝিলমিল করছে দূর থেকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মাহিন্দ্র।

মিতবর হয়ে গিয়েছিল পড়শীদের একটা বাচ্চা ছেলে। গঙ্গামনি তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস কনের বাড়ীর কথা।

'হ্যাঁরে—খুব খাওন-দাওন হল ?'

'না—তেমন'—

'হবে ক্যামনে!' গঙ্গামনি কথা লুফে নিয়ে খ্যার খ্যার করে উঠলো, 'কুত্তা চাটার পাত যে। কোথাকার কুন্ হাঘরে ঘর কে জানে। ঝাঁটা মারো। তা লোকজন এসেছিল অনেক ?'

'না তো'—

'মুয়ে আগুন। শ্মশান নাকি!' ফের সকৌতূহলে জিজ্ঞেস করল গঙ্গামনি, 'হ্যাঁ র‍্যা, বউ খুব কাঁদল ? এই ডাক পেড়ে পেড়ে,—

'কই না তো!'

'ঝাঁটা মারো। তবে মেয়া না ষাঁড় গ—এ্যাঁ!'

'না গো—বউ খুব ভাল।' —

'দূর দূর—যা পাল্লা।'—

আচমকা ঠেলা খেয়ে পালাল ছেলেটা। গঙ্গামনি গরগর করে রাগে। এমন সময় বর-কনে এল সামনে।

মাহিন্দ্র বলে দিল, 'আশীর্বাদ কর গো পিসি—তোমার শূন্য ঘর

ভরল এবার। দেখ—বউ দেখ, এই যে—কনের ঘোমটা তুলে সামনে ধরল বুড়ীর।

'মোর কি চোখ আছে বাপ!'—

রইল বৌ দেখা—হঠাৎ হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল বুড়ী—উথলে উঠে আন্থিকালের যত কথা—যত শোক। মরে যাওয়া স্বামী-পুত্রেরা, বাপ-মা, ভাই—যত প্রিয়জন ছিল সকলের নাম ডেকে ডেকে, ডাক পেড়ে পেড়ে কাঁদে গঙ্গামনি। কাঁদে তার দিন গেছে বলে—সেদিনের মানুষেরা আর নেই বলে! সে কান্না আর থামে না।

বাড়ীতে বর-কনেকে নিয়ে উৎসবের আয়োজন—পাড়া-পড়শী জড় হয়েছে এসে। বুড়ীর-মড়া-কান্নায় উসখুশ করে সবাই। কান্না থামাতে পড়শী মেয়ে ছুটে এল দু-চারজন, অর্জুনও এল। মাহিন্দ্র এসে হাতে ধরল, 'তোর পায়ে পড়ি পিসি—চুপ কর।' কিন্তু সমানে কেঁদে চলেছে বুড়ী—প্রাণপণে। যেন কান্না কাকে বলে—নতুন বউকে শুনিয়ে শিখিয়ে দেবে একবারে। অর্থাৎ কি-না মেয়ে হয়ে জন্মেছিস—দেখ কেমন করে কাঁদতে হয়।

শেষ পর্যন্ত কান্না থামাতে আসতে হলো নতুন বউকে। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিল বুড়ীর পায়ে। কান্না থামল। কিন্তু গোঁজ হয়ে বসে রইল চুপচাপ। চোখ তুলে একবার তাকালও না।

আর সবাই হারিয়ে গেছে তখন আনন্দ হল্লার মাঝখানে। বুড়ীর কান্না থামিয়ে নতুন বউও উঠে যায় এক সময়ে। গঙ্গামনি কিছুক্ষণ চুপ-চাপ থেকে ডাক পাড়ল, 'মাহিন্দ্র!'

মাহিন্দ্র কাছে এল, 'বল পিসি।'

'বউটা ধাড়ী।' গঙ্গামনি মন্তব্য করল।

মাহিন্দ্র গাঁইগুঁই করে বলল, 'না না পিসি—এমন কি—'

তার কথা চাপা দিয়ে গঙ্গামনি বলে উঠল, 'চাপলে কি হবে—হেই যে মোর গায়ে ওর বুক ঠেকল।' তারপর বলে উঠল, 'মোর বিয়ে হয়েছিল ন-বছর বয়সে।'

'বাপ রে, এখন চৌদ্দ বছরের নীচে বিয়ে হলে যে জেল জরিমানা হয়ে যাবে পিসি! সেদিন কি আর আছে?'

'নাই!' ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গঙ্গামনি বলল, 'কিন্তু হ্যাঁ র‍্যা, এখন আবার জেল জরিমানা কি? এই তো বলিস—এ গেরাম এখন তোদের। তা তোদের সমিতি না পঞ্চায়েৎ, ডেকে ফের আইন কর তোরা।'

মাহিন্দ্র মাথা চুলকাল। বলল, 'একটু বাড়ন্ত গড়ন—নিজেই পছন্দ করেছে অর্জুন। মেয়েটিও ভাল গো পিসি। যেমন মাঠের কাজ তেমন ঘরের কাজ—সবটায় চৌকস।'

'নূতন বউ কাজ করবে মাঠে! বল কি মাহিন্দ্র? মোকে বিয়ে দিল ন-বছর বয়সে। দু-ছেলের মা হওয়ার পরও মাঠে যাইনি।'

'সে-কাল কি আর আছে পিসি। এখন দুধের বাছাও খাটে—তবু সংসার কুল পায় না।'

'কি জানি বাপ্। মোকে বিয়ে দিল ন-বছর বয়সে।'···

গঙ্গামনি ফের শুরু করে কবেকার ন-বছরের কাহিনী। বুড়ীর কানা চোখে আজকের দিনটায় যেন ঠেসে ধরেছে কবেকার সেই সব কথা।

'শ্বশুর ঘরে আমি তো ভয়ে ডরে মরি। এখন দেখ, নূতন বউ হ্যাঁ-হ্যাঁঃ করে ছুটছে ঘোড়ার মত। ঝাঁটা মার।'

'কাজ পড়ে আছে পিসি'—বলে মাহিন্দ্র পালাল।

উৎসবের কোলাহল থেমে এল এক সময়ে। এতক্ষণ অর্জুনকে নিয়ে তার ইয়ার বন্ধুরা নাচন-কুঁদন করেছে—হল্লা করেছে। পড়শী মেয়েরা নিয়ে পড়েছে নতুন বউকে। মেঠাই-সন্দেশের বদলে বর-কনেকে মাটির ঢেলা দিয়ে পিটিয়েছে ধপাধপ—পাঁক ছুঁড়েছে পুকুরের। গ্রামের সব চেয়ে প্রিয় মানুষটি আর তার নতুন বউ—দু-জনকে ঘিরে ছোট উঠোনটায় আনন্দের জোয়ার ডেকে গেছে। সমুদ্র-ঘেঁষা কোন এক চরের ভাগচাষীর সামান্য এক বিয়ের উৎসব। কিন্তু এমন হল্লা তারা আর কখনও করেনি, এমন ফুর্তি আর কখনও বুঝি হয়নি। এ গ্রাম আজ তাদের, এর প্রতিটি ইঞ্চি জমির মালিক আজ তারা। জমিদারের লটবহর উধাও হয়ে গেছে কোথায়। প্রাণ খুলে হেসেছে সবাই—গান গেয়েছে, নেচেছে, অর্জুনকে

কাঁধে করে। রাত হুপুর গড়িয়ে ঘরে ফিরেছে সবাই। পড়শী মেয়েরা অর্জুনের বাসর ঘর সাজিয়ে গেছে পরিপাটি করে। হাঁড়ির ভেতরে জেলে দিয়ে গেছে নতুন প্রদীপ। নতুন বিছানার মাঝখানে—শিলের নোড়া একটা শুইয়ে রেখে গেছে বোধ করি অনাগত সন্তানের প্রতীক, তার হু-পাশে বর-কনে শোবে। তারপর সবটা নির্জন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকারে কোথায় শোনা যাচ্ছে শুধু গঙ্গামনির নাকের ফুরুৎ ফুরুৎ শব্দ।

বাসর ঘরের এককোণে বুক ভর্তি করঞ্জা তেলের প্রদীপ জ্বলছে একটা, তার ম্লান আলোয় বর কনে তাকাল মুখোমুখি।

অর্জুন মৃহু হেসে বলল, 'মুখের দিকে চেয়ে দেখ কি বউ? আমি কিন্তু বুড়া বর—এই দেখ, দাঁত নাই মোর।'

অর্জুন হাঁ করল।

বউ ঘাড় নামিয়ে বলল, 'জানি। হুটা দাঁত নাই।'

'আগে জানতে?'

বউ ঘাড় কাৎ করে বলল, 'হুঁ, পুলিস তো ভেঙে দিয়ে গেছে। বুড়া হবে কেন?'

'তুমি জানতে সব?' একটা বীর্যবান আনন্দ হঠাৎ বুকের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠে অর্জুনের, শক্ত করে হাত হুটো সে চেপে ধরে বউয়ের।

বউ মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'আমিও তো খোঁড়া মেয়া। মোর দাদা বাবা হয়তো তুমাকে বলেনি—ভয়ে। মোর বাঁ পা টায় কিন্তু তেমন জোর নাই—পুলিসের লাঠি পড়েছিল সেই ধান কাটার সময়ে।—তুমি রাগ করবেনি তো?'

'জানি—জানি—জানি।'—আর কিছু বলতে দেয় না অর্জুন—আর কিছু বলা হয় না। শুধু একটা বোবা আবেগ তোলপাড় করে ওঠে সারা দেহে—মনে। কথা সে বেশী জানে না—রূপ দিতে পারে না সে তার স্বপ্নের, কামনার। ভাষা নেই তার—প্রকাশ করতে জানে না সে নিজেকে। তবু তার হৃদয়ের সমস্ত অবরুদ্ধ আবেগকে আজ প্রকাশ করার একটি পথ সে যেন খুঁজে পেয়ে গেছে একজনের কাছে—সে তার সংগ্রাম, তার ক্ষতচিহ্ন-গৌরব, সেই পথে ফেটে পড়ে তার সমস্ত হৃদয়,

সমস্ত যৌবন। সে বোঝে না সব কিছু। তবু আজই প্রথম উপলব্ধি করে একটা খোঁড়া ষোল সতেরো বছরের মেয়ের লজ্জানত মুখের সামনে দাঁড়িয়ে—সে তুচ্ছ নয়, সে ঢের বড়। এই মেয়েটাকে নিয়ে কি করবে সে ভেবে পায় না—ছুটো শক্ত বাহুতে শুধু চেপে চেপে ধরে বুকের ওপরে গভীর আনন্দে।

আস্তে আস্তে সে বলল এক সময়ে, 'কাল থেকে বুঝে লাও তুমার সংসার বউ—আমি আর কিছু জানিনি। চাষের একজোড়া বলদ আছে, তিনটা ছাগল আছে, আর বাইরে আছে আমার ভাগের চোদ্দ বিঘা জমির ধান।'—

বউ চুপ ক'রে আছে। চোখে স্বপ্নের মতো ভাসছে তার প্রথম যৌবনমোহের ঘর সংসার প্রিয়জন : সকালে গোরু ছাগলগুলোকে সে মাঠে নিয়ে যাবে। ভাল ঘাস দেখে বলদ ছুটোকে বেঁধে দেবে মাঠে। (আহা, একটি গাই গোরু থাকলে বড় ভাল হত)। ঘর-দোর নিকিয়ে পরিষ্কার করবে। এই মানুষটিকে বলবে ছু-কলসী জল তুলে দিতে। বাঁ পাটায় তার তো তেমন জোর নেই! তারপর—তারপর, এই মানুষটি কোথায় থাকবে তখন—কি করবে তাকে নিয়ে সারাদিন? কি করবে সে?—ঘুম আসছে না কিছুতে। জীবন কি—তা সে জানে না; এখনও বোঝেনি—মাধুর্য তার কোথায়। তবু আজ রাতে, এই সামান্য গেঁয়ো মেয়েটার পক্ষে যতটা সম্ভব—তার বৃহত্তর আর মহত্তর আশাগুলি নিয়ে সম্ভাবনা-সমুদ্রের হাঁটু-জলে একটা বাচ্চার মতো সে খেলা করে মনের আনন্দে।

রাতের দীর্ঘ প্রহরগুলি গড়িয়ে গেল কোন্ দিক দিয়ে।

শেষ রাতের দিকে ছুটে এল আবার সেই ভিন্ গাঁয়ের ছোকরাটি। এসে ডাকাডাকি অর্জুন মণ্ডলের বাসর-ঘরে। অর্জুন বেরিয়ে এল অবাক হয়ে।

'কি খবর গো!'

ছোকরা বললে, 'তোমাকে এখুনি পালাতে হবে এ গাঁ ছেড়ে।'

অর্জুন হেসে ফেলে বললে,—'হেই দেখ, বাসর-ঘর আর নতুন বউ ছেড়ে?'

'কিন্তু পুলিস আসছে যে ধরতে। খবর পেয়ে গেছে ওরা অর্জুন। ক'দিনের জন্যে একটু গা ঢাকা দাও তুমি আবার। খবর পেয়েছি ওরা ঘেরাও করবে আজই।'

'পুলিস মোদের বিয়ে-সাদির আনন্দও করতে দিবেনি গো!'

দরোজার আড়ালে দাঁড়িয়ে নতুন বউ শুনছিল সব। অর্জুন ঘরে ঢুকতেই বউ জিজ্ঞেস করল, 'পুলিস?'

'হুঁ।' অর্জুন সায় দিল।

'সরে যাও তুমি তবে।'

'যাচ্ছি বউ।' অন্ধকারে পা বাড়াল অর্জুন। বিছানার তলা থেকে কতগুলো কি কাগজপত্র হাতড়ে নিল।

'দাঁড়াও একটু।'

মিটমিটে করঞ্জা তেলের প্রদীপটা খোঁচা খেয়ে জ্বলে উঠল আবার। সেই মিনমিনে আলোয় নতুন বউ গড় করল অর্জুনকে।

অর্জুন বলল, 'গড় করলে যে!'

হঠাৎ লজ্জা পেয়ে বউ বলল, 'ও মা গ, রাতে পা লাগে নি গায়ে!' তারপর মুখের দিকে চেয়ে খানিক স্তব্ধ হয়ে রইল। আস্তে আস্তে বললে, —'যাও।'

'কিছু যদি হয়—'

'তুমি যাও, কিছু ভাবতে হবেনি। চল এট্টু এগিয়ে দিই।'

পথ দেখিয়ে আগে আগে চলল বউ খিড়কীর দিকে। হাতে সেই বাসরঘরের প্রদীপ।

খিড়কীর দরজা পেরিয়ে থমকে দাঁড়াল অর্জুন আবার। তাকাল বউয়ের মুখের দিকে একবার। মুখটা থম্ থম্ করছে শুধু। দুঃখ নয়—ভয়ও নয়। বোধ করি সদ্য সুরু হওয়া আর একটা জীবনের—আর একটা কিছু—আর একটা উপলব্ধি। চাপা ক্ষোভ।

বউ তাড়া দিল, 'যাও—দেরি করোনি আর!'—

প্রদীপটা দরোজার আড়ালে রেখে বেরিয়ে পড়ল বউ অর্জুনের সঙ্গে সঙ্গে একটু এগিয়ে দিতে।

'আমার ধান রইল বউ—ঠাকু'মা রইল।'

বউ বললে, 'তোমার সব আমি আগলে রাখব—তুমি চলে যাও জোর পা চালিয়ে।'

ওরা এগিয়ে গেল পেছনের একটা খালের দিকে। কিছুটা গিয়ে বউ দাঁড়াল। অর্জুন এগিয়ে গেল। ঘিরে ফেলল তাকে শীতের অগাধ অন্ধকার। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বউ একা—অনেকক্ষণ। এক সময় ফিরে এল ঘরের দিকে অন্যমনে।

বক্‌বক্‌ করছে তখন গঙ্গামণি, 'এ কি বউ গো—এ্যাঁ, মাহিন্দ্র! বলে কি না, যাও—যাও! বুক না পাষান গো! একবার কি হল মোর'—

কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল না গঙ্গামণি, একবার স্বামী কোথায় ক-দিনের জন্য যাবে বলে বেরিয়েছিল। বিছানায় উঠে বসে সেই কথা ঘ্যানর ঘ্যানর করে বুড়ী,...

'হাই মা গ'—যুবতী মেয়্যা, মরদকে অমন করে ছাড়বে কি গা।'

মাহিন্দ্র ছুটে এল, 'চুপ্‌ দে পিসি—পায়ে পড়ি তোর। বিপদ হবে। চুপ দে।'

'আই গো মা—আমি নিজের কানে শুনলম।'

'এখন চুপ দে পিসি—পুলিস এসে পড়ল বলে।'—

বউ তখন এসে দাঁড়িয়েছে তার অন্ধকার বাসরঘরে। বিছানাটা খালি—একজন ছিল কিছুক্ষণ আগে! ঘরটা খালি—যার ঘর সে নেই। সবটা কেমন খালি খালি লাগছে। একজন ছিল। একজন নেই। কান্না পাচ্ছে না। শুধু চেয়ে আছে অন্ধকারে। তার বাসর ঘর!—তার এক রাত্তিরের সংসার!

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। খবর রটে গেল—ধরা পড়ে গেছে অর্জুন। তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে সেপাই আর জমিদারের দলবল।

মাহিন্দ্র তখন চুল টানছে নিজের—ক্রোধে, ক্ষোভে, 'এ সেই শালা বৈরাগীর কাজ। সব বলে দিয়েছে।'—

'ধরেছে!' নতুন বউ শুধাল দম বন্ধ ক'রে।

'হ্যাঁ—ধরে ফেলল গাঁয়ের শেষ জঙ্গলের কিনারে।'

নতুন বউ পা ঘষটে ঘষটে ছুটল সেই দিকে তার বাসর ঘর ছেড়ে।

ছুটে গিয়ে দুই হাতে শক্ত করে চেপে ধরে অর্জুনকে। একটা ধস্তা-ধস্তি সুরু হয়ে যায়। ছাড়বে না সে—ছাড়বে না।···তার কুমারী জীবনের বহুদিনের আশা, তার মাত্র একটা রাত্রির স্বপ্ন—তার একটি রাত্রির স্বপ্ন—তার অপরিপূর্ণ অনাগত জীবন! শক্ত মুঠি চেপে বসে জোরে—অন্ধ আবেগে।

ঝটাপটিতে হলুদে চোবানো শাড়ীটা লটপট করছে মাটির ওপর—ঝিল্‌মিল্‌ করছে রোদ্দুরে। পড়শী মেয়েরা একবার তাকালো পরস্পরের চোখে চোখে। শেষে ছুটে গেল হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে।

'তবে রে গুলামের ব্যাটা!'—

এমন সময় বহু দূর থেকে হাল্লার আওয়াজ শোনা যায়ঃ হো··· ও···ও···ও···

অগনিত মানুষের কণ্ঠ একটা সম্মিলিত ঐকতানের মত ছুটে আসছে এই দিকে—উর্দ্ধবেগে। বুকের ভেতরে কোথায় যেন ওটা দম আটকে ছিল—আজ নাড়া পেয়ে ফেটে পড়ছে কণ্ঠে কণ্ঠে। পুলিসগুলো সচকিত হয়ে কান খাড়া করে শুনলো। দালাল গোয়েন্দারা সভয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। শেষ সবাই মিলে আর একবার হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা অর্জুনকে। বউ শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে অর্জুনের কোমর। ঘাড় গুঁজে লেপ্‌টে গেছে অর্জুনের সঙ্গে।

অন্যান্য মেয়েরা এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল বেয়নেটধারী পুলিসগুলোর ওপরে।

শক্ত হাতে টান মারে বন্দুকে। বহু দূরের শব্দটা ছুটে আসছে এবার কাছাকাছি তীর বেগেঃ হো—ও···ও ··ও···

পট্‌—পট্‌—···

হাওয়ায় রাইফেলের শব্দ ফেটে পড়ে এবার। পুলিস রুখে দাঁড়িয়েছে—চোখে ভয় তাদের—হাল্লার শব্দটা ছুটে আসছে একটা অশরীরি দানবের মত জলা জঙ্গল গ্রাম গ্রামাঞ্চল ভেঙে। বৃত্ত ছোট হয়ে আসছে

ক্রমশঃ। এবার এসে পিষে ফেলবে যেন তাদের। হাল্লা এবার জলার পুবে। আরও কাছে।

...'হটো।' ডুক্‌রে উঠলো এস আইয়ের গলা। ছুটে চলে গেল ভয় পাওয়া পুলিসের দল রাইফেলের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। ছোট ছোট ধোঁয়ার পুঞ্জ ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে গেল উত্তরা বাতাসে।

হলদে শাড়ীপড়া বউটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে। অর্জুন দেখছে পাথর চোখে।

'বউ—অ বউ!' একটা মেয়ে এসে চিৎ করে ফেলল বউকে। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'হায় মাগো!'

বুকের কাছে হলদে শাড়ীর ওপরে বুলেট ভেদ করে যাওয়ার চিহ্ন। হলদে শাড়ীর হলুদ রঙে লেগেছে পোড়ার দাগ। অর্জুন চেয়ে আছে: ওইখানে কাল সে পাগলের মত মাথা গুঁজেছিল না!

চেয়ে আছে সবাই। কাপড়ের হলুদ রং তার ফিকে হয়নি একটুও। হাতের কব্জিতে সূতোয় বাঁধা দুর্বাঘাসের গায়ে এখনও লেগে আছে সদ্য শ্যামলের আভা, কপালের ওপরে সিঁদুরের ড্যাবড্যাবে টিপ একটা, ভারী মিষ্টি করে তুলেছে কচি মুখটাকে।

অর্জুনকে টেনে হিঁচড়ে ছিনিয়ে আনতে গিয়ে মরে গেল বউটা: মাহিন্দ্রের কাছে সব কথা শুনে বুড়ী গঙ্গামণি গোঁজ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ তারপর হঠাৎ কেঁদে উঠল গলা ছেড়ে:

'মোর ঘর যে তবে শূন্য পড়ে রইল মাহিন্দ্র!—মোকে লিয়ে চল সেখানে একবার। দেখবো আমি—মোর বউ দেখব। মোর যে ভাল করে দেখা হয়নি রে মাহিন্দ্র!'—

মাহিন্দ্রের হাত ধরে গিয়ে এতক্ষণে নতুন বউ দেখলো বুড়ী গঙ্গামণি হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদরে, সস্নেহে: 'সোনা বউ মোর।—মা গ'...... মা গ'......মা!......'

বন্দুক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়



নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পৈতৃকবাড়ী অধুনা বাঙলাদেশের বরিশাল জেলায়। তার শৈশব এবং কৈশোরের দিনগুলি কাটে বাঙলাদেশের উত্তরাঞ্চলে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষার অধ্যাপনা করে গিয়েছেন। বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তিনি অনায়াসে বিচরণ করেছেন। তিনি উপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, রম্য রচনাকার, প্রাবন্ধিক এবং কিশোর সাহিত্যের অন্যতম সফল লেখক। তাঁর প্রথমদিককার লেখা 'শিলালিপি', 'উপনিবেশ' আজও পাঠক মনকে উদ্বেলিত করে। ছোট গল্প 'টোপ' তাঁর একটি অসাধারণ রচনা। কিশোরদের জন্য সৃষ্ট 'পটলডাঙায় টেনিদা' তাঁর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। লেখক জীবনের প্রথম থেকেই তিনি বামপন্থী সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অধৈর্যভাবে ঘরের ভেতরে পায়চারি করছে লোকনাথ সাহা। ক্ষুব্ধ আক্রোশে অনেকক্ষণ ধরে দাঁতের ওপর দাঁত চেপে রাখার ফলে মাড়িটা টনটন করছে এখন। ডান হাতটা অতিরিক্ত জোরে মুঠো করে রাখবার জন্য হাতের নরম মাংসের ভেতরে দু-তিনটে নখ একেবারে বসে গেছে, জ্বালা করছে চিনচিন করে, রক্ত পড়ছে বোধ হয়। কিন্তু লোকনাথ সাহা টের পাচ্ছে না কিছু, তেমনি অধৈর্যভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরের মধ্যে পায়চারি করে যাচ্ছে।

তারপর আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘনালো। ঘরের ভেতরে লোকনাথ সাহার নিজের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু জেগে রইল না।

নিজের অস্তিত্বটাই শুধু জেগে রইল। কিন্তু অতি তীব্র, অতি ভয়ঙ্কর এই জাগরণ। ইচ্ছে করতে লাগলো এই অন্ধকারের মধ্যেই সে ছুটে বেড়িয়ে পড়ে। জ্বালিয়ে দেয় এই পৃথিবীটাকে, ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় যা কিছু সম্ভব। একটা অসহ্য অথচ অবাস্তব ধ্বংস কল্পনায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো নিজের মধ্যে ধূমায়িত হতে লাগলো লোকনাথ সাহা। যুগ পালটাচ্ছে—দেশ স্বাধীন হচ্ছে, সব মানি ;—এও জানি যে গরীবের দুঃখ দূর করতে হবে—চাষা-ভূষাদের পেটের অন্নের সংস্থান করে দিতে হবে। কিন্তু এ কী ব্যাপার! স্বাধীনতার আন্দোলন করতে হয়, লড়াই করতে হয়, করো ইংরেজের সঙ্গে। পেটের ভাত চাইতে হয়— মহকুমা-হাকিমের বাংলোর সামনে গিয়ে ধরণা দাও, শহরের রাস্তায় ভুখ মিছিল বার করো। এর কোনটাতেই লোকনাথ সাহার আপত্তি নেই। দরকার হলে দেশের জন্য সেও আত্মবিসর্জন করতে পারে। অর্থাৎ একটা সভা-সমিতিতে সভাপতি হয়ে মাস তিনচার 'এ' ক্লাশ জেল খেটে আসতে পারে—যা সে এর আগেও করেছে, আর বলো তো খবরের কাগজে জ্বালাময়ী একখানা পল্লীগ্রামের পত্রও সে লিখে দিতে পারে। অগ্নিময় কণ্ঠে প্রশ্ন করতে পারে : আমরা জানিতে চাই। জনপ্রিয় মন্ত্রীমণ্ডলী এই অনাচার-অবিচারের প্রতিবিধান করিবেন কিনা এবং কবে করিবেন?

কিন্তু এতো তা নয়। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে শেষ পর্যন্ত ফণা তুলে উঠেছে কেউটে সাপ। একি কখনো কল্পনাও করা যায় যে শেষ পর্যন্ত এ আপদ তারই ঘাড়ে চড়ে বসতে চাইবে? তিন ভাগের দুই ভাগ ধান! তার মানে দু'মাস পরে বলবে তিন ভাগের তিন ভাগই চাই! আর শুধু ওইখানেই থামলে হয়! শেষ পর্যন্ত দাবি করে বসবে—ঘর দাও, বাড়ী দাও, গরু দাও, বউ দাও—

নাঃ—অসহ্য! এবং অসম্ভব। কচুগাছ কাটতে কাটতে ডাকাত হওয়ার যে অদূর সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হয়ে আসছে এই মুহূর্তে তার কণ্ঠরোধ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে টুঁ শব্দটি করবার পর্যন্ত সাহস না পায়।

সত্যই অসহ্য। লোকনাথ সাহা কান পেতে শুনতে লাগল গ্রামের দিক থেকে কোলাহল উঠছে। জয়ের কোলাহল, আনন্দের কলধ্বনি। ফসল কেটে নিজেদের ঘরে তুলছে ওরা—মহাজন আর জোতদারদের বলে পাঠিয়েছে, দরকার হলে তারা যেন নিজেদের ভাগ নিজেরা এসে নিয়ে যায়। ওরা জমিতে লাঙ্গল দিয়েছে, সার দিয়েছে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে ফসল ফলিয়েছে এবং ফসল কেটেছে। আসলে সব ধানটাই ওদের দাবি। তবু জমিদার জোতদারকে একেবারে বঞ্চিত করতে চায় না, তাই ধর্মের নামে তাদের এক ভাগ ধান দিতে ওদের আপত্তি নেই। তবে বাড়ি বয়ে সে এক ভাগ ওরা দিয়ে আসতে রাজি নয়—বাবুমশায় এবং মিঞা সাহেবেরা ইচ্ছে করলে নিজেরা এসে অথবা লোক পাঠিয়ে তাঁদের পাওনা ভাগ নিয়ে যেতে পারেন।

লোকনাথ সাহা, ফজল আলী, নূর মামুদ আর বৃন্দাবন পাল চাষাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, আল্লার নামে, ভগবানের নামে ভেবে দেখ্, তোরা কী করতে যাচ্ছিস। চাষাদের পক্ষ থেকে রহমান জবাব দিয়েছিল, যা করেছি, আল্লার নামে ভেবেই করেছি। গায়ে-গতরে একটু আঁচড় লাগাবে না বাবু, জমির ভালো মন্দের দিকে একবার তাকাবে না, অথচ থাবা দিয়ে অর্ধেক ধান গোলায় তুলে নেবে। নিজেরাই একবার ইমানের দিকে তাকিয়ে দেখ কোনটা হক আর কোনটা বেইমানি।

ফজল আলীর আর সহ্য হয় নি। গর্জে বলেছিল, খুব হক আর

বেইমানি বোঝাচ্ছিস! ওরে, মোছলমানের বাচ্চা হয়ে হিঁদুর ফাঁদে পা দিলি! লজ্জা হয় না?

রহমান শুধু হেসে ছিল। বাধা দিয়ে বলেছিল, মোছলমান গরিব হিঁদু-গরিবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পেটের ভাতের জন্যে লড়াই করলে গুনাহ্ হয় আর হিঁদু-জোতদারের সঙ্গে দোস্তি করে মোছলমানের ভাত মারলে সেটাই বুঝি বড় ভালো কাজ হল? বোকা বুঝিয়োনা সাহেব, যাও, যাও—নিজের কাজে যাও—

পিঁপড়ের পাখ্‌না গজিয়েছে মরবার জন্য—অ্যাঁ? ধৈর্যচ্যুত হয়েছিল ফজল আলী: আচ্ছা টের পাবি! সেদিন পায়ে ধরে কাঁদলেও রফা হবে না—এই বলে রাখলাম।

—কলিজার রক্ত দিয়ে ধান রুখব, জান দিতে হয় দেব। তবু তোমাদের দোরে হাত পেতে সিন্নি চাইতে যাবো না। এ-ও জানিয়ে রাখছি।

—বটে? বেশ—বেশ।—আর কথা জোগায়নি ফজল আলীর। কয়েক মুহূর্ত নির্নিমেষ চোখে তাকিয়েছিল রহমানের দিকে—যেন রক্তখেকো একটা বাঘের মতো ওর ঘাড়ের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। তারপর দাঁতের ফাঁকে একটা ভয়ঙ্কর কটূ আভাস উচ্চারণ করে ধীর পদক্ষেপে স্থান ত্যাগ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছিল লোকনাথ সাহা, বৃন্দাবন পাল আর নূর মামুদ। তারপর—

তারপর থেকে এই চলছে। মানুষগুলো ক্ষেপে উঠেছে, মেতে উঠেছে জয়ের আনন্দে। এ যেন সাপের পাঁচখানা পা দেখবার আনন্দ। কিন্তু সাপের যে সত্যি পাঁচটা পা বেরোয় না—এটা ওদের বোঝানো দরকার। বুদ্ধিটা শেষ পর্যন্ত বাত্‌লে দিয়েছে ফজল আলীই। বলেছে, রঘুরামকে ডাকো।

—রঘুরাম?

—হ্যাঁ, রঘুরাম। সে ছাড়া আর কারো কর্ম নয়।

তারপর গলার স্বর নামিয়ে এনেছে ফজলআলী। চাপা গলায় বলেছে কতকগুলো ভয়ঙ্কর কথা। শুনে লোকনাথের অবধি শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠেছে, হিম হয়ে গেছে হাত-পাগুলো। জিভটা শুকিয়ে

হঠাৎ যেন আঠার সঙ্গে আটকে গেছে তালুতে।

ক্ষীণকণ্ঠে লোকনাথ বলেছে অতটা ?

—হ্যাঁ, অতটাই।

—বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না ?

—কিছু না। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

—কিন্তু থানা, পুলিশ—

ফজল আলী হেসেছে। বলেছে, সাধে কি তোমাদের সঙ্গে আমাদের বনি-বনাও হয় না, না পাকিস্তান চাইতে হয় ? আরে অত ঘাবড়ালে চলে ? তাছাড়া থানা পুলিশ—গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক হাসিতে মুখখানাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে ফজলআলী : কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে পারলে ওরাও আপত্তি করবে না দেখে নিয়ো। আর একটু থেমে দু-আঙুলে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে বলে : ঠিক হয়ে যাবে।

—তাহলে রঘুরামকে খবর দিই ?

—নিশ্চয়।

শুকনো ঠোঁট দুটোকে বার-কয়েক লেহন করে দুর্বল অনিশ্চিত স্বরে লোকনাথ বললে—দেখো ভাই, শেষতক পেছন পেছন থেকো। শেষে আবার সামনে ঠেলে দিয়ে সরে পড়ো না।

—ক্ষেপেছ।—পিচ করে অবজ্ঞাভরে দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুথু ছড়িয়েছে ফজল আলী। দু-বার হজ করেছি, পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি আমি। জীবনে একটা রোজা আমার ভাঙে নি। খাঁটি মোছলমানের বাচ্চা আমি—ইমান নষ্ট করব! কি যে বলছ—তোবা তোবা।

সুতরাং ডাক পড়েছে রঘুরামের। রঘুরাম বলেছে সন্ধ্যার পরে আসবে, দিনের আলোয় এ ব্যাপার সম্ভব নয়। গাঁয়ের লোক এমনিতেই ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ঘুরছে, দেখলেই সন্দেহ করবে। আর সন্দেহ করা মানেই চকচকে হাঁসুয়ার কোপে টুকরো টুকরো করে কেটে বস্তায় ভরে ভাসিয়ে দেবে করতোয়া নদীতে।

তাই সন্ধ্যার অন্ধকারে আসবে রঘুরাম। আসবে কালো রাত্রির

আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে নিঃশব্দচর সরীসৃপের মতো। তারই জন্ম প্রতীক্ষা করছে লোকনাথ—পায়চারি করে বেড়াচ্ছে বন্য জন্তুর মতো।

চাষীদের কোলাহলের এক একটা দমকায় বুকের ভেতর এক একটা চিড় খেয়ে যাচ্ছে তার।

রঘুরাম আসবে। কিন্তু কখন?

রঘুরাম পাশী। তালগাছ চাঁছে, তাড়ি তৈরি করে। ব্যবসা চলে অবশ্য আবগারিকে ফাঁকি দিয়ে। একবার ধরা পড়ে দুবছর জেল খেটেছে, কিন্তু স্বভাব বদলায় নি।

রোগা সিড়িঙ্গে লোকটা। নারকোলের দড়ির মতো ছিবড়ে পাকানো শরীর। অতিরিক্ত তাড়ি খায়, আবার গাঁজাও টানে ততোধিক উৎসাহে, বলে, রসটা তো শুকানো চাই—হে-হে-হে।

চোখের রঙ ক্ষ্যাপা বুনো মোষের মতো রক্তাভ, অত্যধিক নেশার ফলে স্বাভাবিক বর্ণ হারিয়ে এই রঙটাই পাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু এইটুকুই যথেষ্ট পরিচয় নয় রঘুরামের। কোন ছেলেবেলাতে একটা গাদা বন্দুক জোগাড় করেছিল রঘুরাম, হাত পাকিয়েছিল। তার-পর থেকে তার হাতের তাক একটা প্রবাদ বাক্যের মত দাঁড়িয়ে গেছে। কার্ত্তিক-অঘ্রান মাসে আশপাশের বিলে হাঁস পড়তে শুরু করে। মিঞা সাহেবরা, বাবু মশায়রা তখন বিলে নামে শিকারের চেষ্টায়। দমাদ্দম গুলি ছোঁড়ে, দশটা ফায়ারে একটা পাখি মারতে পারে না। আর তাই দেখে এলোমেলো দাঁতগুলোর দুপাটি একেবারে পরিপূর্ণ করে মেলে দেয় রঘুরাম, হো হো করে হাসে। বলে—কর্তাদের একটা গুলিও তো পাখিগুলোর গায়ে লাগবেনা, তবে যে রকম শব্দ-সাড়া হচ্ছে তাতে দুটো চারটে বাসায় গিয়ে মরে থাকবে।

তা হাসতে পারে বইকি রঘুরাম, বিদ্রূপ করবার অধিকারও তার আছে। তার হাতের তাগ ফসকায় না। বাবুদের বন্দুক চেয়ে নিয়ে এক ফায়ারে দশটা পাখি সে নামিয়ে দিয়েছে। বলেছে, শুধু কি বত্রিশ ইঞ্চি বন্দুক আর বাকসো বাকসো টোটা থাকলেই শিকারী হওয়া যায়? হাওয়া বুঝতে হয়। জায়গা বাছতে হয়, জল কাদা কাঁটা বন ভাঙতে হয়। সুখের শরীর আর কোঁচানো ধুতিটি নিয়ে বন্দুক বাগিয়ে কাক

তাড়ানো যায়—কিন্তু শিকার করা যায়না।

সত্যিই রঘুরাম পাকা শিকারী। আর শিকারী বলেই তাকে এমন সমাদর করে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তবে এবার আর তার পাখি শিকার নয়—তার চাইতে ঢের বড় বিপজ্জনক শিকারের বন্দোবস্ত।

আর এদিক থেকেও বেশ নিরাপদ নির্ঝঞ্ঝাট লোক রঘুরাম। নীতি বলে, বিবেক বলে কোন কিছুর বালাই নেই তার। টাকা পেলে যা খুশি, সে তাই করতে পারে, খামোকা গোটা তিনেক মানুষ খুন করে আসতে পারে। সকলের মাঝখানে থেকেও সে সকলের বাইরে—প্রয়োজন মতো নিজেকে কেন্দ্র করে সে একটা বৃত্তাকার পৃথিবী সৃষ্টি করে নিয়েছে। তালগাছ চাঁছে, তাড়ি গেলে, গাঁজা টানে আর গ্রামের প্রান্তে যে ডোমপাড়া আছে সেখানে কোন একটা মেয়েমানুষকে নিয়ে সারারাত কাটিয়ে আসে। সুতরাং এ কাজে তার চাইতে উপযুক্ত লোক আর নেই।

দরজায় ঘা পড়ল। ঘরের ভেতরে হঠাৎ ঘুমের ঘোরে ভয় পেয়ে চমকে জেগে ওঠা মানুষের মতো বিকৃত স্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো লোকনাথ: কে?

বাতাসের শব্দের সঙ্গে একাকার হয়ে স্বর ভেসে এল: রঘুরাম।

—দাঁড়াও, দোর খুলছি।

একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে দরজাটা খুলে দিলো লোকনাথ। তারপর তেমনিভাবেই ভয়ঙ্কর চাপা গলায়—যে গলায় ফজল আলী কথা বলেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই সেই কথাগুলোই সে আবৃত্তি করে গেল। চুপ করে শুনে গেল রঘুরাম, শুনে গেল পাথরের মূর্তির মতো।

—কখন?

—কাল সন্ধ্যেয়। হ্যাঁ। দিঘির পাড়ে সভা করবে ওরা। বড় বাঁশ-ঝাড়টার আড়াল থেকে কাজ শেষ করতে হবে।

—ক-টাকে মারতে হবে?

—না, না, বেশি নয়। এক রহমান হলেই যথেষ্ট। ওটাকে ঘায়েল করতে পারলেই শিরদাঁড়া মটকে যাবে ওদের। এবার তোমার হাতের তাক দেখব রঘুরাম।

রঘুরাম হাসল—এলোমেলো দাঁত বার করে বিশৃঙ্খলভাবে টেনে টেনে হাসল খানিকক্ষণ। বললে, আচ্ছা বন্দুকটা দিন। লোকনাথ বন্দুক বার করে আনলে। বললে, খুব সাবধানে। আমার প্রাণ হাতে দিয়ে দিচ্ছি তোমার, রঘুরাম। কাজ শেষ হলেই ফেরত চাই—নইলে মহাগণ্ডগোলে পড়ে যাবো।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, কাজ শেষ হলেই ফেরত দেব বই কি। তাজা কার্তুজগুলো আর খোলা বন্দুকটাকে একটা থলির ভেতর পুরতে পুরতে রঘুরাম বললে,—কিছু ভাববেন না—

তারপর উঠেই দ্রুতগতিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। লোকনাথ খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে—গ্রামের আনন্দ কলরোল কানের পর্দায় এসে শঙ্কর মাছের চাবুকের মতো এক একটা করে প্রবল প্রচণ্ড আঘাত বসিয়ে যাচ্ছে তাকে। কিন্তু একটা জিনিস জানলো না লোকনাথ। সেই রাত্রেই রঘুরাম গেল ফজল আলীর বাড়িতে, তারপর বৃন্দাবন পালের আড়তে, তারপর নূর মামুদের কাছারিতে। তারপর—

তার পরদিন বিকেলে জোর মিটিং বসেছে দিঘির পাড়ে। দলে দলে লোক জড়ো হয়েছে, চেঁচামেচি করছে, উচ্চারণ করছে তাদের কঠিন অপরাজেয় শপথ। উত্তেজনায় মুষ্টিবদ্ধ হাতটাকে বারে বারে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে রহমান : ভাইসব জান কবুল, আমরা ধান দেবো না। আমরা না খেয়ে কুত্তার মতো মরব আর মহাজনের গোলা ভরে উঠবে আমাদের খুন-মাখানো ধানে—এ আমরা হতে দেবনা —কিছুতেই না—

গগনভেদী সমর্থনের রোলে হারিয়ে যাচ্ছে রহমানের কণ্ঠ। এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে—সূর্যের উজ্জ্বল আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আজ রহমানের নিজের কথা কিছুই বলবার নেই। তার কথা আর সমস্ত মানুষের কথার বন্যায় একাকার হয়ে গেছে, সমস্ত মানুষের প্রতিশোধ আর প্রতিরোধের উদ্ধত মুষ্টির সঙ্গে মিশে গেছে রহমানের উদ্ধত মুষ্টিও।

ব্যক্তি-মানুষের সীমানা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সমষ্টিময় মানুষের বিপুল বিস্তারে। আজ শুধু রহমান বক্তা নয়—সমস্ত মানুষের বক্তব্য এক স্বরে মুখর হয়ে উঠেছে : জান দেবো, তবু ধান দেবো না।

নতুন জীবন বোধ নতুন শপথ।

পায়ের তলার মাটি কাঁপছে, মাথার উপর কাঁপছে আকাশ। আকাশে-বাতাসে ঝড়, ভূমিকম্পের সংকেত—বজ্র-বিদ্যুতের আগ্নেয় সূচনা। অসম্ভব। এ সহ্য করা যায় না। বিকেলের ছায়া নিবিড় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে, অন্ধকাব আসছে। আর সেই অন্ধকারের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে লোকনাথ সাহা, ফজল আলী, বৃন্দাবন পাল আর নূর মামুদ।

রঘুরামের হাতের তাক কখনো ভুল হয় না!

বিকেল কেটে গেল, সন্ধ্যা নামলো। দিঘির পাড়ে এখনো মিটিং চলছে। মশালের আলো জ্বলছে, রহমান, কান্তলাল, যদু প্রামাণিক, মইনুদ্দিন—বলে যাচ্ছে একের পর একজন। একই কথা—পুরানো কথা। জান দেবো, ধান দেবো না—

কিন্তু কোথায় রঘুবাম—রঘুনাথের মত অব্যর্থ সন্ধানী রঘুবাম? তার হাতের তাক কখনো ব্যর্থ হবে না। বাঁশের ঝাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে মাত্র একটা গুলি ছুঁড়বে সে,—বুকে হাত চেপে পড়ে যাবে রহমান। একটি ঘায়েই বিষদাঁত উপড়ে যাবে কালকেউটের। কিন্তু সে কখন—কোন শুভলগ্নে?

লোকনাথ সাহা, ফজল আলী, বৃন্দাবন পাল আর নূর মামুদ অধৈর্য্য হয়ে উঠছে। আর কত দেরী করবে রঘুরাম? সময় চলে যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে অতি মূল্যবান, অতি দুর্লভ সুযোগ। সভা ভেঙে গেলেই রহমানকে আর সহজে পাওয়া যাবে না, কোথা থেকে কোথায় যে ঘুরে বেড়াবে লোকটা তার কোন ঠিক-ঠিকানাই নেই। আজ হয়তো এখানেই আছে, দেখতে দেখতে কাল সকালে একেবারে হাওয়া হয়ে যাবে, চলে যাবে দূরে—অন্যান্য গ্রামে, গিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করবে। লোকটা এ গাঁয়েরও নয়, কোথা থেকে সে শনির মত আমদানি হয়েছে ভগবানই জানেন। চাল নেই, চুলো নেই, গাঁয়ে গাঁয়ে চাষা প্রজা

ক্ষ্যাপানো ছাড়া আর কোন কাজই নেই তার।

কিন্তু এত দেরি করছে কেন রঘুরাম, কেন এমনভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে এই দুর্মূল্য মহার্ঘ সময়? একটা বন্দুকের শব্দ শোনা দরকার। শোনা দরকার সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে এই আন্দোলনটার মৃত্যু-যন্ত্রণার মতো একটা ভয়াবহ আর্তনাদ। একটা অস্বস্তিকর অধৈর্য পাথরের মতো গুরুভার হয়ে চেপে বসেছে লোকনাথ সাহা, নূর মামুদ, ফজল আলী আর বৃন্দাবন পালের বুকের ওপর। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে, ইচ্ছে করছে নিজেদের হাতগুলো কামড়ে রক্তাক্ত করে দিতে। কেন দেরি করছে—কেন এমন অশুভভাবে বিলম্ব করছে রঘুরাম?

অবশেষে পরমাশ্চর্য যা তাই ঘটল। মিটিং শেষ হয়ে গেল নিরাপদে একান্ত নির্বিবাদে। কালকেউটের বিষদাঁত ভাঙল না—বরং আরো বেশি বিষ সঞ্চয় করে নিলে সে—আরো বেশি করে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল আকাশে-বাতাসে ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্পের সংকেতময়তা।

কী হল রঘুরামের?

ছুটতে ছুটতে এল ফজল আলী, নূর মামুদ, বৃন্দাবন পাল।

—কি হল রঘুরামের?

—তাই তো ব্যাটা করলে কী শেষ পর্যন্ত? সভয়ে লোকনাথ বললে, কাল সন্ধ্যেবেলায় ব্যাটা আমার বন্দুকটা নিয়ে গেল—

—অ্যাঁ! তিনজনেই চমকে উঠল। ফজলআলী বললে,—সেকি! তোমার বন্দুক নিয়েছে, আমার কাছ থেকেও তো বন্দুক চেয়ে নিয়ে গেল। বললে তোমার বন্দুকটা নাকি খারাপ হয়ে গেছে তাই—

নূর মামুদ আর বৃন্দাবন পাল আর্তনাদ করে উঠল: কী সর্বনাশ, ওই একই কথা বলে ব্যাটা তো আমাদেরও বন্দুক চেয়ে নিয়ে এসেছে—

ঘরের ভেতর যেন বাজ পড়ল।

কারও মুখ দিয়ে আর একটি কথা ফুটছে না। একটা নয়, দুটো নয়, চার-চারটে বন্দুক সংগ্রহ করেছে রঘুরাম। কিন্তু কেন? একটা একগুলির শিকারের জন্যে সে চারটে বন্দুক নিয়ে কী করবে?

হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত রঘুরামকে পাওয়া গেল

চাঁড়াল পাড়াতে।

গাঁজা আর তাড়ির নেশায় তার তখন তুরীয় অবস্থা। একদল চাঁড়াল মেয়ে পুরুষের একটা উন্মত্ত অশোভন বৈঠকে বসে সে প্রাণ খুলে অশ্লীল গান ধরেছে।

ফজল আলী চিৎকার করে উঠল : এই হারামির বাচ্চা, আমাদের বন্দুক কই ?

নেশারক্ত চোখ দুটো মেলে তাকালো রঘুরাম। তারপর এলোমেলো বিশৃঙ্খল দাঁতগুলো বার করে পরম কৌতুকে হো হো করে হাসতে শুরু করে দিল।

—হাসছিস যে শালা ? বন্দুক কোথায় ?

এক মুহূর্তের জন্যে হাসি বন্ধ করে রঘুরাম বললে,—রহমানকে দিয়েছি। রহমানকে !!!

আকাশ বিদীর্ণ করে বাজ পড়ল না, আকাশটাই যেন ধসে পড়ল মাটিতে। এক মুহূর্তে থ্যাঁতলা হয়ে, চ্যাপ্টা হয়ে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে গেল লোকনাথ সাহা, ফজল আলী, বৃন্দাবন পাল, আর নূর মামুদ।

—রহমানকে !!!

—তা ছাড়া আবার কী ?—এবার রঘুরাম আর হাসল না। পাকা ব্যবসায়ীর মতো গম্ভীর বুদ্ধিমানের গলায় জবাব দিলে : ওরা বেশি ধান পেলে আমার তাড়িও বেশি বিক্রি হবে, এ কথাটা কেন বুঝতে পারছো না ?

আগন্তুক

ননী ভৌমিক



ননী ভৌমিক বীরভূম জেলাব মানুষ। লেখা পড়া করেন অধুনা বাংলাদেশেব রংপুর কারমাইকেল কলেজে। ঐখানেই তিনি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। বাংলা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনেব তিনি ছিলেন অন্যতম কর্মী ও সংগঠক। এক সময় তিনি পরিচয়-এর অন্যতম সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেন। চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে মার্কসবাদী এবং প্রগতিশীল পাঠক মহলে তাঁব গল্পগুলি সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁব লেখা 'ধুলোমাটি', 'ধানকানা' এবং 'চৈত্রদিন' আজও বাংলা প্রগতি সাহিত্যের পাঠকদের কাছে অতি পবিচিত নাম। বর্তমানে তি'ন বাশিয়ায় আছেন। রুশ ভাষা থেকে তিনি একাধিক গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

দূর থেকে সারি সারি গাছের সুবিন্যস্ত লাইন দেখে বোঝা যায় ওটা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। নির্জন রাস্তাটার এক কোণ দিয়ে ঢিমিয়ে চলেছে একটা ছই ফেলা গরুর গাড়ি। চলন্ত গরুর গা থেকে মৃদু গৈরিক একটা ধূলোর রেশ উঠে-রোদ্দুরে-বাতাসে ভেসে উঠেছে আবীরের মতো।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটা ছেড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসে একটা লোক। দূরে আকাশের গায়ে মসৃন নীলাভ একটু আবছার মতো দেখা যায় সাঁওতাল পরগনার পাহাড়, রাঢের রুক্ষ কঠিন মাটি, কখনো ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, ধাপে ধাপে সেখানে ধানখেত গড়ে তুলেছে এখানকার মানুষ। কোথাও বিঘার পর বিঘা পতিত জমি, ডাঙা, চারিদিককার খেতের মাঝখানে উঁচু হয়ে উঠেছে এক বৃহদাকার কাছিমের পিঠের মতো।

মাঠের মধ্যে দিয়ে হন হন করে হেঁটে আসে লোকটা। গায়ের জামাটা খুলে মাথায় চাপা দিয়ে রেখেছে রোদ্দুর এড়াবার জন্যে। হাঁটার ধরণ দেখেই বোঝা যায় স্থানীয় লোক নয়। যত তাড়াই থাক, এখানকার মানুষ যখন আলের ওপর দিয়ে হাঁটে তখন সে হাঁটার মধ্যে একটা স্বাভাবিক ছন্দ চোখে না পড়ে পারে না, কিন্তু এ লোকটির হাঁটার ধরণ সেরকম নয়। বেশ বোঝা যায় শহরের লোক।

এদিকে ওদিকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট কতকগুলো গ্রাম দেখা যায়। মাটির দেয়াল আর উচু নিচু কুঁড়েঘরেব চাল। গ্রামগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় লোকটা এক একবার থামে। মনে হয়, হয়তো ভাবছে ঢুকবে কিনা। তারপর কি ভেবে প্রত্যেকবারই নিঃসঙ্গ মেঠো পথ ধরেই হাঁটতে থাকে।

রোদের হলকায় কোথাও কোথাও মাটি অসম্ভব তেতে উঠেছে। সে সব জায়গায় বাতাসটা উত্তপ্ত হয়ে ঝিলমিল করতে থাকে। হঠাৎ মনে হয় বুঝি বালির মধ্যে জল চিকচিক করছে।

চোক কুঁচকিয়ে সেই ঝিলমিলটুকুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে লোকটা, তারপর অদূরের হিজিবিজি কালো ছোট শালবনটা লক্ষ্য করে

এগিয়ে যায়।

'কে বটেন গো—'

একটা কাঁদরের পাশে ছনী ছেঁচছিল কয়েকজনে। অনেক নিচে জল। ধাপে ধাপে সেটা তুলে সেচ করার জন্যে তিনটে ছনী লাগাতে হয়েছে। সবার ওপরের ধাপের লোকগুলো কৌতুহলবশে ছনী ছেঁচা বন্ধ রেখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওরই মধ্যে বুড়ো মোড়ল মতো একটা লোক এগিয়ে এসে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করে আবার,—'কে যেছেন গো-ও-ও-ও—'

লোকটা অস্বস্তিভরে খানিক থামে। তারপর হাঁটতে হাঁটতেই উত্তর দেয়,—'তিন গাঁয়ের লোক বটি বাপু, যাবো শালবুনী···'

দূর থেকে আবার প্রশ্ন ভেসে আসে,—'ঘর-কুথা-আ-আ···'

লোকটা হাঁটতে হাঁটতেই উত্তর দেয়,—'মল্লারপুর···'

বুড়ো লোকটা তামাক খেতে খেতে আরো খানিকটা এগিয়ে যায়। বাঁ হাতটা প্রসারিত করে উপযাচক হয়ে নির্দেশ দেয়—'হুই শালবনটোর পুবপাশ দিয়ে ওই দেখা যেছে, একটো সরান পাবেন। সরানটোর পর একটা দুটো তিনটে গাঁ বটে···কিন্তুক উখানে যাবেন মশায়, উখানে যে······'

লোকটা বিব্রতভাবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। আপন মনে অস্ফুটভাবে বলে,—'হুঁ! শালবনীর অবস্থা তাহলে ভালো নয়। লোকগুলোর সঙ্গে একটু আলাপ করে গেলে হত!' তারপর কিছুক্ষণ পরে আবার কি ভেবে মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে, 'ধুত্তারি যতো······' বলে আরো জোরে জোরে হাঁটতে থাকে।

শালবনটার এক কোণে গিয়ে লোকটা থামল। শালবনী গ্রামটা এখান থেকে একেবারে কাছে। এলো মেলো কুঁড়েঘরগুলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু লোকটা গ্রামে ঢুকল না। একটা কাটা শালকাঠের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রইল ক্লান্ত ভাবে। ছোট শালবনটার ভেতরে কোথাও যেন ঠিকাদারের কয়েকটা লোক কাঠ চেলাই করছে। মাঝে মাঝে বাতাসে শুকনো শালপাতা ওড়ার খড় খড় শব্দ আর অজস্র নানারকম পাখির ক্লান্তিহীন কাকলীর মাঝে কাঠ চেলাইয়ের নিয়মিত ঝপঝপ শব্দটাকেও

একটা নৈসর্গিক শব্দ বলেই ভুল হয়। এ সমস্ত কিছুই লোকটার কাছে অত্যন্ত চেনা, কিন্তু তবু কেমন যেন নতুন।

'আহ্!' একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রনার শব্দ উচ্চারণ করে লোকটা অস্ফুট-ভাবে। তারপর হাঁটুর ওপর থুতনিটা রেখে বসে থাকে ক্লান্তিতে আর গভীর চিন্তায়।

অনেক দূর থেকে ভেসে আসা একটা মৃদু আওয়াজ শুনে হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠল লোকটা,''কে!'

দূরে মোষের পিঠের ওপর বসে একটা ন্যাংটা কালো ছেলে গরু আর মোষগুলোকে তাড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল একটা শুকনো গোচর থেকে আর একটা গোচরে। মোষের পিঠের ওপর থেকে ওকে দেখে সেই চিৎকার করেছে, 'ঠাকুর'। অতদূর থেকে সে শব্দটা সুস্পষ্ট ঠাহর করা কঠিন, কিন্তু এই ডাকটা এতই পরিচিত যে শুধু তার সুরটুকু কানে এসে লাগা মাত্রই লোকটা চমকে উঠল—'কে তুই?'

ছেলেটা মোষের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল। আগন্তুক লোকটার দিকে আর একবার ভালো করে চেয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,—'ঠাকুবই তুমি বটো! বহুৎ দিন দেখি নাই যে—'

'হাঁ-তা দুবছর হল। তুই কে?' অন্যমনস্কভাবে বলে লোকটা।

'আজ্ঞা আমাকে চিনবেন না। আমি তো ই শালবনীর লই। আমি হুই কদমপুরের শঙ্কর বাগদীর বেটা—'

'ও। শালবনীর লোকেরা কেমন আছে জানিস?'

'আজ্ঞা উখানে তো সেই হতে মিলিটারী বসে আছে...'

'হুম—' লোকটা চুপ করে থাকে।

ছোড়াটা এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার জানায়, একজন অভিজ্ঞ বয়স্কের মতো—'এখন গরীবদের মরণ। আপনারা সেই হতে আর তো এলেন না। কত লুকে বলে বাবুরা ছুঁচকিয়ে পলাইল, এখন...' বেশ বোঝা যায় বড়োদের মুখে শোনা কোন একটা অভিযোগ সে হুবহু পুনরাবৃত্তি করল মাত্র।

'পালাল!' হঠাৎ এক মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে উঠল ওর সারা

মুখ। বিকৃত গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'ছুচকিয়ে পালিয়েছি আমি ?'

ছেলেটা ভীতভাবে সরে যায় 'আজ্ঞা—'। তারপর আস্তে আস্তে পেছিয়ে গিয়ে ছুটতে শুরু করে বনের মধ্যে দিয়ে।

ছুচকিয়ে পলাইল···সেই হতে আর তো এলেন না···

ঠিক এই অভিযোগটিকেই ভয় করে এসেছে ঠাকুর। কম অভিযোগের সম্মুখীন তাকে হতে হয়নি। অনেক নিন্দা, অনেক কুৎসা, অনেক মূর্খ প্রতিরোধ, কিন্তু কোনদিন তার সম্মুখীন হতে গিয়ে আতঙ্ক জাগেনি। আজ জাগছে।

আজ আতঙ্ক জাগছে এমন কি অন্যের মুখে তার উদ্দেশে রচিত এককালের প্রিয় সম্ভাষণ 'ঠাকুর' ডাক শুনেও। মনে মনে অনেকবার প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও শালবনের কোণটি থেকে উঠে সে গ্রামের মধ্যে ঢুকতে পারল না। শূন্য ফাঁকা একটা মানুষের মতো ঠায় বসে রইল ওই একই জায়গায়।

ঠাকুর। এক সময় এ ডাকটা ছড়িয়ে গিয়েছিল এ অঞ্চলের সমস্ত গ্রামে। ভালোবাসত কিনা কে জানে, কিন্তু ঠাকুর বললেই লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা ঝাঁকাত। লোকটার আসল নাম ছিল মুরারি। কিন্তু সে নামটা কারো পছন্দ হয়নি। কেউ মনে রাখেনি।

'আমরা লাল ঝাণ্ডার লোক, বুঝলে ? আমার নাম মুরারি।'

প্রথম এ অঞ্চলে এসে মুরারি পরিচয় নিজের দিয়েছিল ঐ বলে। কিন্তু তাতে কেউ সন্তুষ্ট হয়নি। বুড়ো মতো বেঁটে একটা লোক সাহস করে আবার প্রশ্ন করেছিল, 'আজ্ঞা-হাঁ, ভদ্দরলুক বটেন, কিন্তু জাতিটো কী আমনার ?'

মুরারি না ভেবেই বলে ফেলেছিল, 'বামুন।'

কথাটা শোনামাত্রই মৃদু গুঞ্জন উঠল ওদের মধ্যে। তারপর সশ্রদ্ধ ভাবে সকলে দণ্ডবৎ করতে শুরু করে দিলে।

'আজ্ঞা তা হবেন বৈকি, ভদ্দরলুক—দণ্ডবৎ হইগো—'

জনকয়েক সাঁওতাল দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। তারা এগিয়ে এল—

তুই বামুন বটিস ? তবে তো তুই ঠাকুর হলি।'

'হাঁ হাঁ ঠাকুর বৈকি। দেববংশে জন্ম— '

সকলে সায় দেয়। মুরারির অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই অচ্ছুৎ শূদ্র এলাকায় তার নাম চালু হয়ে যায় ঠাকুর বলে। ব্রাহ্মণকে ঠাকুর বলে ডাকাই এ অঞ্চলে প্রাকৃতজনের রীতি।

মুরারি এর পর থেকে বার বার চেষ্টা করেছে এই সম্ভাষণটাকে বর্জন করার। কিন্তু সফল হয়নি।

'শোনো, ঠাকুর নয় কম্‌রেড। যারা পুরুতগিরি করে তারা ঠাকুর। আর যারা একসঙ্গে লড়াই করে তাবা কমরেড। বুঝলে—'

'আজ্ঞা হাঁ। উ ক্যানে বুঝব না ?'

কিন্তু পর মুহূর্তে ডাকাব সময় কমরেড কথাটা কিছুতেই মুখে আসেনি। অনায়াসে ঠাকুর বলেই ডাক দিয়েছে। মনে করিয়ে দিলে লজ্জিত ভাবে বলেছে,—'আজ্ঞা ই ডাকটোই আমাদের চল হয়ে গেইছে যে—'

যে ডাকটা অচল হয়ে যাওয়া উচিত সেটাকে কিছুতেই অচল করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছিল মুবারি।

শুধু একটা জায়গায় সে সফল হয়েছিল। সে হচ্ছে কেঁদরা মাঝির বৌ সনা সাঁওতালনী। সেই শুধু ওকে ঠাকুর বলে ডাকেনি।

মূল গ্রাম থেকে খানিকটা দূরে একটা ডাঙার ওপব ছিল কেঁদরা মাঝির দুটি কুঁড়েঘব।

ক্রমে ক্রমে কেঁদরা মাঝিব ঘরটাই মুরাবির আশ্রয় স্থল হয়ে উঠেছিল। ছন্নছাড়া মানুষ ছিল কেঁদবা মাঝি। জমি-জিরাত কিছুই ছিল না। ঘবে ছিল তার এক বুড়ি মা, বৌ আর বাচ্চা একটা ছেলে। কয়েকটা বাচ্চা সহ দুটো শূয়োর। তিনটে ছাগল আর মুর্গী কয়েকটা। কেঁদরা দিন-মজুরী করে বেড়াত এখানে ওখানে। কখনো মাটি কাটা, কখনো শালবনে কাঠ কাটা, কখনো দূর নামালে ধান কাটার কাজ। কেঁদরার বুড়ি মার ছিল খানিকটা ভাঙা জমি। তাতে সর যা হত তাই দিয়ে সে বসে বসে সরের ঝাঁটা তৈরী করত, তালপাতা দিয়ে মাথার মাথালি বুনত। আর নিয়ে যেত হাটে বেচতে।

ঘরকন্নার বাকি কাজ, ঘরের সামনে খানিকটা লাউলতা কুমড়োলতা আর তরীর একটু বাগান দেখত কেঁদরার বৌ সনা।

কেঁদরা যখন প্রথম নিয়ে আসে মুরারিকে, তখন ঘরের লোকেরা কেউ খুশি হয়নি। কিন্তু সহ্য করেছিল। মুরারিকে শুতে দেয়া হয়েছিল কেঁদরার মায়ের সঙ্গে আর একটা কুঁড়েতে। ঘরের মধ্যেই শূয়োর থাকার জন্যে মাটির ছোট পাঁচিল দেয়া একটুখানি জায়গা। জায়গাটা যার জন্যে করা হয়েছিল সে জীবটিকে বিক্রি করে দিতে হয়েছে কিছু দিন আগে। সেই খালি জায়গাটায় খড় বিছিয়ে শুতে দেয়া হয়েছিল মুরারিকে। মাথার ওপর বাঁশের মাচা থেকে ঝোলান একটা ঝাঁপির মধ্যে কতকগুলো মুর্‌গী সারারাত থেকে থেকে খস্ খস্ করে উঠেছে।

ভোরবেলা মুবারিকে আশ্বস্ত করে কেঁদরা চলে গিয়েছিল কোথায় খাটতে। মুরারি কি একটা কাজে অভ্যাসবশে সনাকে ডেকেছিল—'মেঝেন, ও মেঝেন শোনো তো খানিক ··'

এ অঞ্চলের ভদ্রলোকেরা সাঁওতাল মেয়েদেব ডাকতে হলে মেঝেন বলেই ডাকে। কিন্তু সে ডাকটা যে তাচ্ছিল্যেব ডাক, অপমানের ডাক, এ ধারনা মুবাবির ছিল না।

সনা এসে দাঁড়িয়েছিল ক্রুদ্ধভাবে 'কি বলছিস তুই?'

মুরারি না ভেবেই তাব প্রয়োজনেব কথাটা জানাল। কিন্তু সনা নড়ল না—'কিন্তু তুই কি বলে আমাকে ডাকছিস?'

'কেন মেঝেন বলে—'

'ক্যান্ মেঝেন বলবি?' সনা ভুরু পাকিয়ে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে রইল মুরারির দিকে।

মুরারি থতমত খেয়ে বলেছিল, 'তবে?'

'ও তুর কে হয়?' সনার কথাব ভঙ্গিতে বোঝা গেল সে কেঁদরার কথা বলছে। মুরারি অপ্রতিভভাবে জানাল,—'কেন, ও তো আমার কমরেড। যারা একসঙ্গে লড়াই করে তারা হল কমরেড—'

সনার সুন্দর তাজা কালো মুখটার ওপর ক্রোধ ও সন্দেহের কোঁচকানিটুকু তখনো যায়নি। তবু একথাটা শুনে একটু অপেক্ষা করল। তারপর অন্যদিকে চেয়ে বললে, 'তবে তুই আর উ তো-বন্ধু হলি।'

'হাঁ বন্ধু হলাম—'

'তবে আমাকে মেঝেন বলছিস কেনে?'

'বেশ, তবে তোকেও কমরেড বলব।' অনিশ্চিতভাবে বলেছিল মুরারি। কিন্তু এই অদ্ভুত ইংরেজী কথাটা শুনে সনার কোঁচকানো মুখ আরো কুঁচকিয়ে উঠল সন্দেহে। কেঁদরার বুড়ি মা এসে ওকে বাঁচিয়ে দিলে।

'হাঁ তবে মেঝেন ক্যানে বলবি। উসব কি বলছিস? তো উ ক্যানে বলবি? কেঁদরা তুর বন্ধু হল, তুই আমার ব্যাটা হলি। তো 'ফুল' পাতা, 'বন্ধু' পাতা—'

সনা তখনো ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে মুরারি বিব্রত অনিশ্চিতভাবে জানালে যে বেশ তাহলে এবার থেকে সে সনার সঙ্গে 'ফুল' পাতাল, এবার থেকে সে 'ফুল' বলে ডাকবে, অমনি সে কোঁচকানো সুন্দর কালো মুখটা আদিম সারল্যে খুশি হয়ে উঠল:

'তুর সামনে লাজ নাই আর। তুই ঘরের লুক হলি। তুই আমার 'ফুল' হলি—'

বলে সনা তাড়াতাড়ি ছুটে গেল ওখান থেকে। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এল। লজ্জিতভাবে হেসে বলল, 'এই লে—'

বিস্মিতভাবে মুরারি হাত বাড়ালে, 'কি এগুলো?'

'ফুল'···সনা কোন সময় এদিক ওদিক খুঁজে কতকগুলো বুনো ফুল নিয়ে এসেছে বন্ধুত্বের স্মারক হিসাবে···

হাঁ, এরা ওকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। এই শুকনো রাঢ়ের মাটির আদিম সন্তানেরা, এই কালো কালো সরল মানুষগুলো মেনে নিয়েছিল আগন্তুক মুরারিকে। কেউ ঠাকুর বলে, কেউ বেটা বলে, কেউ ফুল বলে, কিন্তু অনায়াস-গ্রহণের এই বিপুল বিস্ময়টুকু কোন দিন বিস্মিত করেনি মুরারিকে। কারণ ওরা মুরারিকে যত সহজে গ্রহণ করেছিল, ততখানি দৃঢ়তার সঙ্গেই তার প্রত্যেকটি বিশ্বাসকে ওরা প্রতিরোধ করেছে।

মনে পড়ে মুরারির প্রথম জনসভা। তখনো সে ঠাকুর বলে তত পরিচিত হয়ে ওঠেনি। সভার জন্য মুরারি আর কয়েকজন উৎসাহের সঙ্গে

এ গ্রাম ও গ্রাম, এঘর ওঘর প্রচার করে বেড়িয়েছে। তারপর সভার নির্দিষ্ট দিনে দেখা গেল কিছু কিছু লোক এসে জুটেছে বটে, কিন্তু কাছাকাছি আসছে না কেউ। সভাস্থলে একটা লাল ঝাণ্ডা পুঁতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্লোগান দিয়ে মুরারি একটা আনুষ্ঠানিক জনসভা শেষ করেছিল। লাল ঝাণ্ডার কাস্তে আর হাতুড়িটার মানে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিল 'এ পতাকা হল চাষী আর মজুরের পতাকা, বুঝেছ?'

সবাই চুপ করে রইল। খানিক চুপ করে থাকার পর ওদের মধ্যে থেকে একজন বয়স্ক 'লেট' জাতের ভাগচাষী উঠে এসে বললে, 'আজ্ঞা উ নিশানটো একবার আমরা দেখব—'

'বেশ বেশ।' মুরারি খুশি হয়ে ঝাণ্ডাটা নামিয়ে এনে ওদের দিয়েছিল। কাপড়ের দোকানে লোকে যেভাবে কাপড়ের জমি পরখ করে, সেই ভাবে ওরা ঝাণ্ডার সালু কাপড়টা নেড়ে নেড়ে পরখ করলে। উলটে পালটে কাস্তে আর হাতুড়ির ছাপটা দেখলে, তারপর নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন করতে করতে ফিরে গেল।

সভামণ্ডপ থেকে মুবারি জিজ্ঞেস করেছিল 'কি বলছ?'

'আজ্ঞা না, উ আমরা নিজেদের কথা বটে, আমনাদেব লয়—'

কিন্তু গুঞ্জন যেটা শুরু হয়েছিল তা থামল না। জনসভাও হল না। আস্তে আস্তে যারা জুটেছিল তাবা অন্তর্হিত হয়ে গেল।

কারণটা কি মুবারি বুঝতে পারেনি।

কিন্তু তারপর থেকে দেখা গেল লেট আর বাগদী চাষীরা ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে।—'কি হয়েছে তোদের?' বিরক্ত হয়ে ধমক দিত মুরারি।

'আজ্ঞা না, হবেন আর কি, আপনারা ভদ্দরলুক—।'

'কিন্তু হল কি? কি ভাবছিস সেইটে খুলে বল—'

'আজ্ঞা উসব আমরা কি ভাবব মাশায়? আমাদের কি খেমতা আছে। সেই যে কথায় বলে, 'শুনো ডুনো কানা, পথ চলি তিনজনা —সেই হয়েছে আমাদের। আমরা কি ভাবব?······তবে লুকে বলছে······'

'কি বলছে লুকে?'

'হেই ঠাকুর দোষ লিও না। কিন্তুক লুকে বলছে তুমরা চাষীর কিছু করতে লারবে। ক্যানে? না তুমরা ঐ যে পতাকাটি বানিয়েছ, তাতে একটি কেদে (কাস্তে) লাগিয়েছ। কিন্তুক ঐ কেদেতে কি ধান কাটা চলবে? উ কেদেতে দাঁত কই? ই আমাদের কেদে লয়। সোজা সাপটা একেবারে······তাই বলছে ই পতাকাটি চাষীর পতাকা লয়। আমনারা ভদ্দরলুক—'

মুরারি হাসবে না কাঁদবে ঠাহর করতে পারল না। যত বোঝায় যে আসল কাস্তের দাঁত থাকে বটে, কিন্তু ছবি আঁকার সময় ঘোরালো একটা টান দিয়ে দেখালেই তা কাস্তের প্রতীক হয়ে ওঠে। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

পরের বার সভা করতে যাবার সময় মুরারি কাস্তের ছাপটার ওপর কোনাচে কোনাচে করে কাগজ এঁটে দাঁত বানিয়ে নিজে হাজির হয়েছিল। প্রথমে ও বক্তৃতা শুরু করেছিল, 'এই হল গিয়ে কেদে, এই দাঁত, চাষী এই দিয়ে ধান কাটে। এ হল গিয়ে চাষীর হাতিয়ার······'

কতকগুলি অবিশ্বাসকে বুঝ দেয়া গেলেও অনেক অবিশ্বাসকে এক ইঞ্চি টলানো যায়নি। তার মধ্যে প্রধান অবিশ্বাসটাই ছিল মুরারির ক্ষমতা সম্পর্কে অবিশ্বাস, মুরারির স্বপ্ন সম্পর্কে অবিশ্বাস।

মুরারি স্বপ্ন দেখেছিল এ দুনিয়াটাকেই বদলে দিতে হবে। নতুন-পাওয়া এক রাজনৈতিক আদর্শ আর আবেগ তাকে দুরন্ত করে তুলেছিল। মনে পড়ে কলকাতার সেই বিরাট জনসভার কথা। ছাত্র, কর্মচারী আর মজুরের জনসমুদ্র। সেই সভায় বড় বড় নামকরা নেতার মাঝে উঠে দাঁড়িয়েছিল এক মজুর। আঁটো হাফশার্টটার তল থেকে তার চওড়া কাঁধ তার অসম্ভব শক্তিশালী মোটা ঘাড়ের দীপ্ত ভঙ্গিটা এক মুহূর্তে মুগ্ধ করে দিয়েছিল সমস্ত জমায়েতকে। অল্প একটুখানি বক্তৃতা করেছিল সে। চ্যাটালো পেশল হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করে বক্তৃতার শেষে কর্কশ মোটা গলায় মজুরটা হেঁকে উঠেছিল, 'হিলা দেঙ্গে! হিন্দুস্তানকো হিলা দেঙ্গে।'

তারপর অনেক ওলট পালট হয়েছে। কিন্তু সেই নির্ঘোষটা মুরারির মাথা থেকে যায়নি। মুরারির সমস্ত স্বপ্নের মধ্যে সে আওয়াজটা আজো

বাজে এক গম্ভীর ঘণ্টা ধ্বনির মতো—হিলা দেঙ্গে। হিন্দুস্তানকো হিলা দেঙ্গে!

সে স্বপ্নকে সে বাস্তবে দেখবার জন্যে এসেছিল রাঢ়দেশের এই অপরিচিত কোণটায়।

মুরারি বলত তার স্বপ্নের কথা—'এই যে জমি, এই জমির মালিকটা কে? জমিদার? বটে তো! তারপর ধরো ঐ দত্তরা, ২০০০ বিঘা খাস জমি করে নিয়েছে ওরা। তোমাদের ভাগচাষ খাটতে হচ্ছে। কিন্তু ফসল যা হচ্ছে তার বিশ ভাগ ওরা নিচ্ছে ১৮ ভাগ তোমরা পাচ্ছ? কেন! এসব বদলে দিতে হবে······'

ওরা এসব কথা শুনত না যে তা নয়, শুনত মুগ্ধের মতো। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাহিনী বলত। কেমন করে বসন্তে চোখ কানা মহাজন দত্তরা একদিন ধম্ম পূজোর দিন ডে লাইট জ্বালিয়ে দেখালে। গাঁয়ের কেউ ডে লাইট দেখেনি। দেখতে পেল। দত্তরা বলে দিলে তোদের সকলের ওপর এক এক টাকা ধার্য রইল। ডে-লাইটের খরচটা তুলতে হবে তো।

তারপর হিসেবের কারচুপীতে সুদের চক্রবৃদ্ধি হারে একদিন দেখা পেল ডিক্রি হয়েছে। জমিতে টান পড়েছে সবার। ডে-লাইট দেখার শোধ দিতে হল জমি বেচে। সকলের ভাগ্যেই এমনি প্রকাশ্য দস্যুতার নানা ইতিহাস। শালিখডাঙার এক কামার ঐ মহাজন দত্ত আর জোতদার কালী ময়রার দাপটে ভিটেমাটি তুলে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। সেই কামার গান বেঁধেছিল ঃ

বল মা দুর্গে বল মা শঙ্করী!
কলিকালে উপায় কি করি—
কানা বেণে আর কালী ময়রা
কেহ প্লেগ কেহ কলেরা
একবার যারে ধরিবে তাহারে
সম্পত্তি না নিয়ে নিষ্পত্তি করে না······

মুরারি বলত, 'তবে? এ ব্যবস্থাটাকেই বদলে দিতে হবে। জমিদার জোতদার চাই না। যে চাষ করে জমি হবে তার। চাষীর হাতে জমি

এলে আমরা কলের লাঙ্গল নিয়ে আসব। দেশের চেহারা একেবারে বদলে দেব।

তখন সকলেই মাথা ঝাঁকাত। 'ইটো ন্যায্য কথা বটে।'

'যা বলেছ! তা লয়ত কি?'

কিন্তু দুদিন পরেই দেখা যেত আবার ওরা এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে মুরারিকে। 'কি কি হয়েছে তোদের, বল্ দেখি—'

ক্রুদ্ধ ধমক দিয়ে দিয়ে ওদের পেটের কথা বার করতে হত মুরারিকে। 'কী হয়েছে?'

'না ঠাকুর! ও লুকে বলছে জমিদারী উঠে গেলে উতো লাটের জমি হয়ে গেল। তখন আরো মরণ, সূর্যি ডুবতে না ডুবতে খাজনা দাও লয়ত নীলাম—উ আমাদের চলবে নাই।'

ওদের আশঙ্কার বহর দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় মুবারি।

'না ঠাকুর, উ কলের লাঙ্গল তো আনবেন আমনাবা, তবে উ জমি আমরা আর কি পাব? উত বাবুবাই লিবে।'

মুবারি ক্রুদ্ধ হয়ে আবার প্রথম থেকে সবটা বোঝাতে শুরু করে, কিন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে এক অনড় অটল অবিশ্বাসের সঙ্গে ওরা জবাব দেয় …'না ঠাকুর, ই কলিকাল বটে, ভালো আমনি কুথা হতে করবেন? ঐ আমরা যেমন আছি তেমনি ভালো। ঐ যে কথায় বলে,—'যেমন কলি, তেমনি চলি', তো সেই আমাদের ভালো—'

রীতি। রীতি! আর হাজার বছরের অচলায়তন অভ্যাসের প্রবল অবিশ্বাস। মুরারি প্রথমে কৌতুহলী পরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। এখানকার লাল মাটির লাল আভাটুকুকে মনে হয়েছিল নিতান্ত মরীচিকা। হাজার নাড়া খেলেও এখানকার মানুষ এক পাও নড়বে না। একটুও বদলাবে না। জলের অভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে, দুনী ছেঁচে ছেঁচে যেটুকু ধান হবে, তা অনায়াসে তুলে দিয়ে আসবে জোত-দারের গোলায়। তারপর হাড়িয়া খেয়ে ভুলে যাবে সব। এই অনড় অচলায়তনের ধাক্কা খেয়ে মুরারির স্বপ্ন-জ্বলা চোখ শুধু রূঢ় আর নিষ্ঠুর

হয়ে উঠত। কেঁদরা মাঝির কুঁড়ে ঘরের মধ্যে বসে বসে সে গুম হয়ে পুরানো খবরের কাগজ পড়ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দাওয়ায় বসে বুড়ি মা সরের-ঝাঁটা পাকাতে পাকাতে আকাশের দিকে তাকাত—। আপন মনে বকত। মেঘকে অনুরোধ করত বৃষ্টি দেবার জন্যে :

'হা-হা, হড়াম হড়াম করছিস ক্যানে? ঢেলে দে। ঢাল্। তবে তো মানুষগুলা বাঁচবে—। ঢাল······জমি কানছে, মাটি কানছে······।'

আঙিনায় কেঁদরার ছোট্ট ব্যাটাটা কোনরকমে দাঁড়াতে শিখেছে মাত্র। কিন্তু ঐ অবস্থাতেই সে একটা কাঠি নিয়ে অস্ফুট শব্দ করত আর তাড়া দিত, শূয়োরের বাচ্চাগুলোকে। শূয়োরের বাচ্চাগুলো এতই ভীতু যে ঐ দেখেই গুট গুট করে সরে যেত ভয়ে। বাহাদুর বেটা, বাঘ মারবে উ বেটা! বাঘ মারবি তুই?' বুড়ি মেঘকে ডাকতে ডাকতেই আদর করত নাতিটাকে।

কিন্তু এর কোনটাই নজরে পড়ত না মুরারির। পুরনো খবরের কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে অন্যমনস্ক মুরারি ঠোঁট কামড়াত আর বিড়বিড় করত :

'এরা একপাও কেউ নড়বে না—এক পাও নড়বে না······ !'

'ফুল।'

সনা এসে দাঁড়িয়েছিল একদিন সামনে। 'চুড়ি কিনলাম দেখ!'

দুই হাতে কাঁচের চুড়ি পরে দেখাতে এসেছে ফুল। 'ও গেইছিল মল্লারপুরে খাটতে। তো লিয়ে এল···' বলে লজ্জিতভাবে হেসেছিল।

মুরারি নিয়মরক্ষার মতো একবার তাকিয়ে দেখে তারপর আবার ডুবে গেছে নিজের চিন্তায়।

সনা কোমরে হাত দিয়ে একটু বিমর্ষ আর অবাক হয়ে তাকিয়েছিল এই অদ্ভুত লোকটার দিকে। মৃদু গলায় একদিন বলেছিল :

'কি ভাবছিস তুই? ক্যান এত ভাবছিস।'

মুরারি হড়বড় করে কি বলেছিল কে জানে। সনা তার আদিম সরল চোখ দুটি তুলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল, 'হেই গো, তুকে দেখে ডর লাগছে ফুল! মানুষের লিগে তুর দরদ নাই······'

কিন্তু এই মানুষেরাও একদিন নড়তে শুরু করলো।

এক পা দু পা করে তারা এগোয় কিন্তু বারবার পেছন ফিরে চায়। অচলায়তন ভেঙে নড়ে ওঠে সামনের দিকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চলে তাদের সমস্ত অভ্যস্থ রীতি আর কুসংস্কার।

কেঁদরা মাঝি মুরারিকে আশ্রয় দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিল। আর কিছু করার যে প্রয়োজন আছে তা ওর মাথায় আসত না। বাইরে খাটতে গিয়ে যেদিন পয়সা পেত সেদিন মদ খেয়ে আসত। অল্প নেশা হলে আসত টলতে টলতে, অন্ধকারে বাঁশী বাজাতে বাজাতে তিতুর তিয়া— তিতুর তিয়া—

মুরারি টেনে আনত কেঁদরাকে, 'কি কমরেড তোমার যে দেখা নাই! এবার তো লড়াই শুরু হয়ে যাচ্ছে!'

কেঁদরা মাথা ঝাঁকাত টলতে টলতে, 'তা হলে লড়াইটো লাগিয়ে দিলি। ইটা ভালো হল!'

বলে আপন মনে বকতে বকতে আবার আপন মনে বাঁশীটা নিয়ে বাজাতে শুরু করত। তিতুর তিয়া—তিতুর—তিয়া—'

মুরারি নাছোড়বান্দা।

'নেশা করলে চলবে না কমরেড। এই এলাকার সমস্ত সাঁওতালদের একান করতে হবে।'

কেঁদরা হঠাৎ বাঁশী থামাত, 'তুই বলছিস কমরেড। তুকে কথা দিয়েছি তো করব। কিন্তু আমি কেনে করব? আমার জমি আছে না কি আছে? তুরা বলছিস ভাগচাষীরা ফসলটো লিবে, কিসানরা ফসলটো লিবে। কিন্তু আমি চাষ করলাম না। জমিটো উয়োরা কেড়ে লিলে তো আমি চাষ ছেড়ে দিলম। তো আমি ক্যানে যাবো তুদের সঙ্গে? কিন্তু তুকে কথা দিয়েছি তো করব।'

লেট আর বাগ্দী ভাগচাষীরা ভয়ে ভয়ে সন্দেহ করতে করতে তবু শেষ-পর্যন্ত সত্যি সত্যি হঠাৎ মেনে নিল মুরারির সমস্ত উপদেশ। পাটকিলে মাটির খেত আর ডাঙা কোন এক যাদুতে যেন বদলিয়ে গেল একেবারে।

সেদিন কথা ছিল দল বেঁধে ধান কেটে তুলতে হবে। প্রথম ধানকাটা শুরু হবে মহীন্দ্র লেটের চাষ করা জমিতে। জোতদারের বাড়িতে ধান না তুলে সে ধান তোলা হবে মহীন্দ্রর ঘরে। গুজব ছড়াল, মারদাঙ্গা হবে, পুলিস আসবে, দত্তরা এক থলি টাকা নিয়ে চলে গেছে সদরে, ফিরবে পুলিস নিয়ে।

একসঙ্গে ধান কাটার কথা ছিল কিন্তু দেখা গেল যাদের আসার কথা তারা কেউ আসেনি। যারা এসেছে তারাও মাঠে নামছে না। এখানে ওখানে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসুক হয়ে, কিন্তু মাঠে নামছে না। ডাকাডাকি করলেও সাড়া দিচ্ছে না। মুরারি শ্লোগান দিল কয়েকবার। কিন্তু একটা ছুটো গলা ছাড়া কেউ সায় দিল না।

ক্রুদ্ধ নিঃসঙ্গ মুরারি গালাগালি দিয়ে হয়রান হয়ে শেষ পর্যন্ত একজনের হাত থেকে কাস্তে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেই গিয়ে দাঁড়াল ধানখেতের মধ্যে। অনভ্যস্ত অপটু হাতে ধান কাটতে শুরু করলে। অনিশ্চিতভাবে তাকে অনুসরণ করল শুধু কেঁদরা।

দত্তরা তখনো ভালো করে তৈরী হতে পারেনি। একজন সরকার আর এক হিন্দুস্থানী দারোয়ানকে পাঠিয়েছিল ব্যাপারটা ধমক দিয়ে ফয়সালা করে দিতে। তারা এসে মুরারিকে ছেড়ে ধমক দিচ্ছিল উৎসাহী দর্শকদের। সে ধমক শুনে কেউ প্রতিবাদ করছিল না। বরং জানাচ্ছিল—'আজ্ঞা হাঁ, ই পরের দ্রব্য, রাজার ন্যায্য পাওনাটো তো দিতে হবে। সেটিতে নিজের ঘরে তুলা ধম্ম হবে না···'

মুরারি ক্ষিপ্তের মতো কাস্তে হাতে ছুটে এসেছিল—'কি? ধমক দিতে এসেছ? ভাগো শিগগির! দত্তকে বলে দিও চাষীরা জান দেবে কিন্তু ধান দেবে না! লাঠি তুললে তোমাদের কারো মাথা আস্ত থাকবে না···'

গ্রাম্য সরকার আর দারোয়ান গ্রাম্য লোকদের শায়েস্তা করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই শিক্ষিত শহুরে ক্ষিপ্তপ্রায় মানুষটির প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের কাছে সত্যিই ভয় পেল! গাঁইগুঁই করতে করতে হাঙ্গামা করার বদলে সত্যি সত্যিই পালাল মুরারির প্রচণ্ড সাহসের সামনে থেকে।

কাস্তে হাতে খেতে নামতে নামতে ভাঙা গলায় মুরারি আবার হাঁক দিল—'চলে এস ভাই! জান দেব, কিন্তু ধান দেবো না···'

মুরারি ভাবতে পারেনি, হঠাৎ দেখা গেল এতক্ষণ যারা উৎসুক হয়ে, ভয়ে ও সন্দেহে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করছিল তারা কলরব করতে করতে নেমে পড়েছে খেতে। এক মুহূর্ত কোথা থেকে জুটল শ খানেক লোক। সব চেয়ে ভীতু ছিল যে মহীন্দ্র, সবচেয়ে বেশি চিৎকার করতে শুরু করেছে সে—'হাঙ্গাম করবে? মার করবে? শালা কত জমি নিয়েছে আমাদের, দিব না ধান। দেখি শালার জোর কত···'

এক মুহূর্তের যাদুতে সারা এলাকার চেহারা বদলিয়ে গেল। এক মুহূর্তে ছড়িয়ে গেল ঠাকুরের নাম—'হাঁ, বাপের বেটা। নাকি বলো? ওই! সরকারটোকে কি রকম জবাব দিয়ে দিলে বাবু। ও ঠাকুর যা বলছে, তা মিথ্যে লয়! বাপের বেটা বটে। ঠিকই বলছে, ই ফসল তো আমাদেরই···'

দূরের হাটেও কথা হত।

'ও শালবুনীতে কে একজনা এসেছে বাপু ঠাকুর! শুনলম বড়া শক্তিমান মানুষ বটে বাপু। জমিদার জোতদার কেউ চাইতে পারে না ওর চোখের দিকে। ধ্বক্-ধ্বক্-ধ্বক্ করে বাপু আগুন! কুনু একটা শক্তি আছে বাপু ও ঠাকুরের, নাকি বলো?' তারপর গলাটা নিচু করে বলত—'উ বলছে কি, যে জমিটো চাষ করে, জমিটো তার। বলছে, ধান দিও না···'

'বলছে ধান দিও না?'

'হ্যাঁ বাপু, উ ঠাকুরটো ই সব কথাই বলছে···'

তারপর চুপি চুপি হাসত সবাই। শান্তভাবে হাসত খানিক স্বপ্নে, খানিক সন্দেহে।

আর সবার বেশি ক্ষেপে উঠল কেঁদরা মাঝি।

'তুকে কথা দিয়েছি কমরেড। লড়াইটো লাগিয়ে দিলি—ইটা ভালো হল—, বলে কেঁদরা দিনমজুরী ছেড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল ক্ষ্যাপার মতো এক সাঁওতাল পাড়া থেকে আর এক সাঁওতাল পাড়ায়।

কেঁদরার বাড়ির আঙিনায় এসে জুটত এ তল্লাটের লোকজনেরা। মহীন্দ্র বাউড়ী, শিবু লেট, শালিখডাঙ্গার এক সদগোপ ছেলে আর অজস্র অচেনা লোক। সবাই যেন পালটিয়ে গেছে আস্তে আস্তে, সবাই মেনে

নিয়েছে মুরারির প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে। মুরারি বোঝাত তাদের ছুনিয়ার সংবাদ। লড়াইয়ের কায়দা। কথা বললে মুরারির চোখ ছুটি সত্যি সত্যিই যেন জ্বলত। কথা যখন বলত তখন সে যেন তার চারিপাশের এই চির-পরিচিত লেট-বায়েন-বাগদী-সাঁওতাল মানুষগুলোর ওপর তাকাত না; যেন সে তাদের দেখতে পেত না। তার ক্ষেপা ক্ষেপা চোখ ছুটো যেন এদের অতিরিক্ত কোনএক স্বপ্নের ওপর ঘুরে বেড়াত। যেন এক একরোখা বৈজ্ঞানিক তাকিয়ে আছে তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আসন্ন ফলের দিকে; পরীক্ষার উপকরণগুলোর প্রতি তার আর একবিন্দু আগ্রহ নাই। সমস্ত আগ্রহ শুধু সেই আশ্চর্য ফলটুকুর জন্যে।

বৈঠক যখন বসত তখন ফুল ছেলেটাকে কোলে করে দাঁড়িয়ে থাকত দূরে। চুপ করে বোঝার চেষ্টা করত ওদের কথাবার্তা। কখনো তা বুঝতে না পেরে খেলা করত নিজের ছেলেটার সঙ্গেই। ধাড়ী শূয়োরের পিঠের ওপর ছেলেটাকে বসিয়ে হাততালি দিত খুশিতে। ছেলেটা যেই উলটিয়ে পড়ার উপক্রম করত অমনি তাকে জাপটে ধরত বুকের মধ্যে। মৃছ গলায় গান গাইত অন্যমনস্কভাবে।

ঐ ঘটনার পর দত্তরা ছেড়ে দেয়নি। পুলিস নিয়ে এসেছে শহর থেকে। দত্তদের ইস্কুল বাড়িতে ঘাঁটি বসেছে পুলিসেব। পুলিস কয়েকবার টহল দিয়েছে, কিন্তু কোন হামলা করেনি এখনো। আন্দোলনটা খানিকটা থমকে আছে, যেন চূড়ান্ত হামলার জন্য উভয় পক্ষই প্রস্তুত হচ্ছে।

মুরারি তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। কেঁদরার বাড়ির চির অভ্যস্ত শূয়োরের আস্তানাটা ছেড়ে একটা পুটলি নিয়ে অন্ধকারে সে নেমে যাচ্ছিল মাঠের মধ্যে।

ছায়ার মতো ছেলেটা কোলে করে এসে দাঁড়াল সনা 'তুই চলে যেছিস ফুল?'

'হোঁ—'

অন্ধকারে কালো আবছায়া শালবনটা থেকে একটা বনজ হাওয়ার ঠাণ্ডা ঝাপটা আসে মাঝে মাঝে। একঘেয়ে বনজ শব্দ উঠতে থাকে অনবরত। অনেক দূরে শুধু একটা নোংরা লালচে আভা দেখা যায় কেরোসিনের ডিবের। বনে যারা কাঠ কাটে, তাদের আস্তানার আলো।

ফুল অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে—'তুর চোখ দুটো কেমন ক্ষ্যাপা পানা হয়ে গেইছে ফুল…'

মুরারি নিঃশব্দে হাসে, 'ভয় করছে ?'

'হাঁ—ডর হচ্ছে ! বড় ডর হচ্ছে…তুই সর্বনাশ করবি আমাদের ! ওকে তুই বন্ধু করেছিস। উ কথা দিয়েছে, জান দিবে তো ধান দিবে না। আমাদের জাত তো কথা ফেরত লেয় না…কিন্তু তু সর্বনাশ করবি উয়ার !'

অভিযোগ. আশঙ্কা আর বেদনায় কেঁপে উঠেছিল এই সরল মেয়েটার কণ্ঠস্বর।

মুরারি বলেছিল—'আমরা যে কমরেড ফুল। আমাদের নিজেদের কি বিপদ হবে, তাতো ভাবলে চলবে না…'

সনা অন্যদিকে তাকিয়েই বলেছিল—'উ রোজগার করে না, বাঁশী বাজায় না, উকে তুই ক্ষেপা-ক্ষেপা করে দিয়েছিস ফুল !'

দুদিন পরেই প্রত্যাশিত হামলাটা হল। একদিন সশস্ত্র পুলিস মার্চ করে গেল শালবুনী গ্রামটার ভেতর দিয়ে। প্রত্যেকটি :ঘরের ভেতর ঢুকে তল্লাস চলল। অকারণে তছনছ করা হল জিনিসপত্র। হঠাৎ হকচকিয়ে গেল সবাই। কথা ছিল সশস্ত্র হামলাকে বাধা দিতে হবে সজোরে। কিন্তু কেমন থমকে গেল সবাই।

নিরুপায় মহেন্দ্র বাউড়ী শেষ পর্যন্ত ফিরে এল মুরারির কাছে—'উ হবে না ঠাকুর ! তার চাইতে শুনো তোমায় বলি—'

বলে মহীন্দ্র বাউড়ী চোখ বড় বড় করে পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে জানাল—'তিন ক্রোশ দূরে এক গুনীণ আছে। খুব নাম। তুকতাক যা জানে অব্যর্থ !'

মুরারী ক্ষিপ্তভাবে জিগ্যেস করেছিল—'কিন্তু তাকে নিয়ে কি হবে ?'

মহীন্দ্র অবাক হয়ে বলল—'ক্যান, পাঁচ টাকা লাগবে। আর উ দারোগাটির নাম লাগবে। উ যদি একবার মন্ত্র জুড়ে বানটি মারে তো দেখতে হবে না—'

'বান মারা' হল এক তান্ত্রিক প্রক্রিয়া। মহীন্দ্রর ধারণা, এত সশস্ত্র পুলিসের সামনে বন্দুকের সামনে বাঁচার একমাত্র উপায় এই প্রক্রিয়াটি। তাহলেই দেখা যাবে সমস্ত পুলিস পরদিন যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে 'জ্বলে গেল। জ্বলে গেল!' চীৎকার করতে করতে মরে শেষ হয়ে যাবে।

দাঁতে দাঁত চেপে অপ্রস্তুত মহীন্দ্রকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল মুরারি। —'তোমাদের দিয়ে হবে না, আমিই যাব…'

কিন্তু মুরারিও পারেনি লোক জোটাতে। পথের মধ্যে আচমকা গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিল শুধু। গ্রেপ্তার করে নিয়ে পুলিসের দলটা তাকে কয়েদ করে রেখেছিল দত্তদের স্কুল ঘরটাতে। খাসি কাটা হয়েছিল দত্তদের বাড়িতে। ঠিক ছিল খাসি খেয়ে বিকেল বেলা রওনা দেবে পুলিস দলটা।

শূন্য স্কুল-ঘরটাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদভ্রান্তের মতো পায়চারি করছিল মুরারি। শেষ মুহূর্তে যেন তার অসম্ভব মূল্যবান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাটা ভেস্তে গেছে। যে উপকরণগুলিকে সে জোগাড় করেছিল, হঠাৎ মনে হল সেগুলি যেন ভেজাল দেয়া।

এমন সময় স্পষ্ট শোনা গেল মাদলের আওয়াজ।

ডুম্ ডুম্ ডুম্। মাদল বাজছে, সাঁওতালী মাদল। শিকারের জন্যে সাঁওতালদের জড়ো করার সময় এ মাদল বাজে।

স্কুল ঘরের জানালার শিক ধরে উৎসাহে পাগলের মতো চীৎকার করতে লাগল মুরারি ঃ

'লাল সেলাম! কমরেড। লাল সেলাম!'

একমুহূর্তের জন্যে দেখা গিয়েছিল সেই অপূর্ব দৃশ্যটা। মাদল বাজাতে বাজাতে সবার আগে আসছে কেঁদরা। তার পেছনে এলো-মেলো এক দঙ্গল কালো কালো লোক। কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে সড়কি, কারো হাতে তীরধনুক।

তাড়াতাড়ি এসে রূঢ়ভাবে জানালাটা বন্ধ করে দিল সেপাইগুলো, বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে গেল। কিছু ঘরের মধ্যে, কিছু বাইরে। নিঃশ্বাস আটকে রইল মুরারি—দূর থেকে দুর্বোধ্য ঝোড়ো আওয়াজটা মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে দ্বিগুণ জোরে কেঁপে উঠছে এক ভয়ঙ্কর হল্লায়—'ছিনিয়ে লুব! উ ঠাকুরটোকে ছিনিয়ে লুব আমরা…'

ছিনিয়ে নিতে তারা পারেনি। কেঁদরা আর মহীন্দ্র শুধু বুকে গুলি নিয়ে জান দিয়ে তাদের শপথ রক্ষা করে যায়। জেলখানার ভেতর থেকে নানা স্থত্রে মুরারি শুনেছিল সমস্ত ঘটনা। শুনেছিল দুঃসাহসী মহীন্দ্র কেমন করে সমস্ত গুলি অগ্রাহ্য করে ছুটে গিয়েছিল জানালাটার কাছে। কেমন করে কেঁদরা এক তীর দিয়ে বিঁধেছিল একটা সেপাইকে। তারপর গুলি খেয়ে পড়ে যাবার সময় বলেছিল—'উ ঠাকুরটোকে বলিস, একটা কথা যখন দিলম, তো সে কথাটা ক্যানে ঘুরাবো? জানটি দিব, কিন্তু ক্যানে ধান দিব…'

মহীন্দ্র হাসপাতালে গিয়ে মরে। মরার সময় নাকি ভুল বকত—'উ গুনীনটোকে পাঁচ টাকা দিলি না ঠাকুর? দিলে ভালো করতিস। উদরকে আর বাঁচতে হত না…'

দীর্ঘ দুবছর জেলে আটক থেকেছে মুরারি। সাথীরা ওকে তার আন্দোলনের গল্প করতে বলেছে। অনেকেই ওকে ভেবেছে বীর। কিন্তু ও নিজেকে তা ভাবতে পারেনি। যত বারই ঐ ঘটনার কথা মনে হয়েছে মুরারির ততবারই ধ্বক করে উঠেছে ওর বুকের মধ্যে। যন্ত্রণায় গলা আটকে গেছে। কেবলি মনে হয়েছে—ওরা মরে গেল। এত সহজে জীবন দিয়ে দিল ওরা!

মুরারিকে ওরা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। তবু এক নিষ্ঠুর অভিযান-কারীর মতো মুরারি নিজের প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে ওদের টেনে নিয়ে গেছে এক অনভ্যস্ত অনিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে। ওদের দিকে তাকায়নি। তাকিয়েছিল শুধু নিজের স্বপ্নটুকুর দিকে—'হিলা দেঙ্গে! হিন্দুস্থানকো হিলা দেঙ্গে!'

মুরারি কাপুরুষ নয়, তবু মুরারিই বেঁচে রইল। কিন্তু কথা রাখবার জন্যে প্রাণ দিল মহীন্দ্র, কেঁদরা……

রাঢ়ের এই দুর্গম অচলায়তনকে দুই হাতে টেনে হিঁচড়ে বদলে দিতে চেয়েছিল মুরারি। জেলখানায় প্রথম সে অনুভব করল, সে নিজে বদলে গেছে। সে কোনদিন ভাবেনি তার চোখ দিয়ে জল বেরুতে পারে। কিন্তু যখনই সে ভেবেছে এই সরলবিশ্বাসী কালো মানুষগুলোর কথা, তখনই

কেন জানি গলা বুঁজে এসেছে একটা যন্ত্রণাকাতর কান্নায়। ধিক্কার জেগেছে নিজের ওপর—ওরা ভেবেছিল মুরারি তাদের নিয়ে যেতে পারবে তাদের স্বপ্নের দিকে, কিন্তু মুরারি পারেনি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ওরা মুরারির ওপর যতটুকু আস্থা রেখে গুলির মুখে এগিয়ে গিয়েছিল, মুরারি তার সমান হয়ে উঠতে পারেনি।

'হিন্দুস্থানকো হিলা দেঙ্গে' এই নির্ঘোষটা মনে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে মুরারির মনে পড়ে আর একটা মৃদু অভিযোগ—'তুই সর্বনাশ করবি ফুল।'

দুই বছর জেলখানায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল মুরারি রাঢ় প্রান্তের এই এলাকাটির খবরের জন্যে। দুই বছর টুকিটাকি যেটুকু খবর এসেছে তা আনন্দের নয়, নির্যাতনের। তা সত্যি না মিথ্যা তাও কেউ হলফ করে বলতে পারত না।

'কেঁদরার বউয়ের কি হয়েছে জানো?'

না কেউ জানে না। কেঁদরার বুড়ি মা-টা মারা গিয়েছিল। কেঁদরার তো জমিজমা ছিল না। পুলিস এসে খুব অত্যাচার করে ওদের বাড়িতে। তারপর কেঁদরার বৌটা কোথায় চলে গেছে কে জানে! কোন ধানকলে খাটতে না কি কোন বনে কাঠ চেরাইয়ের কাজে কামীন হয়ে!

'মহীন্দ্রের ঘরের লোকজন?'

'ওদের ঘরে আগুন দিয়ে দিয়েছে দত্তরা। মহীন্দ্রের বুড়ো বাপটা অন্য গাঁয়ে গিয়ে ভিক্ষে করছে···

সদ্‌গোপদের ছেলেটা?'

'ও গাঁয়ে থাকতে পারেনি। আর কেউ সেই ঘটনার পর ওখানে যায়নি। কোন কমরেড যেতে পারেনি। লোকও কেউ ছিল না··। ঐ সদ্‌গোপের ছেলেটাই ঐ ঘটনার পর আবার লোকজনকে জোটাবার চেষ্টা করে। পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত গ্রামের কেউ আর ভয়ে আশ্রয় দেয়নি। গাঁয়ের মেয়েগুলোই হাঙ্গামা লাগিয়েছিল—ঐ ছোঁড়াগুলো পরের কথায় নেচে আমাদের সব্বনাশ

করে দিলে। আবার এলে ঝাঁটা পেটা করব…'

মুরারি এ খবর শুনে আক্ষেপ করত না। শুধু গুম হয়ে যেত। গলার কাছে কি একটা আটকে যেত। মনে হত, ওরা অন্যায় কিছু করেনি…।

কিন্তু দুবছর পরে হঠাৎ সেদিন ও হাইকোর্টের কি একটি রায়ে ছাড়া পেয়ে গেল, সেদিন ও আতঙ্ক বোধ না করে পারেনি। ছাড়া পাওয়ার পর প্রথম যদি কোথাও যেতে হয় তো যাওয়া উচিত সেই পাটকিলে মাটির এলাকায়। সেই রক্তের দাগগুলোর কাছে।

কিন্তু কেমন করে সে যাবে? কেমন করে গিয়ে দাঁড়াবে সেই সর্বনাশের সামনে?

মুরারি রীতিমত ভীত হয়ে উঠেছিল। দুই বছর নির্মম অত্যাচারে অত্যাচারিত রাঢ়ের এই জংলা গ্রামটা যেন তীব্র অভিযোগ নিয়ে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টি কেমন করে সে সইবে!

সমস্ত রাস্তাটা সে ক্ষিপ্তের মতো মাঝে মাঝে আপনমনে বিড় বিড় করছে। তারপর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কোন রকমে পৌঁছিয়েছে শালবনটার ধারে, কিন্তু আর এগুবার ভরসা পায়নি। গাঁয়ের মধ্যে ঢুকতে পারেনি।

গাঁয়ের মধ্যে ঢোকার যতটুকু ইচ্ছে ছিল, তা ভেঙে গেল ঐ ন্যাংটা রাখাল ছেলেটার কথায়—'সেই লুচকিয়ে পলাইলেন, তার পর হতে তো কেউ আর এলেন না —'

মুরারি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল। শালবন-টার পাশ দিয়ে দূরে পাহাড়গুলোর ওপাশে সূর্যটি অসম্ভব লাল হয়ে ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। ওদিককার আকাশটা জুড়ে দগদগে লাল আভাটা ক্রমে ক্রমে নিভে আসছে। সূর্য ডোবা টের পেয়ে শালবনটার প্রত্যেকটা গাছে গাছে পাখিগুলো শেষবারের মতো যে তুমুল কাকলি শুরু করেছিল, তাও থেমে এসেছে। একটা অদ্ভুত শুকনো বনজ গন্ধের সঙ্গে মিশে সন্ধেটা ছড়িয়ে পড়েছে মাঠ, ডাঙা আর শালবনটায়।

মুরারি উঠে দাঁড়াল। না, গাঁয়ে সে ঢুকতে পারবে না। ফিরে যাবে। সমস্ত দৃশ্যপটটা সে একবার চোখ ভরে দেখে নিল। তারপর আস্তে

আস্তে এগিয়ে চলল কেঁদরার ডাঙাটার দিকে। ফিরে যাবে। শুধু যাবার আগে একবার দেখে যাবে কেঁদরার জনশূন্য ভিটেটা।

অন্ধকারে এক পা দু পা করে এগিয়ে গেল মুরারি। কেঁদরার মা যেসব গাছগুলোর পরিচর্যা করত, সেগুলো এলোমেলো বেড়ে উঠে এককালের তকতকে নিকনো ভিটেটাকে জংলা করে তুলেছে। কুঁড়ে দুটোর দেওয়ালগুলো এখনো ঠিকই আছে। শুধু ওপরের চালাটা নেই। দেয়ালের ওপরগুলো কালো হয়ে আছে এখনো। চাল পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের ওপরটাও পুড়ে কালো হয়ে আছে।

আমগাছটা আছে এখনো। ঐ গাছটার তলায় বসে কেঁদরা বাঁশী বাজাত। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে মুবারি ঢুকলো ভাঙা ঘরটার ভেতরেই। শূয়োর থাকার জন্য ছোট্ট প্রাচীর তুলে ঘরের মধ্যে যে ছোট ঘরটুকুতে ও খড় বিছিয়ে ডেরা বানিয়েছিল, সেটা আছে। শুধু খড়গুলো নেই। তার বদলে রোদ আর জল পেয়ে মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে ঘাস, ঝোপ-ঝাড় আর শেয়ালকাঁটা।

ভিটেটা পার হয়ে লোকাল বোর্ডের রাস্তাটা ধরে মুরারি ফিরে যাচ্ছিল। এমন সময় দূর হতে কে ডাকল—'ফুল!'

মুরারি চমকে উঠল। অস্ফুটভাবে বলল—'কে, কে?'

'হাঁ, দাঁড়াও গো খানিক।'

দূবে আবছায়ার মতো মূর্তিটা দ্রুত কাছে সবে এল। সনা হাঁপাচ্ছিল। বেশ বোঝা যায় অনেক দূর থেকে দ্রুতগতিতে সে হেঁটে এসেছে। মুরারির সামনে দাঁড়িয়ে সনা স্থিরভাবে মুবারির দিকে তাকাল—'কুথা চলে যেছিস্ ফুল?'

মুরারি উত্তর দিল না।

'তুই পালাই যেছিস্? একটো ছোঁড়ার কাছে শুনে ছুটতে ছুটতে এলম……'

মুরারি যন্ত্রণায় অন্যদিকে তাকাল। 'ফুল, আমি সব শুনেছি ….' তারপর হঠাৎ রূঢ়ভাবে অকারণে বিশদভাবে বোঝাতে শুরু করল তার ভুল হয়েছিল। লড়াইয়ের কায়দায় ভুল হয়েছিল …..

বলতে বলতে মুরারি থেমে গেল এক সময়।

সনা শুনছে না। হঠাৎ যেন কি একটা আশা ভেঙে গেছে তার। তীব্র দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন যাচাই করে নিচ্ছে মুরারিকে। 'হেই ফুল। তুর কথা বুঝতে পারছি। তুকে চিনতে লারছি। লুকে তুর লেগে কত বলেছে। হুই দেখ উরা এসে গেল। কিন্তু তুকে চিনতে লারছি ফুল……'

শুধু ফুল নয়। আরো অনেক এসে দাঁড়িয়েছে ওর চারপাশে। গাঁয়ের বুড়ো বুড়ি মেয়ে বাচ্চা অনেক—আরো অনেকে আসছে। মুরারি নির্বোধের মতো তার চারিপাশে চাইল। তার চারিপাশে কি হচ্ছে সে যেন আর কিছুই বুঝতে পারছে না।

কাঁদছে অনেকে, মুরারির গায়ে হাত দিয়ে পরখ করে দেখছে সবাই, হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখছে—'ঠাকুর ভালো আছো? ভগবান তুমার ভালো করুক ঠাকুর, বেঁচে থাকো। কবে ছাড়া পেলে গো?… হায়, হায়, আমাদের কথা আর শুধায়ো না। তুমরা কেউ তো ছিলে না ঠাকুর……এই দেখো হাল দেখো আমাদের। ধান নাই গো দেশে… আর এই কাপড় পরে আমরা মেয়েরা চলতে পারি?'

মুরাবি বিব্রতভাবে এলোমেলো কি কয়েকটা কথা বলল। তারপর চুপ করে গেল।

'অত্যাচারের কথা আর বলব না ঠাকুর। তুমিও এসেছো, এর একটা বিহিত করো, এবার লয়ত ছাড়ব না—' বুড়ো, বুড়ি, মেয়েরা একান্ত আশায় তাকিয়ে আছে মুরারির দিকে। অভিযোগ নয়, তারা তার কাছে দাবি জানাতে এসেছে। এক মুহূর্তে মুরারির চোখ থেকে সমস্ত আতঙ্কটা কেটে গেল। সমস্ত আত্মবিশ্বাস তার যেন ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে সেই নির্ঘোষটা—'হিলা দেঙ্গে' আগের চেয়ে আরো ঝঙ্কৃত, আরো দুর্জয় হয়ে।

'আবার আন্দোলন করতে হবে, বুঝেছ। আবার জমায়েত করতে হবে সবাইকে—'

পুরুষেরা দাঁড়িয়েছিল মেয়েগুলোর পেছনে। শান্তভাবে তারা সায়

দিল, 'আজ্ঞা তা বটে! আমাদের ছুটো লোক গেছে কিন্তুক আবার তো লাগতে হবে…'

'হাঁ লাগতে হবে'—

আস্তে সবাই আবার ফিরে গেল। গাঁয়ে এখনও পুলিশ ক্যাম্প আছে। 'ঠাকুর ফিরে এসেছে' এ খবরটা যেন হাওয়ায় ছড়িয়ে গিয়েছিল। পুলিশ ক্যাম্প এড়িয়ে নিঃশব্দে ওরা এসে জুটেছিল ঠাকুরের পাশে। আবার নিঃশব্দে চলে গেল। বলে গেল—'তুমাকে আর ছাড়ছি না ঠাকুর! মনে রেখো—'

শুধু সনা তখনো দাঁড়িয়েছিল। সে এ গাঁয়ে থাকে না। মল্লারপুরের ধানকলে কাজ করে। ধানকলে কাজ নেই বলে এসেছিল এই বনে কাঠ কাটতে। ফিরে যাবে পশ্চিম দিকের একটা সাঁওতাল গ্রামে। সব চলে গেলে মৃদুস্বরে সে বললে—'উ বলেছিল আমাদের জাত কথা ফেরত লেয় না। জানিস্ ফুল……'

বলে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

'কাঁদিস না ফুল—' ব্যথিতভাবে সান্ত্বনা দিল মুরারি। তারপর কি ভেবে বললে, 'জানিস ফুল, আমার কি ভুল হয়েছিল? আমি মানুষকে দেখি নাই। তুদেরকে তেমন দেখি নাই। তুই-ই সেকথাটা আমায় বলেছিলি একদিন—'

সনা শান্ত হয়ে শুনলে ওর কথাগুলো। তারপর শান্তভাবে আঁচল চাপা দিয়ে আবার কাঁদতে শুরু করলে—

'না কানব। খানিক কেঁদে লিই।… …কেনে ভুল করলি ফুল? আর ভুল করিস না…'

শপথ

স্থধীর করণ



সুধীর করণ গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। তিনি লোক সংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্বের গবেষক হিসাবে এখন বিশেষ পরিচিত। কিন্তু এককালে রাঢ়ভূমি নিয়ে অনেক গল্প এবং সমস্যাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং পরিচয় পত্রিকায় একসময় তিনি নিয়মিত লিখতেন। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম তাঁর লেখার মূখ্য বিষয়। আর এই মানুষদের তিনি চিত্রিতও করেছেন অত্যন্ত দরদের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন গল্প এবং রচনায়।

ছোট শালবনের পেছনে ঝিমিয়ে পড়লো দিবসের শেষ সূর্য। ধীরে ধীরে একটা কালো মৃত্যুর যবনিকা নেমে এলো লাল মাটির বুকে। অন্ধকারের বুকে কিলবিল করে নড়ে উঠলো কতকগুলো সাপ। পৃথিবীর কালো বাজার তার হিংস্র কুটিল ফণা তুলে দাঁড়ালো অতি সঙ্গোপনে।

অগুন্‌তি লোক গুটি গুটি করে এগিয়ে চলেছে শালবনের কোলঘেঁষা সরু পায়ে চলা পথে।

লখাই মাঝি ফিস্‌ফিস্ করে শিবু মাহাতোকে জিজ্ঞেস করেঃ আর কতটা ধূর যাতে হবে হে?

ঃ আর ধূর ক্যথা! পুয়াটাক রাস্তা লয়; উ-ই যে বাঁধটা দেখা যাচ্ছে— ; শিবু মাহাতো ফিস্‌ফিস্ করে জবাব দেয়।

ঃ শেলই আছে তুমার ট্যাঁকে? লখাই এগিয়ে যেতে যেতেই প্রশ্ন করে আবার।

ঃ আছে হে আছে। চ' না আর একটু। সীমার পাথরটা পেরিয়ে —তবে চুটা ধরাব। দেশলাইটা ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য শিবু মাহাতো একবার হাত বুলিয়ে নেয় ট্যাঁকের ওপর।

গামছা-পরা, কপ্‌নি-পরা, কালো মানুষগুলিকে প্রেতের মতোই মনে হচ্ছে। আঁধারের বুক ফুঁড়ে প্রেতায়িত মানুষের শোভাযাত্রা। মাত্র দু-আড়াই মণ ধানের ভারও যেন বইতে চাইছে না তাদের কাঁধ। কাঁধের শক্ত মাংসপেশীগুলো যেন তুলোর মতো নরম হয়ে গেছে হঠাৎ। কেউ কেউ হাঁপাতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। ভাদ্রের গুমোট গরমে টস্‌টস্ করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে তাদের। কালোঘাম। এক মাইলের চেয়ে কিছুটা দূর হবে। রোদে পুড়ে কঠিন মাটি-কাটা যাদের অভ্যাস, তাদের ঐ ন্যাকামি দেখলে কার না রাগ হয়। শিবু মাহাতো চাপা গর্জন করেঃ পাগুলো কি চলছে না তোদের।

মরিয়া হয়ে কালো কঙ্কালসার মানুষগুলি দ্বিগুণ জোরে পা

চালাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। অর্ধনগ্ন সাঁওতালের দল একমুঠো অন্ন সংগ্রহের জন্য মিলিয়ে যাচ্ছে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে। কর্কশ পায়ের চাপে খস্‌খস্‌ করে একটা শব্দ হচ্ছে মাত্র। সমান তালে পা ফেলার মধ্যে যেন আগামী দিনের আকাঙ্ক্ষা। রূঢ় অন্ধকারের পারে—হয়তো উজ্জ্বল সূর্যের সম্ভাবনা। এক তালে চলার স্বীকৃতি।

আর বেশী দূর নয়। কয়েক পা এগিয়ে বাঁধ। আর বাঁধের ধারেই পাঁচ-ছটা ট্রাক চোখ বন্ধ করে ঝিমুচ্ছে। শেঠ মনোহর চাঁদ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালাব ট্রাক!

বাঁধের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে হরিশ সাউ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ছে: ই দিকে লি আয় সব।···আরে, উখানে বসে পড়ছু যে তোরা! এ্যাই লখাই; তোর জ্ঞানগম্যি কি নাই কিছু? সীমাটা পার কর আগে। ওজনের কাজটা শেষ করে, তারপব চুটা ধরাবি। শালারা বিড়ি না টানলে যেন বাঁচবেক নি। গজ্‌গজ্‌ কবতে থাকে হরিশ সাউ।

বাঁধের ওপাশে ওজনের কাঁটা টাঙানো রয়েছে। পেট্রোম্যাক্‌স্‌ জ্বলছে একটা, রাঢ়ভূমির বন্ধুর প্রান্তরের মধ্যে একটু ঢালুমতো জায়গায় কাঠের একটা চৌকিতে বসে আছে রাঘব সামন্ত,—শেঠ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার কর্মচারী।

আসবার সময় সীমান্তের পুলিশ ক্যাম্পে ঢুঁ মেরে এসেছে হরিশ সাউ। পনেরো টাকায় চুক্তি। কোন সবুট পদধ্বনি এ দিকটায় শোনা যাবে না। হরিশ সাউ এদেশের ধান ও-দেশে নির্বিঘ্নে পার করে দিয়ে, কয়েক ঘণ্টায় কমপক্ষে দেড়শো টাকা রোজগার করে—ফিরে আসবে। বাঙলার ধান শেঠ ঝুনঝুনওয়ালার মিলে চলে যাবে বিহারে।

শিবা ক্যুথায় শিবা: হাঁক দেয় হরিশ সাউ। উয়াদের এদিকে লি আয়। শিবু মাহাতোর ভালো লাগে না হরিশ সাউকে। লোকটা ভালো ব্যবহার করতে জানে না। না হয় পেটের দায়ে চোরাবাজারীদের চাকরি করেছে সে, কিন্তু একেবারে তো আর হীন হয়ে যায়নি।

শিবু মাহাতোর কাজ হলো সাঁওতাল-কুলি জোগাড় করা। ঠিক সময়ে তাদের ডেকে আনা, তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া। বাধ্য হয়ে একাজ তাকে নিতে হয়েছে। না হলে এ জ্ঞানটুকু তার আছে, যে দেশের

ধানচাল বিদেশে গেলে দেশেরই ক্ষতি। দেশের লোকেই না খেতে পেয়ে মরে। হু হু করে বেড়ে যায় ধান-চালের দাম। কিন্তু বাঁচতে হবে তো! দৈনিক হু'এক টাকা না পেলে তার সংসারটাই বা চলে কি করে!

বাঙলা-বিহারের সীমান্ত

প্রাকৃতিক কোন সীমারেখা নেই। গড় মিল নেই কিছু, এপারের আর ওপারের মানুষের, তাদের ভাষার। সিংভূমের ধলভূম আর মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা, প্রত্যন্ত রাঢ়ের বনভূমি।

ট্রাকের ওপর বস্তা বোঝাই হতে থাকে। করকরে নোটগুলো গুনে নেয় হরিশ সাউ।

ঃ এত কম-কম ধান আনছো কেন সাউর পো? রাঘব সামন্ত জানতে চায়।

ঃ শালারা বইতে পারছে নি যে! না হলে তুমাদের শেঠজীর গোলায় জায়গা থাকতো নি আর।

ঃ একটু অভিমানের ছোঁয়াচ লাগায় গলার স্বরেঃ তা'—তুমরা দামটা আর একটু চড়াও সামন্ত। জান কত লোকসান দিয়ে ধান দিতে হচ্ছে। একটা বিড়ি ধরায় বলতে বলতে।

ঃ তুমার যে বড় খাঁই হে। বলি কম দর দিচ্ছি নাকি! নরেশ ঘোষের গোলায় এর চেয়ে অনেক কম দেয় জানো। শেঠজী আমাদের সে-রকম গলাকাটা লোক নয়, হুঁ হুঁ। ষোল টাকা মন দিচ্ছি। এতে কি বাঁচে আমাদের? ট্রাক ভাড়া আছে, কুলি ভাড়া আছে, চাকর বাকরদের মাইনে আছে আর—। কথা শেষ না করেই, সামন্তও বিড়ি ধরায় একটা।

হাতের ঝাকুনি দিয়ে নিবিয়ে দেয় জ্বলন্ত কাঠিটা। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পুনরাবৃত্তি করে আবার—জানলে সাউর পো, নানান্ ঝামেলা। ব্যবসা করা কি সুখের কথা। এই রাত জেগে অন্ধকারের মধ্যে মশার কামড় সহ্য করা কেমন সুখের কথা বল দিকি? তাছাড়া—গলার স্বর একটু নামিয়ে আনে রাঘব সামন্ত। বলেঃ তুমার সাঁওতাল বেটাদের রেট তো দশটি আনা। বেড়ে বাগিয়েছো শালাদের। মন করা কম পক্ষে

তো পুরা দেড়টি টাকা লাভ থাকে তোমার। কেমন, খারাপ বলছি কিছু। বাঁ চোখের বাঁ কোণটা কুঁচকে মুচকি হাসবার চেষ্টা করে রাঘব সামন্ত। তাছাড়া, বাবা হাটে হাঁড়ি ভাঙতে পারি আমি। মন করা চারটি গণ্ডা পয়সা তো তোমার ট্যাঁকেই যায়। তোমার মালিক গোকুল মহাপাত্রর পকেটে তো যায় না। এ্যাঁ কি বল? হো হো করে হেসে ওঠে রাঘব সামন্ত। দু পাটি দাঁতের মাঝখানে তার হাঁ টা রাঘব বোয়ালের মতো মনে হয়।

ঃ কি যে বল সামন্ত, আমার আবার লাভ। মাইরি বলছি, কোন্ শালা মিছা কথা বলে।

ট্রাকগুলো গুমরে ওঠে একবার। তারপব এক এক জোড়া কুটিল উজ্জ্বল চোখ নিয়ে ঝুনঝুনওয়ালার মিলের দিকে ছুটে যায়। গোটারাত ধরে চলবে এই আনাগোনা।

গোটা রাত ধরে সীমান্তের পুলিশ ক্যাম্প অপেক্ষা কবে থাকবে— অনেক হরিশ সাউর জন্য। কোন সবুট পদধ্বনি এগিয়ে আসবে না এদিকে।

ঃ এখন তবে উঠি হে সামন্ত, হরিশ সাউ আড়মোড়া ভাঙে। পাক্কা তিনটি মাইল হাঁটতে হবে।

লখাই মাঝি এগিয়ে আসে। পেট্রোম্যাক্সের আলো তার কুচকুচে কালো শরীবের ওপর ঠিকরে পড়ে যেন। কোমবে একটা ছেঁড়া গামছা জড়ানো। বাহুর মাংসপেশীগুলো শিথিল হয়ে আসছে ক্রমশ। চওড়া, চোয়াল-উঁচু মুখের ওপর। কেমন যেন একটা বিষাদের ছাপ। অন্ধকার আকাশের সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে তার। সারা দেহে নিরন্নতার আঁচড়।

ঃ আমাদের দামটা চুকাই দে হে। আমরা সোজা বাটে চলি যাবো। ছুই পাশ দি'।

শিবু মাহাতোও এগিয়ে আসে, ঃ আমার পাওনাটাও দিয়ে দ্যান সাউ মশয়। আজ আর আপনার উখানে যাবনি।

হরিশ সাউ খেঁকিয়ে উঠে : তর আর সয়না যে তুদের। বলি, পয়সাটা কি আমি দিব না তুদের ? পেলে তো তাড়ি গিলবি, হাড়িয়া খাবি। নাঃ, শালা তুদের আর ভালো করতে পারা গেলনি। তার চেয়ে চাল দিব চল্। পয়সা কি করবি ? চাল নিয়ে ভাত রান্না করে খাবি যা। গায়ে-গতরে বল হবে। কদিনে তো আউসে পড়েছিস একেবারে।—এ্যাঁ, কি বল সামন্ত ?

রাঘব সামন্ত ফিরেও তাকায় না ওদিকে।

: না বাবু, তুই পইসা দে আমাদের। তোর ঘরে গেলে দিন দিন ঘুরাতে থাকু। আজ আমরা মানবোনি। পইসা লিব।

: তা'হলে চাল লিবি না তোরা ? খাবি কি ? হরিশ সাউ বলে।

: উ আমরা দেখি লিব। সবাই আমরা পইসা লিব।

শিবু মাহাতোর দিকে ফিরে হরিশ সাউ গলার মধ্যে কোমলতা আনবার চেষ্টা করে।

: তোদের ভালোর জন্যই বলিরে শিবু। তা তোরা যখন পয়সাই লিবি তাই দোব। তা অত তাড়াহুড়া করলে কি চলে ? আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি ? তবে ইখানে তো খুচরা পয়সা নাই, বাড়িতেই চল।

মজুরদের চালই দিত হরিশ সাউ। চালটা অখাদ্য। সরু মোটা, ভাঙ্গা, আভাঙ্গা, গুমো চাল। একটু সস্তা দামেই দিতো। ভাদ্রে টানের সময় এটা। কারুর ঘরে এক ছটাক ধানও নেই। সাঁওতালদের তো কথাই নেই। এ সময়টায় বড় অভাব। মকাই সেদ্ধ আর কদো ঘাসের বীজ খেয়ে কাটিয়ে দেয় সাঁওতাল-মাহাতোরা। বেঁচে থাকবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় হাঁপিয়ে ওঠে ওরা। ওদের চোখের ওপর দিয়ে হাজার হাজার মণ ধান চলে যাচ্ছে। কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে, কিছুই জানে না ওরা। মাঝে মাঝে ওদের চোখগুলো ট্রাকের চোখের মতো জ্বলে ওঠে। ইস এত ধান !

হরিশ সাউর মনিব গোকুল মহাপাত্র কমপক্ষে আটশো বিঘে জমির মালিক। অরণ্য অঞ্চলে কুলি-মজুরের অভাব হয় না তাঁর, খেতে সোনালী ফসল ফলাতে। হরিশ সাউ তাঁর ডান হাত।

গোকুল মহাপাত্রর একটা ঘরের কোণে স্তূপীকৃত হয়ে আছে চাল।

ডুলং নদীর সাদা কুচো কুচো পাথর হাত দিয়ে বোঝা যাবে না ওখানে, দাঁত দিয়ে বোঝা যাবে। ঐ চাল, আকালের সময় একটু সস্তা দরে বিক্রি করা হয় সাঁওতাল মাহাতোদের মধ্যে। পরিবর্তে দয়ালু গোকুল মহাপাত্র পয়সা নেন্ না, শ্রম নেন। গায়ে গতরে খেটে দিয়ে যায় সবাই।

অনেক দিন থেকে শিবু মাহাতোর মনে কালো মেঘ জমছিল। একদিন না একদিন ঝড় উঠবেই।

ঃ বিড়ি খা সব, আয়—। হরিশ সাউ ডাক দেয়।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে সবাই। এ বাবা, শাল পাতার বিড়ি লয়, দস্তুর মতো খাকি সিরগেট। হরিশ সাউ আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

ঃ আঁ মরণ, ঘাড়ের ওপর পড়ছু যে তোরা। ফস করে একটা কাঠি জ্বেলে নিজের বিড়িটা ধরিয়ে নেয় সে। তারপর দু বাণ্ডিল বিড়ি শিবু মাহাতোর হাতে তুলে দেয়—দাও হে শিবু, ভাগ করে দাও উয়াদের। তুমি রাখবে বেশী করে নিজের জন্যে। দয়া প্রকাশের সুযোগ পেয়ে হরিশ সাউর বুকটা এক ইঞ্চি ফুলে ওঠে যেন।

পরস্পরের বিড়ির আগুন থেকে যে যার বিড়ি ধরিয়ে নেয় ওরা। অন্ধকার রাতের বুকে দপ্‌দপ্ করে জ্বলে উঠছে কতকগুলো মুখ।

পাড়ায় পৌঁছাতে রাত হলো ঢের।

সবাইকার মনের মধ্যে ভাদ্র মাসের গুমোট-ভরা। কি যেন একটা উদ্বেগ, একটা প্রকাশহীন চিন্তা। কি যেন করতে চায় ওরা। জানে না, কি করতে চায়।

লখাই মাঝির ছেলেটা ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে। অত রাতেও চেঁচাচ্ছে ঃ ভাত খাবো, পান্তা ভাত দে না ছুটি।

লখাই-এর বুকের ভেতরটা টন্‌টন্ করে ওঠে হঠাৎ। হাঁড়িটা যে পুরোপুরি শুকনো, তা সে ভালো করেই জানে। সন্ধ্যের সময় খালি পেটেই বেরুতে হয়েছে তাকে।

আজ চালও পাওয়া যায়নি। পয়সাও পাওয়া যায়নি। কাল

সকালে সবাইকে ছুটতে হবে হরিশ সাউর কাছে।

ছেলেটার গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। লখাইকে দেখে আরো জোরে চেঁচিয়ে ওঠে সে।

একটা ধমক দিয়ে ওঠে লখাই। বলে : জল খাবি ?

: দেঁ

ভয়ে ভয়ে জল খেয়ে ছেলেটা মড়ার মতো পড়ে থাকে। খেজুর পাতার চাটাইটা টেনে নিয়ে অবসন্ন লখাইও শুয়ে পড়ে।

সকাল না হতেই মুরগীর পাল বেরিয়ে পরে সাঁওতালদের কুঁড়ে ঘর থেকে। শুয়োরগুলো ঘোঁৎ ঘোঁৎ ডাক ছাড়ে। উলঙ্গ ছেলেমেয়েগুলো মহুয়া গাছের তলায় এসে ভিড় জমায়।

: যাবি নাকি হে ? শিবু মাহাতো সাঁওতাল পল্লীর ভেতর দিয়ে হেঁটে আসে। চল্।

: না গেলে চলবে ? পেট তো ঘন্‌ঘন্ করছে। লখাই জবাব দেয়। অন্ধকারে শ্রমিকেরা মহুয়া গাছের তলায় এসে জড়ো হয়। একসঙ্গে যাবে সবাই।

ছিরু মুর্মু'র বয়সটা বেশী নয় কিন্তু পাকা পাকা কথা বলে।

সেই বলল : শিবু কাকা এমন করি কদিন বাঁচব গো।

: খাতে পাচ্ছি নাই যে—কে একজন বলে ওঠে '

: পাবি কুথার থেকে ? সব ধান চাল তো শালা মাড়োয়ারী লিয়ে যাচ্ছে। দামটাও বাড়ছে হু হু করি। আমরা শালা মরব ইবার। উপায় নাই আর।

লখাই মাঝি, একটা শাল পাতার বিড়ি তৈরি করে শিবু মাহাতোর হাতে তুলে দেয়। নিজেও ধরায় একটা। উগ্র ধোঁয়ায় গমগম করে গাছতলাটা।

যদ্দিন ই ব্যবসা ছিল নাই, তদ্দিন ধানের দামটাও কম ছিল, কি বলো শিবু কাকা ? লখাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শিবুর দিকে তাকায়। কি যেন ভাবছে শিবু। অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর মনে হয় তাকে।

ছিরু মুর্মু ফস করে বলে ওঠে : আর ধান চাল পেরাতে নাই দিব আমরা। আমরা আর নাই যাব ভার বইতে। কি করি ধান জি

যাবে ইখান থাকতে। টেরাকের রাস্তা তো আর ইখানে নাই। শালা গেরামে চাল কিনতে গিয়ে কুথাও পায়নি হাড়াম বুড়া। পেট চাপড়ে কাঁদছে। সব ধান চাল যদি এমন করি চলি যাবে, তাহলে—

: হঁ হঁ ঠিক কথা। আকস্মিক সমর্থনে সারা জায়গাটা কাঁপতে থাকে যেন। ঠিক কথা। ছিরুই সবাইকার মনের কথা বলেছে। বোধ হয় এই কথা বলবার জন্য সবাই উশখুশ করছিল কদিন ধরে। কেউ বলতে পারেনি সাহস করে।—ধান চাল নাই পেরাতে দিব আমরা। সকলে মনে মনে ঐ গুমরে-ওঠা কথাটা হঠাৎ জোর আওয়াজে ফেটে পড়ে: নাই দিব, নাই দিব—

: চুপ কর ছিরা। শিবু মাহাতো বলে। ইটা যদি তোদের মনের কথা হয়, তাহলে গোলমাল করিস না। আগে পইসা কড়ি লিয়ে আসি চল, তারপর যাহোক করা যাবে।

দলটা এগিয়ে যায়। যেতে যেতেই কে একজন বিজ্ঞের মতো বলে: ভার বহিতে নাই গেলে, মরি যাব হে। খাব কি?

চেঁচিয়ে ওঠে ছিরু: নাই থাকব ইখানে। মাটি কাটতে চলি যাব উ-ই মেদ্‌নীপুরের দিকে। তবু উয়াদের লাভের গুড়টা খসাতে হবেক। শালা দেশশুদ্ধা লোক মরি যাচ্ছে। উয়ারা টাকা জমাচ্ছে।

: খাঁটি কথা বলেছিস তুই। শিবু বলে। কিন্তু পারবি তোরা, ই কাজ করতে?

লখাই মাঝি অনেকক্ষণ পরে কথা বলে: যদি মারে? উয়াদের বন্দুক আছে? যদি গুলি মারে? পুলিশের সাথে তো উয়াদের পিরিত আছে। উয়ারাও যদি বন্দুক লি আসে।

নির্লিপ্তভাবে ছিরু জবাব দেয়: কাঁড় নাই নাকি আমাদের? না খাঁয়ে মরার চাইতে, এমুন করি মরা-ও ভালো।

: হঁ হঁ মরবোতো মরবো। একটা গরম বাতাস ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। লখাই অনুভব করে, তার পেটের ভেতর থেকে কি একটা যেন বুকের মধ্যে ঠেলে উঠে পড়েছে। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করে পেটের বাঁ দিকটায়। কাল গোটা রাত উপোস দিতে হয়েছে তাকে। তার রোগা ছেলেটাকেও।

: চল, ইবার সব। চাল লিয়ে আসি। শিবু মাহাতো বলে।

দলটা এগিয়ে চলে হরিশ সাউর কাছে।

গোকুল মহাপাত্রর বাড়িতে হরিশ সাউ বসেছিল দাওয়ার ওপর। আর দাঁতন কাঠি চিবোচ্ছিল।

দলটাকে দেখে, দু একবার ওয়াক্ ওয়াক্ করে মুখটা ধুয়ে নিল। বলল : এসে গেছু তোরা? দাঁড়া, কাজটা সেরে নিই। তা পয়সা লিবি না, চাল? মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতেই বলে। পয়সা যদি চাস তো দেরী করতে হবে একটু। খুচরা পয়সার জোগাড় করতে হবে।

: চালই দেন সাউ মশয়। পয়সা কি করব লিয়ে। লখাই জবাব দেয়।

অদ্ভুত ভাবে নাকটাকে সঙ্কুচিত করে একটা পৈশাচিক হাসি চেপে রাখে হরিশ সাউ।

: উয়ারা দুদিনের আগ্‌তরা চাল চায় যে গো, শিবু মাহাতো সহজ ভাবে সাঁওতালদের হয়ে ওকালতী করে।

: এ্যাঁ। হরিশ সাউ যেন চমকে ওঠে। অগ্রিম দিতে হবে? একটু চিন্তাগ্রস্থ হয় সে। তারপর কি ভেবে বলে ওঠে : বেশ, তাই দোব। সবাই চাল পেলো।

: ঠিক সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাবি সব। আবার যেন হাঁক ডাক করতে না হয়। না হয়, কে কোথায় হাড়িয়া খেয়ে পড়ে থাকবি। হরিশ সাউ সাবধান করে দেয় ওদের।

: আর হাঁড়িয়া! খাতেই পাচ্চি না, তার আবার হাঁড়িয়া। চাল না হলে আর হাঁড়িয়া হবেক নি। লখাই জবাব দেয়।

আবার সন্ধ্যা এলো আবার কালোবাজারী আর চোরাকারবারী-দের সর্পিল চোখগুলো জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠলো।

সন্ধ্যা হতে না হতেই হরিশ সাউ সাঁওতাল পাড়ায় হাজির। পাড়া একেবারে পুরুষ শূন্য।

: গেল কুথা সব ?—একটা মেয়েকেই প্রশ্ন করে হরিশ সাউ।

: নাই জানি। জবার দেয় মেয়েটা। তারপর কুঁড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

: ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়তে চায় হরিশ সাউ। শালা, যত সব শূয়োরের বাচ্চা। দেখাচ্ছি মজা। হনহন করে হরিশ সাউ মাহাতো পাড়ার দিকে পা বাড়ায়।

বুড়ো নিমু মাহাতো, দাওয়ায় বসে শনের দড়ি কাটছিল, ঢেরা ঘুরিয়ে। হরিশ সাউ-কে দেখে বলল : কে গো ? বাবু মশায় ?

হরিশ বলে : গেল কুথা সব ? শিবে কোথা ?

: কি জানি বাবু উই দিকে ত গেল সবাই—উই বনটার দিকে।

নিরুপায় হয়ে বাড়ির দিকেই পা বাড়ায় সে। মনে মনে গজরাতে থাকে : ডোবাবে নাকি শালারা। এক দিনের ফাঁক মানে তিন চারশো টাকা লোকসান। শালাদের অগ্রিম দাম দিয়েছি কিনা তাই।

ফিরতি পথে সাঁওতাল পাড়ায় ঢুকে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় একটু। সুস্পষ্ট যৌবনা একটি সাঁওতাল তরুণীকে দেখে তার জিভ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে যেন। ছিরু মুর্মুর বৌ।

: ছিরু কুথায়, জানিস ?

মেয়েটি মুচকি হেসে জবাব দেয় : নাই জানি। হুই দিকে গিছে সব। সন্ধ্যের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে আস্তে আস্তে। কয়েকজন লোকের গলার স্বর শুনতে পায় হরিশ সাউ। আসছে বোধ হয় শালারা।

ছিরু বাঁশি বাজাচ্ছে। হৈ হৈ করতে করতে আসছে সবাই। দলটা পাড়ায় পৌঁছুতেই ফেটে পড়ে হরিশ সাউ। কি ব্যাপার তুদের ? এখনও ঘুরছে যে ? দাম দিই নাই অগ্রিম ? শালা, তোদের খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান ইদিকে। উদিকে—

: নাই যাব আজ আমরা, হাঁড়িয়া খাব, ছিরু জবাব দেয়।

: যাবি না ?

: নাই যাব। খুশি বটে আমাদের না ? খুশি হলেই যাব।

: যাবি না ? যাবি না বল্লেই হলো ? কোথায় বাস করিস জানিস।

: হাঁ জানি ত। লখাই জবাব দেয়। বাকি, আজ আমরা যাব নাই।

: বলি দেনা হে, আমরা ধান চাল···।

কে একজন কি বলতে চায়। ছিরু তাকে থামিয়ে দেয় এক ধমক দিয়ে। বলে: চুপ কর এখুন। হরিশ সাউর দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বলে: আজকে যাতে নাই পারব আমরা সাউ মশয়।

রাগে এবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো হরিশ সাউ: কে কে যাবি না, বল শালারা, অগ্রিম দাম দিয়েছি, আকালের সময় ধান চাল দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি কিনা, তাই শালাদের বাড় বেড়েছে।

: কেনে গাল দিচ্ছু হে। আমরা নাই যাবো, আমাদের খুশি। লখাই বলে।

: খুশি? চেঁচিয়ে ওঠে হরিশ সাউ। কি যেন ভাবে সে। হঠাৎ যেন রূপ বদলে যায় তার। গলার স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বলে: কত চাস তোরা? চোদ্দ আনা?

আমরা ধান চাল নাই বহিব আর। মাটি কাটার কাজ দে আমাদের। ই দেশের লোক খাতে পাচ্ছে নাই; আর তোরা সব ধান চাল পার করাই দিচ্ছু—ছিরু মুর্মু এইবারে আসল কথাটি বলে। সমর্থনের চাপা গুঞ্জন ধ্বনিও শোনা যায়।

হরিশ সাউর মুখটা রাগে অপমানে কেমন যেন নেকড়ে বাঘের মুখের মতো ভয়ংকর বীভৎস হয়ে ওঠে। দাঁত দাঁতে চেপে সাঁওতালদের ধৃষ্টতাকে জোর করেই সহ্য করতে চায়। কিন্তু পারে না। শালাদের সাহস তো কম নয়? কে শেখালো এদের একথা।

কিন্তু এদের কাছে হেরে গেলে তো চলবে না! তাহলে এরা তো মাথায় চড়ে বসবে!

হঠাৎ জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে হরিশ: সরকারের বিপক্ষে যাচ্ছিস তোরা। এর ফলটা জানিস? বন্দুক দিয়ে উড়িয়ে দেবে সবাইকে। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবি সব।

ছিরু রেগে কি বলতে যাচ্ছিল। লখাই তার মুখটা হাত দিয়ে চেপে দিতে চায়।

এক ঝটকায় হাতটাকে সরিয়ে ফেলে ছিরু বলে: কাঁড় আছে, কাঁড়। সরকারকে বলি দিবেন। উয়াদের বন্দুক, তো আমাদের

কাঁড়। ধান নাই বহিব আমরা, আমাদের খুশি।

হরিশ সাউ ততক্ষণে হন হন করে এগিয়ে গেছে কিছুদুর। সাহস করে সাঁওতালদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারছে না। বিশ্বাস নেই শালাদের, জংলী তো।

দূরের থেকেই হাঁক দিয়ে বলতে বলতে যায়—খাবি কি শালারা? দেখবো তোদের তেজ—

ঃ এমনুতেই তো না খাঁয়ে আছি। মাটি কাটতে চলি যাব, তবু তোর উ কাজ আর করবনি। কে শালা ধান বহিতে যায়, তাকেও দেখব।

দূরের অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হরিশ সাউ। জ্বলজ্বলে তারাগুলোকে ইতস্তত ছড়ানো টাকার মতো মনে হয় তার। আজ রাতে অনেকগুলো টাকা আসত। খোঁচা-খাওয়া বাঘের মতো একটা চাপা গর্জন তার গলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে।

চাল চোর

সলিল চৌধুরী



সলিল চৌধুরী এখন বৈচিত্রময় সুরস্রষ্টিকার এবং সঙ্গীতকার হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত এবং জনপ্রিয়। কিন্তু এক সময় তিনি কবি এবং গণসঙ্গীতকার রূপে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক জুড়ে যে সব গণসংগ্রাম হয়, সেই সব সংগ্রামের কথা, সংগ্রামী মানুষেরবলিষ্ঠ জীবনাদর্শের কথা তিনি তুলে ধরেন তার কবিতা ও গানের মাধ্যমে। সারা বাংলাকে মাতিয়ে দেন গানের বৈপ্লবিক সুরমাধুর্যে, নতুন-রূপকল্পে এবং বিচিত্র ঝংকারে। গান আর কবিতার ভাষায় তিনি এনে ছিলেন নতুনত্বের স্বাদ আর প্রাণচাঞ্চল্য। লিখেছেন অজস্র কবিতা আর গান। কাকদ্বীপের কৃষকদের সংগ্রামের ওপর লেখা তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'শপথ' এবং অন্যান্য কবিতা আর গান সেই সময় হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হত গ্রাম-নগর মাঠ-পাথারে। গণনাট্য সংঘের তিনি ছিলেন সর্বক্ষণের কর্মী এবং সংগঠক।" পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত হয় তাঁর গণসঙ্গীতের একটি অসাধারণ সংকলন 'প্রান্তরের গান'। কবিতা ও গান রচনা এবং সুরস্রষ্টির ফাঁকে ফাঁকে কিছু অসাধারণ গল্পও তিনি লিখেছেন। 'ড্রেসিং টেবিল' এবং 'গুণময় গুঁই এর জীবন চরিত' তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বনমালীকে দেখে আমি চিনতে পারিনি। একমুখ খোঁচা দাড়ি, মাথাটা নেড়া, পরনে লেংটি আর হাতে একটা খালি টিন—লোকটা এসপ্ল্যানেডে ভিক্ষে করছিল। রাতএগারোটা বেজে গেছে—পার্ক সার্কাসের শেষ ট্রামটার জন্য অপেক্ষা করছি। মেজাজটা খিঁচড়ে আছে—অনেক কিছু হওয়া উচিত ছিল, যা হচ্ছে না—অনেক কিছু করা উচিত ছিল যা করা যাচ্ছে না—এক কথায় একটা ভিখিরীর দিকে তাকানোর মত মনের অবস্থা ছিলনা, বিশেষ করে এমন একটা ভিখিরী যার মাথাটা নেড়া, পরনে লেংটি, একমুখ খোঁচা দাড়ি আর হাতে একটা খালি টিন। লোকটা সামনে আসতেই যথারীতি পাশ কাটাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু সে একেবারে হুমড়ি খেয়ে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল—তারপর আবার একগাল হাসি,—চিনতি পারচো?

রাগে জ্বলে যাই আমি—না, সরে পড় এখান থেকে।

—এজ্ঞে আমি বনমালী, চোঁয়াটির বনমালী।

—কোন্ চোঁয়াটি, মানে কোন্ বনমালী? জিজ্ঞেস করি। তখনও আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি, আমার বাড়ি চোয়াটি গ্রামে আর এক বনমালীকেও আমি চিনতুম—আমাদের বাড়িতে জন খাটত—বাগান কোপান, বেড়া বাঁধা, পুকুরের পানা তোলা এই সব কাজ করত, কিন্তু তার সঙ্গে এর যেন কোন মিলই নেই। তবু বুঝতে পারি এই সেই বনমালী।

—তুমি বনমালী?

—এজ্ঞে হ্যাঁ। বনমালী খুশি হয়।

বনমালীর সঙ্গে শেষ দেখা হয় আমার বছর আড়াই আগে, এক অমাবস্যার নিশুতি রাত্রে রাজপুর শ্মশানের ধারে।

সে রাত্রে এক বড় বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল—সেই রাত্রেই আমি বনমালীকে পুলিসে ধরিয়ে দিয়েছিলুম। তারপর গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছি এই দেড় বছর।

—চিনতি পেরেছ তাহলে? বনমালী জিজ্ঞেস করে, তারপর একদৃষ্টে

তাকিয়ে আমার মুখে যেন কি অনুসন্ধান করতে থাকে। কেমন অস্বস্তি লাগে আমার।

সত্যি কথা বলতে কি, লোকটাকে আমি কোন দিনই বরদাস্ত করতে পারিনি। এমনি মুখে একেবারে বিনয়ের অবতার—চমৎকার মিঠে মিঠে বুকনী ছাড়বে—কিন্তু একেবারে মিছরির ছুরি—তলিয়ে দেখলেই বুঝবেন আসলে সেগুলো হচ্ছে অত্যন্ত চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি —ভীষণ ঔদ্ধত্যপূর্ণ। কিন্তু শুধু সেজন্যে বোধহয় নয়—ওর চোখের দিকে তাকালেই মনে হত যেন আমাকে ও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ করছে—যেন আমার প্রাপ্য সম্মান আমাকে দিচ্ছে না—আর সবচেয়ে বড় কথা ওর সামনে দাঁড়ালে কেবলই মনে হত আমি যেন ওর কাছে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ আর তাতেই আমি আরো ওকে দুচক্ষে দেখতে পারতুম না। এত অহংকারের ওর কী আছে? চাষীর ছেলে—তাও এক কাটা জমিও ওর নেই! আমার কর্তৃত্ব ফলানোর জন্যে কারণে অকারণে ডাকতুম, —বনমালী!

—হুজুর! বনমালী এসে হাজির।

—পঞ্চাশবার না তোমাকে বারণ করেছি হুজুর বলতে?

বনমালী হাসত—সেই একগাল হাসি আর সেই চোখ। শেষ দিন পর্যন্ত লোকটা হুজুর বলে জবাব দিতে ছাড়েনি—এ সবই ওর বদ্‌মায়েশি। হয়তো বলতুম,—যাও বাজার থেকে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এস।

ও বলত,—এজ্ঞে আমি এখন একটু শশব্যস্ত রয়েছি—অন্য কাউকে বলুন।

তারপর যাবার সময় বলত,—আপনি তো আবার স্বদেশীবাবু—তা বিলিতি জিনিস বুঝি পুড়িয়ে ফেলে দেওয়া হবে?

ইচ্ছে করে লোকটা এইরকম ঘুরিয়ে কথা বলত—আর রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলতে থাকত। হ্যাঁ, একটা অহংকারের জিনিস অবশ্য ছিল বনমালীর—সে ওর বৌ রাধা। গাঁয়ের মধ্যে ভদ্রলোকের ঘরেও অত সুন্দর মেয়ে আর ছিল না। কোথা থেকে যেন বনমালী তাকে নিয়ে এসেছিল—শুনেছিলুম রাধাকে ও বিয়ে করেনি। আর এইটাই

ছিল গাঁ সুদ্ধ যুবক বৃদ্ধের সান্ত্বনা। রাধার রূপের কথা উঠলেই তারা বলত,—আরে ওর কথা বাদ দাও না—বিয়ে করা বৌ তো আর নয়?

রাধাকে নিয়ে গাঁয়ের মধ্যে পরে অনেক ব্যাপার ঘটেছিল—সে সব কথা বলে কোন লাভ নেই।

অপ্রত্যাশিতভাবে বনমালীর সামনে পড়ে কেমন যেন অপ্রস্তুত লাগছে—পালাতে পারলে যেন বাঁচি, তবু একটু কুণ্ঠা বোধ করছিলুম। হাজার অপবাধই হয়ে থাক—এটা ঠিক যে আমিই ওকে পুলিসে ধরিয়ে দিয়েছিলুম। জিজ্ঞেস করলুম,—তা ভিক্ষে করতে শুরু করলে কবে থেকে?

—এজ্ঞে তা মাস দুই হল।

—গাঁয়ে যাওনি? উত্তরে বনমালী শুধু ঘাড় নাড়লে—হুঁ।

জিজ্ঞেস করলুম,—তা চলে এলে কী করতে? ভিক্ষে করাটা কি ভালো?

—মন টিঁকলনি তাই চলে এলুম। ঘরদোরগুলো সব ভেঙে পড়ে গেছে। আর একটু হাসল বনমালী—মনে আর কোন টান নি আর কি!

রাধার কথা মনে পড়ল, জিজ্ঞেস করলুম,—রাধা কোথায়?

বনমালী যেন চমকে উঠল—বিড়বিড় করে বলল,—আধা!

বনমালীর মুখ দিয়ে 'রাধা' বেরোত না—বলত 'আধা', তাই নিয়ে আমরা কত হাসাহাসি করেছি—বলতাম,—বনমালীর আধা!

বনমালী নিজের মনে বলল,—আধা আছে—বেশ আছে।

আমার ট্রাম প্রায় এসে পড়েছে—সাহসটা খানিক বাড়ল। যাবার আগে বনমালীকে একটা হিতোপদেশ দিলুম,—এসব পাগলামি ছাড়, গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে যাও, সৎভাবে থাকবার চেষ্টা কর—দিন চলে যাবেই।

পকেট থেকে একটা সিকি বের করলুম, ট্রামটা এসে পড়তে যেন বনমালীর হুঁশ হল—তুমি বুঝি এই গাড়িতে চলে যাবে? কিন্তু আমার যে বড়ো পেরোজন ছিল—অনেক দিন ধরে ভাবতেছি তোমার সঙ্গে দেখা হলে কথাটা বলব।

—আচ্ছা গাঁয়ে গেলে আবার দেখা হবে। আমি লাফিয়ে ট্রামে উঠে পড়ি—এ ট্রাম ছাড়লে আমায় তিন মাইল হেঁটে পাড়ি দিতে

হবে—আকাশেও মেঘ ঘনঘটা করে এসেছে—কখন বৃষ্টি নামে—উপায় নেই। হাত বাড়িয়ে সিকিটা দিতে গেলুম—বনমালী ঠায় দাঁড়িয়ে রইল —নিল না। ট্রাম ছেড়ে দিল।

দেখুন! লোকটার অহংকারটা একবার দেখুন। আমি জানি এরাই আমায় মারবে। সেই সমস্ত লোক যারা আপনার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আপনি চান বা না চান কি করে যেন কোথায় জড়িয়ে ফেলেছে—তারাই আপনাকে মারবে! এ এক মহা জ্বালা!! পয়সা নিয়ে আমায় কৃতার্থ করেননি—কাজেই আমার যাওয়া হল না! পরের স্টপে নেমে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলুম। এসে দেখি বনমালী ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে—দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসছে, এতটুকু কৃতার্থ হওয়া কিংবা অবাক হবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই—ও যেন জানত যে আমি ফিরে আসব। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলুম যে নেমে এসে ভুল করেছি কিন্তু তখনও বুঝিনি এ ভুলের বহব কতদূর। তবে এটাও ঠিক —সেদিন যদি নেমে না আসতুম, জীবনের একটা মস্ত অভিজ্ঞতা আমার লাভ হত না। সে অভিজ্ঞতার কথা সকলকে শোনানোও দরকার যাতে আমার মত দশা আর কারও না হয়। সেই কথাই বলছি পরে—তার :আগে একটু ভূমিকা দরকার।

বছর তিনেক আগে আমাদের গ্রামে খাদ্যাভাব শুরু হল। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়—কিন্তু গত যুদ্ধের পর থেকে বিশেষ করে আমাদের ওদিকে এক নতুন জীবের জন্ম হয়েছে—ডেলী প্যাসেঞ্জারী ভাষায় এদের বলা হয়—কণ্ট্রোলের মাগী? দক্ষিণের লাইনে যারাই ট্রেনে চেপে গিয়েছেন তাঁরাই দেখেছেন ময়লা থান পরা একদল মেয়েছেলে চুরি করে চাল নিয়ে আসে শহরে বেচতে—এক বিচিত্র জীব এরা। এদের আপনি যা খুশি করতে পারেন—কেউ কোন প্রতিবাদ করবে না। বেঞ্চের ওপর বসলে ঘাড় ধরে নামিয়ে দিতে পারেন—ইচ্ছে হলে চড়, কিল, লাথি মারতে পারেন। অশ্লীল গালিগালাজ, কুৎসিত ইঙ্গিত করতে পারেন। নারী বলতে আমরা ভদ্রলোকেরা যা বুঝে থাকি—কবিতা গল্পে উপন্যাসে সাধারণতঃ যে নারীর কথা পড়ে থাকি—যে নারীকে অপমান করলে সঙ্গে সঙ্গে আপনি জুতো খুলে কলকাতা শহরে সমর্থকদের ভিড় জড়ো

করতে পারেন—এরা সে নারী নয়—স্টেশনের ওপরেই দেখবেন পুলিস কনস্টেবল কিংবা টিকিট চেকার এদের কাপড় ধরে টানছে—কুকুরের মতো পেছন পেছন তাড়া করে লাঠিপেটা করছে আর ট্রেনসুদ্ধ প্যাসেঞ্জার হ্যা হ্যা হাসছে আর হাততালি দিচ্ছে। প্রথম প্রথম দু একদিন আপনার হয়তো খারাপ লাগবে—তারপরেই সয়ে যাবে। এটা খুব নির্মল আনন্দের ব্যাপার—এরা সব চাষীর ঘরের মেয়ে। কেউই আপনার আমার মত ভদ্রলোকের বৌ মেয়ে নয়—এর জন্য কোন নৈতিক এমিউজমেণ্ট ট্যাক্স দিতে হয় না। এরাই চাল চোর—চালের চোরাকারবারী। আপনি হয়তো বলবেন—চাল তো ফলায় এরাই—কিন্তু ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে হবে—দেশের গাঁয়ের যত চাল সব এরা তুলে দিয়ে আসছে শহরে—আর গাঁ মরছে শুকিয়ে। কাজেই দেশের সেই দুর্দিনে চোরাবাজার বন্ধ করবার জন্যে বড় বড় নেতারা হাঁক দিলেন। আমরা আর স্থির থাকতে পারলুম না—ভলাণ্টিয়ার দল গড়ে তুললুম, স্টেশনে এসে গাড়ি থামলেই চেক্ করা শুরু হত। যার কাছে যা চাল আছে কেড়ে নিয়ে বাজারের মাঝখানে ঢেলে কণ্ট্রোল দরে বিক্রি করে দেওয়া হত। এ কাজ করেছি আমরা তিন মাস ধরে। এই তিন মাসে আমরা যত চাল ধরেছি তার ওজন নিশ্চয় কয়েক শো মণ হবে। সে সময় আমরা একটা একজিবিসন করেছিলুম—বড় মজার একজিবিসন। সে ঘরে ঢুকলে আপনি দেখতে পেতেন এক অদ্ভুত জিনিস। আপনার মনে হত যেন কোন মিউজিয়ামে পুরনো আমলের পোশাক দেখছেন! চটের তৈরী মোটা মোটা জামা ব্লাউজ—কোনটা পাগড়ী, কোনটা ল্যাঙট—কোনটা বা ঠিক পেটের সাইজে তৈরী পিছনে দড়ি দেওয়া এক বিচিত্র পোশাক, সবগুলোর মধ্যেই আছে চাল। প্রথম প্রথম আমরা ধরতে পারতুম না। ক্রমশঃ আমরা চালাকিটা ধরে ফেলেছিলুম। মনে করুন ট্রেনের মধ্যে কোন মেয়েছেলেকে গিয়ে আপনি বললেন,—এই উঠে দাঁড়াও তো দেখি—চালটাল নেই তো?—অমনি সে গোঙাতে শুরু করল,—না বাবা, কোথায় পাব চাল। দেখ না এই রোগের জ্বালায় মরতিচি—তাই এককোণে বসে রয়েছি চুপচাপ।—আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করলেন,—কি রোগ হয়েছে তোমার?

বলবে—পেটে ব্যথা। এরপর আপনার ছেড়ে দেওয়া উচিৎ, কিন্তু যদি বলেন,—দেখি কোন জায়গায় ব্যথা ? সে রেগে যাবে, বলবে,—দেখবে কি আবার, আমি পোয়াতী। তখনই বুঝবেন তার পেটের মধ্যে চাল আছে। তার জন্যে টানাটানি করতে হবে—গালিগালাজ করতে হবে, তারপর আপনি চাল বার করতে পারবেন। প্রথম প্রথম আমাদের ভীষণ কুণ্ঠা হত। কোন কোন মেয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলত—বলত,—বাবা তোমরা তো পুলিস নও তোমরা ভদ্দরলোকের ছেলে, আমাদের ছেড়ে দাও। এই বেচে তবে আমাদের সংসার চলবে।

প্রথম প্রথম ছেড়েও দিয়েছিলুম কিন্তু তারপর ও দুর্বলতা আর ছিল না। দেশের কাজের কাছে ওসব সেন্টিমেন্ট ? হুঁ !! পুলিস আর চেকার ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেয়—তাদের তো কোন দায় নেই। আমরা তা বলে ছাড়তে পারি না ? এরা সব দেশের শত্রু ! কোত্থেকে যে চাল যোগাড় করে চড়া দামে শহরে গিয়ে বেচে—কন্ট্রোলের চালে না-মেটা খিদের জ্বালার চেয়ে যাদের অভাবের জ্বালা কম তারাই এসব কেনে।···পরে জেনেছিলুম প্রায় সমস্ত চালই আসে কয়েকজন বড় বড় গোলদারের গুদাম থেকে। এই সব মেয়েদের তারা কমিশন দেয়। এই সব চাল এসে জড়ো হয় শহরের বিশেষ কতকগুলো জায়গায়—সেখান থেকে অন্ধ গলি পথে সে চাল চলাফেরা করে। শুধু চাল নয়—চালউলীরাও এই শহরের বিকৃত ক্ষুধার খোরাক হয়ে চাল মাথায় এসে হাজির হয় সেই সব বিশেষ জায়গায়--যেখান থেকে তাদের বিশেষ ক্রেতারা নিয়ে যায়। শহরে গুদামের মধ্যে টাকার হিসেব কষে কষে প্রাণটা যাদের গ্রামের জন্যে হাঁপিয়ে ওঠে, সোদা মাটির গন্ধ যারা ভালোবাসে—গ্রামজীবন সম্বন্ধে হয়তো পত্রিকাতে প্রবন্ধ কিংবা রেডিওতে বক্তৃতাও দিয়ে থাকে—শুনেছি এমনই লোক সেইসব বিশেষ ক্রেতারা।

সে কথা যাক—সেই সময় কেবল স্টেশনে নয়—বড় রাস্তার ধারেও আমাদের ভলান্টিয়াররা সারারাত পাহারা দিত। সেদিন রাত্রে আমার ডিউটি ছিল, সঙ্গে ছিল বিজন—সেই রাত্রেই বনমালীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার বছর খানিক আগে বনমালীকে আমরা ছাড়িয়ে দিয়েছিলুম। বাবা রিটায়ার করাতে আমাদের আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন

হয়ে উঠেছিল। তারপর আর বনমালীর খোঁজ রাখিনি, শুনতুম সে চাষবাস করছে। ঘটনাটা বলা প্রয়োজন, আমরা দেখলুম চারজন লোক একটা মড়া নিয়ে শ্মশানের দিকে যাচ্ছে।

বিজন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কে মারা গেল হে?

এজ্ঞে ভুজঙ্গ লস্কর—বনমালীই জবাব দিলে। ভুজঙ্গ লস্কর স্থানীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং বিরাট জোতদার। সেই সন্ধ্যাতেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছে—সন্দেহ হল। ওদের মধ্যে একজন শুধরে নিয়ে বলল,—না বাবু—ও চালাকি করতেছে—মরেছে আমার মেশো—গোপাল পোদ্দার।

বিজন বললে,—নামাও দেখি।

ওরা কিছুতেই নামাবে না—আমরাও ছাড়ব না—শেষ পর্যন্ত জোর করে মড়া নামানো হল! মড়াই বটে! মাথা মুখ হাত পা সবই আছে —কেবল তৈরী চটের আর ভিতরে চাল প্রায় মণ দুই। বনমালী অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল,—হেই বাবু অন্ততঃ আজ দিনটা আমাকে ছেড়ে দাও—আমি তোমাদের কাছে উপরোধ করতিছি!

আমরা অবশ্য ছাড়িনি কোর্টের রায়ে সকলেরই দু-বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল।

সেই রাত্রেই আর একটা ঘটনা ঘটল যেটা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেই রাত্রেই আমরা একটা চালের লরি আটকালাম—খড় চাপা দিয়ে চাল বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল। সকলকে দাঁড় করিয়ে আমি ছুটলাম থানায়—দারোগা বাবুকে কী রকম খুশি দেখব ভাবতে ভাবতে। গিয়ে যা হল—একেবারে উলটো। তিনি মহাখাপ্পা হয়ে একেবারে মারতে এলেন আমাকে—আর বললেন,—কণ্ট্রোলের মাগী নিয়ে কারবার করছ তাই করোগে—বেশী বাড়াবাড়ি ভালো নয়। তারপর বললেন,—ওদের স্পেশাল পারমিট আছে—ওদের ছেড়ে দাও।

আমি বললাম,—আমরা দেখতে চাই কি পারমিট্ আছে। এইবার তিনি একেবারে ফেটে পড়লেন—সঙ্গে সঙ্গে কনস্টেবল পাঠিয়ে লরি ছাড়িয়ে দিলেন—আমাদের জেলে দেবার ভয় দেখালেন। পরে শুনেছি —ভুজঙ্গ লস্করের নিজের লরি ছিল ওটা। এর পরই আমাদের দলে

ভাঙন ধরল- । আর মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করতে চাইল না—কেউ কেউ ভয়ও পেল। ঠিক তিন মাসের মাথায় একেবারে ভেঙে গেল ভলান্টিয়ার দল—আমিও কলকাতায় চলে এলুম চাকরি করতে।

বনমালীকে নিয়ে কার্জন পার্কের কোণটায় বসেছি—ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে—এসপ্ল্যানেড অঞ্চল নিশুতি হয়ে আসছে—মাঝে মাঝে হু'একটা রিক্সা চলছে। দুজনেই চুপচাপ, খানিকটা বসে থাকার পর আমিই প্রথম কথা বললুম—সত্যি কথা বলতে কি আমার গাটা যেন ছমছম করছিল—আর অন্ধকারে বনমালীকে দেখাচ্ছিল ঠিক যমদুতের মতো—তার মুখ থেকে হাসিটাও মিলিয়ে গেছে।

—কী প্রয়োজন আছে বলছিলে?

—হুঁ বলতিছি।

খানিক পরে হঠাৎ বনমালী জিজ্ঞেস করলে,—চাল-চোর ধরা ছেড়ে দেলে?

বললুম,—হুঁ!

বনমালী বিড়বিড় করে বললে,—কার চাল—কেই বা চুরি করে আর কেই বা তারে ধরে।

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে—আমি তাগাদা দিই,—যা বলবে ঝটপট সেরে ফেল—আমার আবার বাড়ি ফিরতে হবে তো!

বনমালী বললে,—তাই তো ভাবতেছি—বলবার কথা রয়েছে ঢের অথচ খেই খুঁজে পাচ্ছিনি—কোথেকে শুরু করব তাই ভাবতিচি। গাড়ি-বারান্দার তলায় এসে দুজনে বসলুম। বনমালী মোটেই বিনয় করেনি। আড়াই ঘণ্টা ধরে সে যা বলেছে—তার সব বলতে গেলে গল্পটা বনমালীরই হয়ে দাঁড়ায়—কিন্তু গল্পটা আমার, কাজেই বনমালীর কথাটা সংক্ষেপে সেরে আমার কথাটা বলব। বনমালী যা বলেছে—তা সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়—আমাদের বাড়ি থেকে কাজ ছাড়ার পর বনমালী দিনকতক বিড়ি বাঁধতে শুরু করল। ঘোষবাবুদের বাড়িতে রাধা বাসন মাজার কাজ করত—কিন্তু ঘোষবাবুর মেজ ছেলের রাধার ওপর নজর পড়ায় বাধ্য হয়ে তাকেও কাজ ছেড়ে দিতে হল। শুধু বিড়ি বেঁধে দুজনের চলে না—কাজেই বনমালী ঠিক করলে সে চাষাবাদ শুরু

করবে। ভুজঙ্গ নস্কর দয়ালু লোক—তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাতলে কেউ ফেরে না—কাজেই বনমালী তাঁর কাছে গেল রাধার ভীষণ অমত সত্ত্বেও। কারণ রাধাকে ভুজঙ্গ নাকি মোক্ষদা মারফৎ ছলাকলায় নানা ইসারা করেছিল। সে যাই হোক—বনমালী দু বিঘে জমি নিল আধি-ভাগে চাষ করবে বলে মুচলেকা দিয়ে—আর ৫ মণ ধান ১৩ টাকা দর হিসেবে দাদন নিল। ধান উঠলে আবার সে দাম ধরে শোধ করে দেবে। লাঙ্গল আর বলদও ভুজঙ্গ দিলেন—ধান উঠলে দু মণ ধান দিয়ে শোধ করে দেবে—এখন কিছু ভাবতে হবে না। ধান রুইতে—গাছ বড় হয়ে ফলন ধরতে আর ধান কাটতে কেটে গেল তিন মাস—মহাজনের কাছে ধার করে দুজনে এক রকম বসেই খেল এই তিন মাস। আশা এই—ধান উঠলেই সব শোধ দিয়ে দেব। ধান যখন উঠল—আধিভাগ দিয়ে—নতুন ধান ৬ টাকা দরে এক মণের জায়গায় ২৷৷৹ মন দিয়ে—লাঙ্গলের দাম শোধ দিয়ে দেখা গেল আর কিছুই বিশেষ নেই—এদিকে বাজারে মহাজনের কাছে দেনা। এবারেও ভুজঙ্গ অবশ্য বাঁচালেন—বনমালীর ভিটেটা বন্ধকে লিখে নিয়ে মহাজনের দেনা শোধ করে দিলেন। আবার বনমালী বিড়ি বাঁধতে শুরু করল। কিন্তু ঠেকা দিয়ে রাখা গেল না—হপ্তায় ৪।৫ বেলার বেশী খাওয়া জুটল না। এই সময় বনমালী পড়ল অসুখে। একদিন সকালে উঠে দেখল রাধা বাড়ি নেই—সেদিন রাত্রেও রাধা ফিরল না—ফিরল পরের দিন সকালে—সঙ্গে করে ফল, চাল, ওষুধ নিয়ে এল। বনমালী জানতে পারল—ভুজঙ্গের কাছ থেকে চাল নিয়ে শহরে বেচতে গিয়েছিল রাধা। বনমালী লাথি মেরে ফেলে দিল সেই ওষুধ ফল আর চাল। রাধা তার পায়ে ধরে কাঁদল—বনমালী তাকেও কয়েক ঘা লাথি কষিয়ে সটান গেল ভুজঙ্গের বাড়ি। ভুজঙ্গ বললে,—তোর জ্বর হয়েছে শুনলুম—নিজে এলি কেন—রাধাকে পাঠিয়ে দিলে তো পারতিস।

বনমালী অনেক কাকুতি মিনতি করে ২৩ টাকা দরে পরের দিনই শোধ দেবে প্রতিজ্ঞা করে দুমণ চাল নিলে ভুজঙ্গের কাছ থেকে। শহরের দিকে নিয়ে গেলে ৩০ টাকা দরে বিকোবে। লাভটা থেকে আর তিন জনকে দুটাকা করে দিলে ওর থাকবে আট টাকা। আট টাকা দিয়ে

টিকিট কেটে ও আর রাধা সটান চলে যাবে বর্ধমানের দিকে—সেখানে নাকি নতুন কি সব কলটল খোলা হচ্ছে—অনেক লোক নিচ্ছে—ওর এক মামা এসে বলে গেছে। কিন্তু সেই রাত্রেই ও ধরা পড়ল আমাদের হাতে—তারপরেই ছু বছর জেল। আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম। খানিক পরেই বনমালী সামলে নিলে—জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা বর্ধমানের সেই কলে আর লোক নেয় না।'

বর্ধমানের কি কল তা আমি জানি না। জিজ্ঞেস করলুম,—কেন ?

—তাহলি চলে যেতুম। আমারে তুমি ছুটো টাকা দিও।

আমি' হ্যাঁ না কিছুই জবাব দিলুম না। গাড়ি-বারান্দায় ঘুমন্ত কয়েকটা লোক জড়াজড়ি করে শুয়ে রয়েছে। একজন ছুঃস্বপ্ন দেখে বিশ্রী শব্দ করে উঠল।

বনমালী বিড় বিড় করে বললে,—চালের গাঁটরিটা যখন তুমি কেটে ফেললে—তখন কি বলব দাদাবাবু পেত্যেকটি চালের দানা যেন আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে—পেত্যেকটি দানাকে আমি চিনি—নিজে হাতে ফলিয়েছি। তাই বলছিলুম, বলি কার চাল, কে চুরি করে আর কে তারে ধরে ?

বৃষ্টিটা থেমেছে। বনমালীকে বলি,—চল আমার ওখানেই আজ রাতটা থাকবে-খন—বলে ছুজনে হাঁটতে শুরু করি।

হঠাৎ বনমালী বলে,—আধার কথা জিজ্ঞেস করছিলে না ? আধা ? সে এখন গিয়ে রয়েছে ভুজঙ্গের কাছে। আমি তারে লাথি মেরেছিলুম সেই রাগে আমার ওপর শোধ নিয়েছে—বনমালীর চোখ দিয়ে জল পড়ে। তারপর বলে,—ওর কোন দোষ নি। খানিকটা পরে আবার বলে,—তোমারও কোন দোষনি—তুমি বা কি করবে—ভালো কাজ করবে বলে যা করলে সে সবই ভালো কাজ—আজ না হোক কাল হবে।

আমি চুপচাপ বাড়ি পৌঁছে বনমালীকে একটা বিছানা করে দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ি। সকালে একটু বেলাতেই ঘুম ভেঙেছে। বনমালীর কথা মনে পড়তেই গিয়ে দেখি বিছানা নেই। তারপরেই দেখি শ্রীমান স্নানটান করে খুঁজে পেতে চা করে নিয়ে আসছেন—আর সেই এক-

গাল হাসি। খুশি হই। একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি—নিজেই রান্না করি খাই—মানে—অর্ধেক দিন হেটেলে খাই। বনমালী থাকলে তবু সুবিধে হবে।

—তুমি আমার কাছেই থেকে যাও বনমালী—আর যেও না।—বনমালী হাসে। তারপর বলে,—কাল একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি দাদাবাবু!

আর কিছু না বলে রান্নার তোড়জোড় করতে লেগে যায়। নাপতে ডেকে ওর দাড়িটা কামিয়ে দিই—একটা ধুতি আর সার্ট দিই। বনমালী কুণ্ঠিত হয়—বলে,—কথাটা পরে বলব।

দিন কতক দিব্যি কেটে গেল। বনমালী ঘরটাকে একেবারে ঝকঝকে করে ফেলেছে—ওর তদারকের জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, তবুও খুশি হই বনমালীকে খুশি দেখে। বনমালী বলে,—এবার তোমার একটা বিয়ে দেব দাদাবাবু! তারপর আবার কি ভেবে গম্ভীর হয়ে যায়। আর এক বছর হলে আমার চাকরিটা হয়তো পাকা হবে—মনে মনে আমারও ইচ্ছে বিয়েটা করে ফেলব। হায়রে—

এমন সময় একদিন রাত ছটোয় দরজায় দমাদম ধাক্কা শুরু হল! খুলে দেখি লাঠি বন্দুকধারী পুলিসে বাড়ি ছেয়ে গেছে—কী ব্যাপার!

—সার্চ ওয়ারেণ্ট আছে। আপনার নাম তো অম্বিকা দত্ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু কিছু তো বুঝতে পারছি না আমি!

—জেনে শুনে ফেরারী আসামীকে ঘরে আশ্রয় দিয়েছেন—আর বুঝতে পারছেন না? অফিসার বললেন।

—কী সর্বনাশ! কে ফেরারী আসামী?

—বনমালী সর্দার থাকে আপনার বাড়িতে?

—হ্যাঁ কিন্তু!!

—এইটে পড়ুন।

যা পড়লুম তা হয়তো স্টেট্সম্যানে আপনারাও পড়েছেন। পড়ে আমার চক্ষুস্থির। একদল কমিউনিস্ট চৌয়াটির কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের ওপর আক্রমণ করে—তাঁর গোলা লুট করে চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়—তাঁর মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে উলটো গাধায় চাপিয়ে গ্রামে

ঘোরায়। যে সমস্ত নিরীহ গ্রামবাসী বাধা দেয় তাদের মারপিট করে। এই কমিউনিস্টদের পাণ্ডা বনমালী সর্দার গা ঢাকা দিয়েছে—কুড়ি জন গ্রেপ্তারের মধ্যে একজন মেয়ে আছে তার নাম রাধা। সে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের একটা কান কেটে দিয়েছে !!

কী সর্বনাশ !! বনমালী কমিউনিস্ট !! আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। দেখলুম বনমালীকে ঘরের মধ্যেই কয়েক ঘা লাঠির বাড়ি দিয়ে তার হাতে হাতকড়া পড়িয়ে দেওয়া হল। তারপর আমাকে অফিসার বললেন,—চলুন।

—কোথায় ?

—থানায়।

—আমায় বিশ্বাস করুন—আমি কিছু জানি না এসবের।

তিনি ভ্রূকুটি করলেন,—আচ্ছা যা বলার কোর্টে গিয়ে বলবেন।

—বুঝুন! কী সাংঘাতিক ব্যাপার! এই যদি হয় তাহলে আপনি পৃথিবীতে কাকে বিশ্বাস করবেন বলুন! কোনদিন শুনবেন আপনার ডান হাতটা কিংবা বাঁ পাটা কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। এ জগতে কারো ভালো করতে নেই—ভালো করেছেন কি আপনার সর্বনাশ হয়েছে।

সর্বনাশ আমার তো হয়েছে। সেই সর্বনাশের কথা বলার জন্যে আমার এত কথা বলা যাতে দেশের সমস্ত নিরপেক্ষ নিরীহ লোকেরা সাবধান হতে পারেন।

—সর্বনাশটা শুনুন।

—সাত দিন হাজত বাসের পর জামিনে ছাড়া পেয়েছি। কিন্তু চাকরিটা আমার গেছে। মেসটা ছেড়ে দিয়েছি, এক বন্ধুর বাসায় উঠেছি সাত দিনের জন্যে, খাবার কোথাও ঠিক নেই। সাত দিন পরে পথে এসে দাঁড়াতে হবে। এখন আমি করি কি ?

থানায় যাবার পথে বনমালী শুধু আমায় জিজ্ঞেস করেছিল—রাগে আমি তার কোন উত্তর দিইনি। জিজ্ঞেস করেছিল,—আচ্ছা দাদাবাবু, জেলে আমার সঙ্গে রাধাকেও থাকতে দেবে তো ?

লাখে না মিলয়ে এক

গোলাম কুদ্দুস



গোলাম কুদ্দুস কবি এবং সাংবাদিক হিসাবে সমধিক পরিচিত হলেও কয়েকটি অসাধারণ উপন্যাস এবং কিছু ছোট গল্প তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে। জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার পাট্টি গ্রামে, পৈতৃকবাড়ি পূর্বতন নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার খলনগর। স্কুলজীবন কাটে কুষ্টিয়াতে, ছাত্রাবস্থা থেকেই লিখতে শুরু করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়ই তিনি প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সংগঠক হিসাবে কাজ করেন। ইতিহাস নিয়ে এম. এ. পাশ করার পর (১৯৪৪) প্রগতি 'লেখক শিল্পী সংঘের তিনি অন্যতম সাধারণ সম্পাদক ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকায় সাংবাদিক রূপে যুক্ত হন এবং তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ। তেভাগা আন্দোলন এবং বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে পার্টিজান লেখক হিসাবে যুক্ত থেকেছেন। এই সব আন্দোলনের উপর কিছু অসাধারণ রিপোর্টাজও তিনি লিখেছেন। •বার্ণপুরের শ্রমিকদের কলকাতায় পদযাত্রা নিয়ে লেখা 'একসাথে' এই রকম একটি লেখা। প্রথম কাব্য গ্রন্থ (১৯৫১) বিদীর্ণ, তারপর ইলা মিত্র, স্বেচ্ছাবন্দী প্রকাশিত হয়। 'মরিয়ম' ও 'বাঁদী' এবং 'লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে' উপন্যাস হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রমিক কৃষক এবং সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের তিনি যে সাথী তাঁর লেখায় প্রতিমুহূর্তে আমরা সেই পরিচয় অনুভব করি।

লাখে না মিলয়ে এক।

আমি ষাট লাখে পেয়েছিলাম তোমাকে। ভিখু, কত বছর আগে কৃষকদের মধ্যে এসেছিল সেই আলোড়ন, যাকে বলা হয় তেভাগা আন্দোলন? সে কি সতের বছর আগে? আর তাতে কি ষাট লাখ কৃষক অংশ নিয়েছিল? মাথা গুনতি করে কি এই সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল? তবু এটাই চলে আসছে। এর সত্যিমিথ্যে আমি জানিনে। তবে বাংলাদেশের এক অতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আন্দোলন যে ছড়িয়ে পড়েছিল, সে আমি নিজের চোখেই দেখেছি। এব খবরাখবর জোগাড়ের জন্য আমাকে তখন বহু জায়গায ঘুবতে হয়েছিল। আজ এত-কাল পরে অবাক হয়ে ভাবছি, এত লোকেব মধ্যে শুধু তোমার কথাই কেন এমন করে মনে আসছে?

অথচ তুমি বার বছবের কৃষক-বালক বই তো নও। কোন বৃহৎ কাণ্ডও তুমি ঘটাও নি, আব আমার সঙ্গে তোমার পরিচয়ও মাত্র কয়েক ঘণ্টার, তবু এমনটা কি করে হল?

তোমার নামটা ভাই আনি বেমালুম হাবিয়ে ফেলেছি। তোমাকে যে নামে ডাকছি, ওটা আমাব ছেলেবেলার এক বন্ধুব নাম। তাকে বহুকাল হারিয়েছি, কিন্তু নামটা স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় হয়ে আছে। সেই নামের লেবেলটা আজ আমি তোমাব গায়ে সেঁটে দিলাম।

কিন্তু ভিখু, কানু ছাড়াও গীত আছে। ভাবতে বসলে ক্রমে ক্রমে আরো অনেক মুখ এবং ঘটনার কথা মনে পড়ে। কি করে ভুলি হেমন্তদাকে। কৃষক সমিতিতে যোগ দেওয়ার আগে সে নাকি ডাকাত ছিল। পৌষমাসের রাত্রিতে টর্চ জ্বেলে গ্রামের পথে চলেছি, সামনে খানিকটা জল জমে আছে, থমকে দাঁড়িয়ে জুতো খুলতে যাচ্ছি অমনি আমাদের নব-বাল্মীকি আমাকে পাঁজা-কোলে করে শূন্যে তুলে ধরল!—আহা কর কি! ছাড়ো! ছাড়ো!·· কে শোনে কার কথা। যতই বলি, আমিও গ্রামের ছেলে; ততই হেমন্তদা বলে, আহা আপনারা হলেন কলকাতার লোক; আপনাদের কি জলকাদা সহ্য হয়?···হেমন্তদা হিমশীতল জলটা পার

করে আমার বপুটাকে হালকা সোলার মতো ডাঙায় নামিয়ে দিল। পরে সেই হেমন্তদাকে আর একবার দেখেছি, তিনি তখন চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। সেই লোহার মতো শক্ত শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। দেখলে মানুষটাকে চেনাই যায় না।

সব আন্দোলনে যুবকেরাই থাকে সকলের পুরোভাগে। কৃষক আন্দোলনেও সেদিন তার ব্যতিক্রম হয়নি। 'এক ভাই, এক টাকা, এক লাঠি'—আওয়াজটা তাদেরই সব থেকে আকৃষ্ট করেছিল। তারাই দলে দলে ভলান্টিয়ার হয়েছে, তারাই গাথা বেঁধে ধান কেটেছে; তারাই লাঠির ডগায় নিশান বেঁধে মিছিল করেছে, আর তারাই রাত জেগে পুলিসের হামলা ঠেকাতে পাহারা দিয়েছে। কিন্তু কৃষক-মেয়েরা তাদেরও হার মানিয়ে দিয়েছে। আমি এখনো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি রানী-শংকাইনের মেয়েদের। তারা পুলিসের হাত থেকে চারটে বন্দুক কেড়ে এনেছে। পুরুষদের মধ্যে হুলুস্থুল কাণ্ড! কি করে বন্দুক ফেরত দেওয়া যায়, সেই এক ভাবনা। আর এইসময় মেয়েদের মারধোর করার সনাতন রীতিটা হঠাৎ যুক্তি বহির্ভূত বলে মনে হতে লাগল। তখন এ নিয়ে অনেক গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। কৃষক সমিতির কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে অভিযোগ করার দৃশ্য আমিও দু একটা দেখেছি।

ভাবলে অবাক লাগে তখন কত বড় বড় ঘটনা কত সহজে ঘটত। তোমার সে-সব বোঝার মতো তখন বয়সও হয়নি, সুযোগও ছিল না। তুমি যেখানে জন্মেছ, সেখানেই বড় হয়েছ। তুমি কোনো স্কুলে পড়নি, বাংলা দেশকে জানা তো দূরেব কথা, একখানা মানচিত্রও দেখনি। তুমি কি করে জানবে, মস্ত অবিভক্ত বাংলা দেশে কি তোলপাড় কাণ্ড চলছিল। তোমার গ্রাম থেকে আট-দশ মাইল দূরে কি ঘটেছিল, তার খবরই কি তুমি জানতে?

তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার মাস তিনেক আগে আমি সেইরকম একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। রূপনারায়ণ রায়ের নামটা হয়ত শুনে থাকবে। তোমাদের এলাকার এম. এল. এ। আমি তাঁর ঘরের দাওয়ায় বসে কেরোসিনের ডিবের আলোয় খবর লিখতাম, আর মাঝে মাঝে কান পেতে শুনতাম গ্রামের রাস্তায় পাহারারত ভলান্টিয়ারদের মাতোয়ারা

কণ্ঠের আওয়াজ—'জান দেব তবু ধান দেব না।' দাওয়ার আর এক পাশ থেকে উঠত কয়েকটা ছাগল, আর তাদের ডেকে পার্শ্বে শায়িতা বাড়ির বুড়ো-মা বিড় বিড় করে কি যেন বলত। সামনে লাউ-কুমড়োর নীচু মাচাটার মধ্যে জ্বলত জোনাকী। মাটির সানকীতে ডাল-ভাত খেয়ে আমি ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে গরম খড়ের বিছানায় শুয়ে শীতে কাঁপতাম, আর পাহারারত ভলান্টিয়ারদের নৈশ বিচরণের জামাকাপড়ের অবস্থার কথা ভেবে লজ্জা পেতাম। সকালে তারা অনেকে এসে আমাকে ঘিরে বসত, আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমার ওভারকোটের ওপর সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে বলত,—কমরেট, এটা গায়ে দিলে শীত লাগে না,—না ?

মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়া কি সোজা কথা ? এই জামাকাপড়ের প্রাচীর একটা ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। তাই বলে একে তো হঠাৎ বাদ দেওয়াও যায় না। ওদের যে বস্ত্রে যে শীত সহ্য হয়, আমি সে রকম করতে গেলে নিউমোনিয়ায় ভুগব। ওরাও তা আশা করে না। কলকাতা থেকে ভদ্রলোক 'কমরেট' এসেছে, এতেই ওরা খুশী। আর আন্দোলনের উৎসাহের জোয়ার আপাতত সব ব্যবধান ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

অথচ এই হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আন্দোলন বুঝতে হলেও তার পিছনের কথাটা বুঝতে হবে। কারণ এই আলোড়ন আকাশ থেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো নিশ্চয় ঝড়ে পড়েনি। এরকম আকস্মিকভাবে তো সংসারে কিছু হয় না। ১৯৪৩ সনের মারাত্মক দুর্ভিক্ষের সঙ্গে এই আন্দোলনের একেবারে নাড়ির যোগ। সেকথা কৃষকেরা সবাই জানে, বোঝে এবং বারবার করুণ সুরে আমাকে স্মরণ করিয়েও দিয়েছে। কত গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তারা আমাকে কবরের সারি দেখিয়ে দিয়েছে। শ্মশানে যারা পুড়েছে তারা তো স্মৃতি রেখে যায়নি। তবে সেদিন সবাইকে তো শ্মশানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। গ্রামের লোক বাধ্য হয়ে গ্রামান্তের কোন জঙ্গল বা আমবাগান বা মাঠেই তাদের ফেলে দিয়ে গেছে। কৃষকরা আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে —ঐ যে ঐখানে! তিন বছর পরেও গাদা গাদা ভাঙা হাঁড়ি কলসী মালসা তার সাক্ষী হয়ে আছে।

দুর্ভিক্ষের সময় আমি ছিলাম শহরে, গ্রামের কান্না আমি কি করে

বুঝব! শুধু সেটা যখন করুণ মিনতির মতো শহরের ফুটপাতে এসে মাথা কুটে মরেছে, তখন চোখের জল ফেলেছি। ক্রমে ক্রমে তাও শুকিয়ে গেল। তবু তখনকার একটা ঘটনা কি করে তোমাকে আমার নিকটবর্তী করেছে, সেই কথাই আজ অকপটে সব বলব।

একদিন রাত বারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরছি। সিঁড়ির কাছটা রীতি-মতো অন্ধকার। সেখানে প্রায়ই একটা কুকুর শুয়ে থাকে। সারমেয়-প্রীতি আমার নেই, আমি কতবার যে ওটাকে লাথি মেরেছি, তবু আপদটাকে দূর করতে পারিনি। সেদিনও কুকুর মনে করে কুণ্ডলী পাকানো একটা বস্তুর উপর পদাঘাত করলাম। অমনি মানুষ-কণ্ঠের দুর্বল আর্তনাদে চমকে উঠলাম।

—কে? কে ওখানে শুয়ে?

কোন সাড়া শব্দ নেই।

আবার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করার পর একটি বালক কণ্ঠের উত্তর এল—আমি।

—আমি কে?

—আমি।

ওপরের ফ্ল্যাট থেকে এক ভদ্রলোক টর্চহাতে নামছিলেন, সেটা ফোকাস করতেই নামহীন গোত্রহীন 'আমি'কে দেখা গেল।

একটি বছর নয়েকের শীর্ণ কঙ্কালসার উলঙ্গ বালক, আর একটি বছর চারেকের অনুরূপ শীর্ণ এবং উলঙ্গ বালককে কোলে জড়িয়ে শুয়ে আছে।

—তোরা কোত্থেকে এসেছিস?

কোন উত্তর এল না।

—তোর বাবা নেই?

—মরে গেছে।

—তোর মা নেই?

—মরে গেছে।

—ওটা কে ?

—আমার ছোট ভাই।

—কাঁদছে কেন ?

—জ্বর।

ভিখু, তোমার কাছে সত্যি কথাই বলব। টর্চধারী নেমে গিয়ে মোটরে উঠল, আর আমি হঠাৎ এমন ক্লান্ত বোধ করলাম যে সে তোমাকে বোঝাতে পারব না। ভিতরটা যেন অসাড় হয়ে এসেছে। গত দুসপ্তাহ ধরে শহরে মৃত্যুর মহোৎসব দেখছি। কি করতে পারি, কি করতে পেরেছি ? কিন্তু মৃত্যু দেখতে দেখতে মনটা যে কেমন করে পাথর হয়ে উঠেছিল, সেদিন রাত্রেই তা টের পেলাম। অথবা আদৌ টেরই পেলাম না। তাই নির্বিবাদে ছেলেদুটোকে ফেলে আমি টলতে টলতে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

তখন শীত পড়তে শুরু করেছে। একবার মনে হল, উলঙ্গ বড়ভাইটা শুধুমাত্র নিজের কঙ্কালসার দেহটার উত্তাপ দিয়ে জ্বরোত্তপ্ত ছোটভাইটিকে রক্ষার কী করুণ চেষ্টাই না করছে ! একথা এমন স্পষ্ট করে যে তখন ভেবেছি, তাও নয়, তবু একবার মনে হল চাদরটা দিয়ে ওদের ঢাকা দিয়ে এলে হত। কিন্তু তক্ষুনি অবসাদের সুরে মন বলল, সব মরছে, ওরাও মরবে, মরতে দাও।

সকালে উঠে দেখলাম, ন্যাংটো ছেলেটার দুই বাহুর মধ্যে তার ছোট-ভাইটি মরে রয়েছে।

জানো ভিখু, আজও চোখ বুঁজলে তাদের দেখতে পাই। নিজের চেহারাটা নিজে যখন দেখি তখন শিউরে উঠি। অথচ নিজেকে এতকাল কত উঁচুদরের জীব বলে মনে করে এসেছি। বিশ্বসংসারে দুর্ভিক্ষের প্রলয়ে যখন ঘরবাড়ি বাপ-মা সবই ভেসে গেল, তখনো ঐ ক্ষুদ্র বালকটি তার ক্ষুদ্রতর ভাইটিকে ছাড়েনি, দুই হাতে বুকে আঁকড়ে ধরে বাঁচাতে চেয়েছে। আর আমি ? সভ্যতার খোলস-পরা আমি মৃত্যুর মহোৎসব দেখতে দেখতে অবশ হয়ে ঘরে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে পেরেছি তো।

সে সময় তোমার বয়সও হবে ওরি মতো—বছর নয়।

—তুমিই বা দুর্ভিক্ষের কি বুঝবে? তোমার তো তখনো বোঝবার মতো বয়স হয়নি। গ্রামের সে ভয়ানক দিনগুলির মধ্যে যে না থেকেছে, সে কি করে বুঝবে কৃষক মেয়েদের মনের ভাব, যখন তারা ধানের আঁটির ওপর হাত বুলিয়ে বলে,—মা লক্ষী ঘরে এয়েচ? তোমাকে আমি ছাড়বো না।—'জান দেবো তো ধান দেবো না'র রহস্য এই।

কিন্তু কৃষকদের সঙ্গে অনেকটা মিশে গিয়েছিল তোমাদের অঞ্চলের কৃষকনেতা কালী সরকার। তার ফলও সে ভোগ করেছিল। তার জ্যাঠামশায় জোতদার এবং ধনবান। আন্দোলনের শুরুতেই বাড়ির মাঝখানে পাঁচিল তুলে দিলেন। বাড়ির একমাত্র ইদারার জল বন্ধ করলেন ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিবারে।

গ্রামের কৃষকরা অবশ্য তার জবাব দিয়েছিল।

কোনো লোক তাঁর বাড়িতে খাটেনি, তাঁর ধান মাঠে পড়েছিল। তাঁর আলুর ক্ষেত চষা হয়নি। তাঁর গোয়াল ভরা গরুর মুখে ঘাস বিচালি জোগাবার রাখাল পর্যন্ত জোটেনি। কালী সরকার আমাকে গম্ভীর মুখেই জানিয়েছিলেন,—ব্যাপারটা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, দুই পক্ষের কেউই কাউকে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

কৃষকদের মনের ভাব একটু একটু বুঝতে পারছি বৈকি। কি করে তারা ছাড়বে? দুর্ভিক্ষের পরের বছর সব জায়গায় ভালো ফসল হয়নি। তার পরের বছর বকেয়া বাকি ঋণের নামে কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে শুষে নিয়ে গেছে। এই তৃতীর বছরে সোনার ধান মাঠে মাঠে আশার বাণীর মতো হাতছানি দিচ্ছে।

আর আমার মনের ভাব শুনবে? আমি এসেছি সেই কলকাতা শহর থেকে, যেখানে কিছুকাল আগে মানুষ পশুর মতো আচরণ করেছে। তখন সেই দাঙ্গার দিনগুলি কতবার ভেবেছি এবং পরস্পরকে বলেওছি—এর চেয়ে মানুষের জন্য কিছু একটা করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরাও ভালো। সেই কিছু একটা,আমার চোখের সামনে, মানুষ আর শস্যের যুগ যুগান্তরের নিবিড় সম্পর্কের রূপ নিয়ে উপস্থিত। মহানগরের অন্ধকূপ থেকে হঠাৎ আমি ছাড়া পেয়েছি গ্রাম গ্রামান্তরের দিগন্ত বিস্তারিত খোলা মাঠের মধ্যে। আমার মাথার ওপর রৌদ্রদীপ্ত ঘননীল

উজ্জ্বল অনন্ত আকাশ, আর চারপাশে আশাদীপ্ত নক্ষত্রের মতো অজস্র মানুষের মুখ। এই সব আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র, রোদে-পোড়া কালো মানুষের অঙ্গার স্তূপে।

বুঝতেই পারছ এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ মনোভাব কৃষক-জীবনের কঠোর বাস্তবতার বিশ্লেষণের অন্তরায় ছিল। তবু মনে করো না একেবারেই চোখ বুজে ছিলাম।

নড়াইলে একজন কৃষক ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল—এটা তেভাগার ধানের ভাত।···তাকে খুশী করার জন্য আমি সজ্ঞানেই এমন মুখভঙ্গি করেছিলাম যাতে তেভাগার ধানের ভাতের বিশেষ মিষ্টত্ব এবং রসাস্বাদনের প্রয়াস বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

দিনাজপুরে এসে ফুলবাড়ির মাঠে প্রথম তেভাগার ধান কাটা দেখলাম।

একটা লাল নিশান পুঁতে রেললাইনের ধারে ধান-কাটা হচ্ছিল। মাঝে মাঝে গানও গাওয়া হচ্ছে। একজন তামাক সাজছে সারাক্ষণ। কয়েকজন লোক ভাত-রাঁধার আয়োজন করছে। আজ মাঠেই বনভোজনের ব্যবস্থা। আমার পক্ষে খুশী এবং উত্তেজনা চেপে রাখা মুশকিল। আমি কয়েকজন সাঁওতাল কৃষকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম।

এই সময় দার্জিলিং মেল পাস করে। হঠাৎ সেই দুরন্ত গাড়িটা মাঠের মধ্যে আমাদের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। ড্রাইভার এবং ফায়ারম্যানেরা হাসছে, আর হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছে। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলতে বলতে কাস্তে হাতে একদল কৃষক ইঞ্জিনের দিকে দৌড়ে গেল। ওদিকে ওরাও গাড়ি থেকে পাল্টা ধ্বনি দিচ্ছে। গাড়ির যাত্রীরা হতবাক হয়ে এই কাণ্ড দেখছে। হঠাৎ শুনলাম ধ্বনির ভাষাটা বদলে দিয়ে কে যেন বলে উঠল—কৃষক মজুর এক হও।··· ওদিকে গাড়ির পিছন থেকে গার্ড ক্রমাগত তার ফ্লাগ নেড়ে বাঁশি বাজিয়ে ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু গাড়িটার নড়ার লক্ষণ নেই।

কারণ তখন কৃষকদের হাত থেকে একটা লাল নিশান নিয়ে ইঞ্জিনের মাথায় বাঁধা হচ্ছিল। তখন মনে হচ্ছিল দার্জিলিং মেলের মতোই আন্দোলন বাঁধা লাইন দিয়ে দ্রুত সম্মুখে ধাবিত হবে।

কদিন পরে জেলা শহরে গিয়ে দেখি, সেখানে খুব উত্তেজনা। কোর্ট-কাছারিতে ঐ একমাত্র আলোচ্য বস্তু। আর ট্রেনে যেতে যেতে তেভাগা আন্দোলনের নেতাদের সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ধারনা ব্যক্ত হতে শুনলাম। কেউ তাদের রাক্ষসের মতো নৃশংস, কেউ বা তাদের অতি-মানব বলে বর্ণনা করছে।

ভিখু, সংস্কৃতি কি তা জানো? ঐ রকম শব্দ কখনো তুমি নিশ্চয়ই শোনো নি। তবু শোনো, শহরের এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এক সভার আয়োজন করল, তারা নাকি আমার কাছ থেকে আন্দোলনের কথা শুনতে চায়। আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তবু যেতে হল। কি যে বলেছিলাম আজ আমার বিন্দুমাত্র মনে নেই, শুধু মনে আছে সভাশেষে বেরিয়ে আসতেই কে একজন বলল—চিরির বন্দরে গুলি চলেছে।…ঐটাই তেভাগা আন্দোলনের প্রথম গুলির খবর।

চিরির বন্দর জায়গাটা দিনাজপুর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। ট্রেনে গিয়ে আবার কিছুটা হাঁটতে হয়। দলবল বেঁধে সেখানে যাওয়া গেল। যে জায়গাটায় গুলি চলেছে সেটা বিরাট এক মাঠের মাঝখানে। চারদিকে পাকা ধানের সমুদ্রে যেন ঢেউ খেলছে। একটা জায়গায় শুধু কিছু ধানের শিষ মাটি ছুঁয়েছে—সেটা বন্দুকের গুলিতে আহতদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগেকার ধড়ফড়ানির ফল। নোয়ানো ধানের গুচ্ছ তুলে দেখলাম তার নীচের মাটি রক্তে তামাটে হয়ে গেছে। কেউ কেউ সেই মাটি হাতে তুলে নিল। কৃষকরা আমার হাতে কয়েকটি বুলেট উপহার দিল। পুলিস কৃষকদের তাড়া করে গ্রামের প্রান্তে নিয়ে গিয়ে গুলি চালিয়েছিল, তার কতকগুলো ঘরের মাটির দেওয়ালে ঢোকে। কৃষকেরা তা খুঁড়ে-খুঁড়ে বের করেছে। এদের সবাই মুসলমান। তাদের ইচ্ছা আমি এগুলি কলকাতায় সোহরাওয়ার্দির হাতে তুলে দিই। তিনি তখন লীগ-মন্ত্রিসভার কর্ণধার।

বেলা বাড়ছে। একখানা মাঠ পার হয়ে আমরা এক সম্পন্ন কৃষকের

বাড়ি এসে উঠলাম। এখানেই আমাদের আহারের আয়োজন হয়েছে। অনেক লোক জমেছে, তারা শুনতে চায় অতঃপর কি করণীয়।

চিরির বন্দরের কৃষকরা সেদিন কি চেয়েছিল জানো? বন্দুক। এ অতি সত্য কথা। তাদের কাছে 'এক লাঠি, এক টাকা, এক ভাই' চাওয়া হয়েছিল, তারা তা দিয়েছিল। এখন তারা নিজের চোখে দেখছে হাজার হাজার লাঠি দিয়েও কয়েকটা বন্দুককে ঠেকানো গেল না। তাহলে এখন কি করবে তারা? আমার কাছে এটা নতুন অভিজ্ঞতা। আমি গ্রামেই বড় হয়েছি, কৃষকদের চিনি, একটা চরের লড়াইতেও তাদের দেখেছি, কিন্তু সেখানেও কয়েকজন লাঠিয়াল প্রধান ব্যক্তি। কৃষকেরা শান্তিতে থাকতেই ভালোবাসে। এখন বুঝতে পারি মানুষ কখন চরমপন্থার কথা চিন্তা করে। চরম নির্যাতনই হচ্ছে চরমপন্থার পরি-পোষক।

ভিখু, তোমাকে আমি তত্ত্বকথা শোনাতে বসিনি, তেভাগার ইতিহাসও ব্যাখ্যা করছি না। এ কাহিনী আসলে তোমাকে নিয়েই রচিত। তবু যে কতকগুলো আনুষঙ্গিক ঘটনা এসে পড়ছে তার কারণ, এগুলি না বললে তুমি আমার মনে কেন স্থান নিয়েছ, তা বোঝা এবং বোঝানো যাবে না। এখন তোমার বয়স উনত্রিশ হওয়ার কথা। তুমি অনেক কথাই এখন বুঝবে।

এইবার অদ্ভুত এক কাহিনী শোনাব তোমাকে। অথচ এক হিসাবে সেটা নিতান্তই এক মামুলি ঘটনা। শুধু দৃষ্টির হেরফেরের জন্য অদ্ভুতকে মামুলি, আর মামুলিকে অদ্ভুত বলে মনে হয়।

চিরির বন্দরে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন ভালোই হয়েছিল। কৃষকেরা উঠোনে, আমরা ভদ্রলোকের ঘরের বারান্দায় খেতে বসেছি। হঠাৎ নজরে পড়ল একজন অতি শীর্ণ অতি মলিনবস্ত্র পরিহিতা নারী একা একা খেতে বসেছে। তার খাওয়ার স্থান কোথায় জানো? পাশা-পাশি দুখানি খড়ের ঘরের চালা থেকে বৃষ্টির জল পড়ে যে জায়গাটা

সে বসেছে।

আমি নিতান্ত মামুলিভাবেই প্রশ্ন করেছিলাম—মেয়েটাকে সাঁওতাল বলে মনে হচ্ছে।

কে যেন স্বাভাবিক স্বরেই জবাব দিল—হ্যাঁ, শিবরামের বৌ!

—মানে, যে শিবরাম শহীদ হয়েছে?

—হ্যাঁ তারই বৌ।

আমি হাতের ভাতের দলা নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর সেই ভাত আমাকে গিলতেও হল।

ভিখু, তুমি হয়ত জানো না, চিরির বন্দরে সেদিন শিবরাম আর সমীরুদ্দীন মারা যায়। সেই শহীদদের হত্যার প্রতিবাদেই আমাদের চিরির বন্দরে আগমন।

অথচ একজন শহীদের বৌ আজ সব থেকে নিকৃষ্ট জায়গায় কুকুর-বিড়ালের মতো খেতে বসেছে কলাপাতা বিছিয়ে। আর সেটা ঘটেছে সকলের চোখের সামনে এবং কারোরই তাতে কিছু মনে হচ্ছে না। এর নামই বোধহয় একাত্মবোধ?

অথচ মজা এই যে শিবরাম এবং সমীরুদ্দীন মরেছে, তাদের এই আন্দোলনে নিজেদের কোন লাভই ছিল না। তারা ক্ষেতমজুর। তবু তারাই প্রাণ দিল। আর এ-নিয়ে অনেক গবেষণাও শোনা গেছে—ক্ষেত-মজুরেরা কেন এত ক্ষেপল।···কিন্তু সব সত্ত্বেও তলার মানুষ তো ওপরে উঠতে পারল না? তার উত্থান কে চায়? আমরা যে সম্পন্ন কৃষকের বাড়িতে খেতে বসেছি তাদের কাছে শিবরামের বৌ তো দুঃখী-কাঙাল বই কিছু নয়। কিন্তু অন্যেরা তা সহ্য করলে কি করে? অন্তত আজকের দিনটা ঐ শহীদের বৌকে কি ঘরের দাওয়ায় এনে বসানো যেত না?

—না, যেত না; সে তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

এরপর সমীরুদ্দীনের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা আমার লোপ পেয়েছিল। তবু যেতে হল। সেখানে শিবরামের বৌয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ ম্লানমুখে উঠোনে বসে আছে। শুধু তফাৎ এই, তার চারপাশে চার পাঁচটি ন্যাংটো ছেলেমেয়ে। খোলা উঠোনে চুলোয় একটা হাঁড়িতে কি যেন ফুটছে। ওপাশে একটা দাওয়ায় একটা ঢেঁকি শোভা পাচ্ছে। তার

ওপরের খড়ের চালা অনেক আগেই লুপ্ত হয়েছে। বৃষ্টির জলে দাওয়াটাও ক্ষয়ে গেছে। আর একখানি মাত্র ঘর। তার অর্ধেকটা ভেঙ্গে পড়েছে।—এই হল আর এক শহীদের ডেরা। সমীরুদ্দীনের বৌ লোক দেখে মাথায় কাপড় দিতে গিয়েছিল, কিন্তু অতদূর ওঠানোর মতো কাপড় কোথায়? যা আছে তার ছিন্ন অংশের ফাঁকে দেহ অসংবৃত। কাজেই সে এবং আমরা আড়ষ্ট হয়ে রইলাম। তারপর ফিরে এলাম।

কৃষকের সঙ্গে একাত্মবোধ? অত সোজা নয়।

তারপর কত জায়গায় গেলাম, কত কি দেখলাম। কত কি ঘটল, সে সব থাক। আমি শুধু একটা ঘটনা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। কারণ আমি তার মধ্যে নিজেই জড়িয়ে পড়েছিলাম। তা সত্ত্বেও সেখানকার কেউ আমার মনের গভীরে কেন স্থান পায়নি? •

ভিমলার নাম শুনেছ? একবার এলাকাটা নাকি অসহযোগ আন্দোলন-কালে ছ মাসের জন্য স্বাধীন হয়েছিল। মনে করো না সেটার পিছনে খুব বেশী বীরত্ব ছিল। জায়গাটা এত সভ্য জগতের বাইরে, এবং বর্ষাকালটায় এমন ডুবে থাকে যে ইংরেজরা ওর স্বাধীনতাকে গ্রাহ্যই করেনি। রাস্তাঘাট শুকিয়ে খটখটে হলে তারা ওখানে একজন দারোগা পাঠিয়েছিল, কেউ বাধা দেয়নি।

শুনে আমার ভারি হাসি পেয়েছিল। বক্তা রাগ করে বললেন—এতে হাসির কিছু নেই। আর এবার তো বাবুদের আন্দোলন নয়, এবার চাষা ক্ষেপেছে, কাজেই অবস্থা সঙ্গীন হতে পারে।

জায়গাটায় পৌঁছে দেখলাম; কই তেমন তো কিছু নয়। শুধু কনকনে শীতে ঘুমনো দায়। যেখানে আস্তানা পড়েছে, সেখানে দুজন নেতার সাক্ষাৎ পেলাম। মাচার ওপর আমরা তিনজন, তার নীচে কটি ছাগল।

ধান কাটা শেষ হয়েছে, কৃষকেরা নিজের খামারেই সব তুলেছে, এখন জোতদারেরা পুলিস এনে তা ছিনিয়ে নিতে চাইছে। কাল হাটবার, পরশু মিটিং ডাকা হয়েছে। কাজেই আপাতত আগামী কাল ছুটি।

সকালবেলা তামাকের ক্ষেতে জল দেওয়া দেখছি, এমন সময় পাশের গ্রামের এক সম্পন্ন কৃষকের বাড়ি থেকে একটি ছোকরা এসে বলল—বিকালে চা খাওয়ার নেমন্তন্ন।

ঘটনাটা এতই নাটকীয় এবং আনন্দদায়ক যে তোমাকে তা বর্ণনা করে বোঝাতে পারব না। তুমি কি করে বুঝবে এক সপ্তাহ কারো পেটে চা না পড়লে বিশ্ব কেমন অন্ধকার দেখায়? কদিন আগে দীনেশ লাহিড়ী নামে এক কৃষক নেতাকে ঠাট্টা করেছিলাম, কারণ তিনি আমাদের ফেলে দশ মাইল পায়ে হেঁটে রুই মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য, ফিরতেও তাঁকে দশ মাইল হাঁটতে হয়েছিল। লাহিড়ীমশাই জমিদার বংশের ছেলে; বহুকাল জেল খেটে প্রৌঢ় বয়সে কৃষক-আন্দোলনে যোগ দেন। উত্তরবঙ্গেব কৃষকদের ভাষা তাঁর মতো কেউ আয়ত্ত করেনি; অন্তত তাঁর মতো কাউকে জমিদার-জোতদারের বিরুদ্ধে খাঁটি কৃষকসুলভ গালাগালির ভাষা প্রয়োগ করতে শুনিনি।

তাঁর পায়ে জুতো নেই, গায়ে একটা গরম জামা নেই, রুগ্ন শীর্ণ শরীর। কোমরে ব্যথা, আর গত দেড় মাস তেভাগা শুরু হওয়ার পর কৃষকদের বাড়িতে জলের মতো ডাল আর পাটশাকের বেশী আহার্য জোটেনি। কিন্তু ডিমলায় এসে আমরা যে তাঁকেও ছাড়িয়ে গেলাম। রুই মাছের ঝোলের চেয়ে চা আমাদের কাছে আরো আকর্ষণীয় মনে হল।

যাঁর বাড়িতে আমরা হাজির হলাম তিনি একজন সম্পন্ন কৃষক, কিন্তু ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে জোতদারের চেয়ে কম নন। গোয়াল-ভরা গরু, খামার-ভরা ধান, বিরাট বিরাট আটচালা ঘর। এরকম পরিবার কৃষক সমিতির সঙ্গে আছে দেখে আনন্দ হল। এবং তা আরো বেড়ে গেল, যখন শুনলাম, আমাদের জন্যে খাঁটি গাওয়া ঘি দিয়ে চিঁড়ে ভাজা হচ্ছে।

এমন সময় দেখা গেল মাঠের মধ্য দিয়ে একটা লোক প্রাণপণ বেগে ছুটে আসছে।

—গুলি চলেছে।

—কোথায়?

—উই, হোথায় !

—কেউ মরেছে ?

তা সে বলতে পারে না। খবর শুনেই সে ছুটেছে। রইল আমাদের চা আর চিঁড়ে ভাজা। তার পিছন পিছন ছুটছি আমরা তিনজন। তখন লাল হয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ধান-কাটা মাঠে নাম-না-জানা একরকম ছোট ছোট লাল ফুল দুপায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছি। আশ্চর্যের ব্যাপার, কতবার ভেবেছি এই ফুলের নাম কাউকে জিজ্ঞাসা করি কিন্তু জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রশ্ন করতে সাহস পাইনি। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছাতে পৌঁছাতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। দেখা গেল, গুলির যথার্থ ফলাফল কেউই জানে না। যতই এগুচ্ছি, ততই লোকের মধ্যে বেশী আতঙ্কের ভাব দেখছি। কেউ বলছে, দশজন মরেছে—কেউ বিশ, কেঁউ পঞ্চাশ, কেউ বলছে একশ, বন্দুকধারী পুলিশ, কেউ তার সংখ্যা বাড়িয়ে বলছে পাঁচশ।

আমার সঙ্গী নেতাদ্বয়ের যিনি সিনিয়ার, তিনি তাঁর টর্চলাইটটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—আপনি রিপোর্টার মানুষ, আপনি গিয়ে দেখুন।

আমি তাঁর এই ব্যবহারে বিস্মিত ও লজ্জিত হলাম। পরক্ষণেই মনে হল, আচরণটা হয়ত কারণ-সঙ্গত। কেননা পুলিস তাঁদের দেখলে গ্রেপ্তার করতে পারে। তবুও এই বিদেশ বিভুঁইয়ের সব কিছুই আমার অজানা অচেনা। আমি এখানে কি বলব, কি করব ?

ছায়ার মতো দুজন কৃষক আমার অনুগামী হল। তাদের না পেলে আমি যে কি করতাম জানিনে।

ঘটনাস্থলে গিয়েও প্রথমটা কিছু বুঝতে পারলাম না। নির্জন অন্ধকার মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে খড়ের আগুন জ্বলছে, আর তার পাশে কয়েকজন আহত কৃষক মাটিতে পড়ে আছে। হঠাৎ মনে হল যেন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে এসে পড়েছি এবং যেখানে কোনো বন্যপশুর ভয়ে মানুষ আগুন জ্বেলে নিজেকে রক্ষা করছে।

আসলে মৃতের সংখ্যা এক, গুরুতর আহতের সংখ্যাও এক। কিন্তু গুলিবিদ্ধ লোকের সংখ্যা বহু। তার কারণ পুলিস বুলেট ব্যবহার করেনি, পাখি-মারা কার্তুজ দিয়ে মানুষ মেরেছে। মানুষও তাই ছররাবিদ্ধ হয়ে পাখির মতো দূর দূরান্তরে ছুটতে ছুটতে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তাদের কতকগুলি পড়ে আছে এই মাঠে, আর কতকগুলি গ্রামে ঢুকতে পেরেছে।

মারা যে গেছে তার নাম তৎনারায়ণ। তার ঘরেব মধ্যে ঢুকে ডোল থেকে জোতদাররা ধান ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন তার চিৎকারে রাস্তা থেকে বহু হাটুরে লোক সেখানে ছুটে যায়।

আমি গিয়ে দেখলাম তৎনারায়ণের মৃতদেহের অর্ধেকটা মাচার ওপর, বাকী অর্ধেক শূন্যে ঝুলছে। মাথার খুলি ফেটে গেছে। পাশের বারান্দা থেকে মাঝে মাঝে কাদের ক্লান্ত কান্নার স্বর ভেসে আসছে।

পুলিস উঠোনে আর একটা লোককে এনে শুইয়ে বেখেছে, তার বাঁ-চোখের মধ্য দিয়ে গুলি পাশ কেটে বেরিয়ে গেছে, তবু লোকটা মরেনি। লোকটির নাম গুল মহম্মদ। তাকে হাসপাতালে পাঠালে হয়তো বেঁচে যেতেও পারে। কিন্তু হাসপাতাল এখান থেকে কতদূরে ?

পুলিস বলল, সকালের আগে গরুর গাড়ি যোগাড় করা যাবে না।

রাত্রে আপাতত কিছু করণীয় নেই। পাশের গ্রামে আস্তানায় ফিরে গেলাম। রাত তখন দুটো। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে বরফ। একদলা ভাত খেয়ে নেতাদ্বয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত ভোর হয়ে গেল। কি করতে হবে ? সেই মামুলি মিটিং ডাকার কথা, গ্রামে গ্রামে খবর পাঠানোর কথা, লোকের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষ্য করার কথা। কিন্তু আপাতত আমাকে গিয়ে দেখতে হবে যাতে পুলিস গ্রামের লোকের এজাহার ঠিক ঠিক লিখে নেয়।

গেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই চক্ষুস্থির। লোককে খবর পাঠাতে হয়নি, তারা নিজেরাই কাতারে কাতারে আসছে। নেতাদ্বয়ের কিছু হিসেবের ভুল হয়েছে। কিন্তু এদের হাতেই বা ওগুলো কি বস্তু ? খুব কম লোকের হাতেই লাঠি, বেশীর ভাগের হাতে সড়কী, বল্লম, খাঁড়া, রামদা, মেয়েদের হাতে বঁটি খোন্তা। কারো কারো হাতে লাঙলের ফাল, কোদাল

এবং কুড়ুল। আটটা নটার মধ্যে সমস্ত মাঠ ছেয়ে গেছে। মাথা গুনতি করলে হাজার দশেকের বেশী হবে না, তবে চর্মচক্ষে জনসমুদ্র বলেই বোধ হচ্ছিল।

মাত্র চারজন বন্ধুকধারী পুলিস, আর একজন দারোগা। তাদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে।

দারোগাবাবু বললেন, আমি নিজে গরুর গাড়ি করে এক্ষুণি গুল-মহম্মদকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি শুধু দয়া করে দেখবেন untoward কিছু না ঘটে।

—তাহলে আপনার বন্দুকধারীদের একটু পিছিয়ে রাখুন।

—ঠিক আছে,ঠিক আছে।

কাল যে দুজন কৃষক ছায়ার মতো আমার সঙ্গে এসেছিল তারা জিজ্ঞাসা করল—লোকেরা কি করবে ?

—আমি তার কি জানি ?

—ওরা আপনার হুকুম চাইছে ?

—আমার !

—হ্যাঁ আপনার।

মুহূর্তকাল ভেবে যে সত্য আবিষ্কার করলাম, তা আমার পক্ষে আদৌ সুখদায়ক ঠেকল না। এখানকার নেতাদ্বয় আত্মগোপন করার ফলে প্রচার হয়ে গেছে আমিই তাঁদের প্রতিনিধি। ফলে এই দশ হাজার ক্রুদ্ধ বর্শা-বল্লমধারী লোক আমার নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

আমি ছায়াসঙ্গীদের প্রশ্ন করলাম,—ওরা কি চায় ?

উত্তর এল, ঐ যে সামনে জোতদারদের গ্রাম, ওটাকে আক্রমণ করতে চায় ?

—তারপর ?

—ওরা সব জোতদারদের মাথা কেটে আনবে।

—আর ?

—ওদের মেয়েদের পুড়িয়ে মারবে।

—কি করে ?

—সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে।

—আর এ সব যদি আমি না করতে বলি ?

ছায়াসঙ্গীরা নিশ্চুপ। একজন বলল, তাহলে কি হয় বলা যায় না। তাহলে হয়ত এই পুলিসদের ওরা ছেড়ে দেবে না।

আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, এত লোকের হাতে ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র আমি কখনো দেখিনি। আর এতে আমার মনে পুলক সঞ্চার হচ্ছিল না। শুধু বোধহয় মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাকে ধরে এনে আমার ঘাড়ে একশ মণ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। আমি কি করি এখন ? কি করে এদের থামাব ? অথচ আমার মুখের একটা কথায় আজ এরা প্রলয় কাণ্ড ঘটাতে পারে। এতবড় শক্তি এবং সম্মান যে আমার ভাগ্যে জুটতে পারে, তা ভাবতে পারিনি। আমি যেন হঠাৎ সম্রাট হয়ে গেছি। একবার যদি চেঁচিয়ে বলি, তাহলেই ঐ যে সম্মুখে সবুজ ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম, সেখানে জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে আগুন। মুহূর্তের মধ্যে ফুৎকারে উড়ে যাবে মানুষের কাঁচা মাথাগুলো। অথচ এত বড় যে শাহানশাহ সম্রাট, সে কেন দুশ্চিন্তার ভারে এমন নুয়ে পড়েছে।

ছায়াসঙ্গীদের একজনকে পাঠালাম নেতৃদ্বয়ের কাছে নির্দেশের জন্য। সে লোকটা আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে বলল, উপস্থিত যা ভালো বুঝি, তাই যেন করি।

আমি একথা গোপন করতে চাই নে, যে আমার ভারি রাগ হল এঁদের দায়িত্বজ্ঞান দেখে। আর যতই রাগ বাড়তে লাগল ততই আমার মুষড়ে-পড়া ভাবটা কেটে গেল। আমি যেন একটু আলো দেখতে পেলাম। এটা বুঝতে পারছি, ঐ খুনখারাপির দায়িত্ব হঠাৎ আমি নিজের স্কন্ধে নিতে পারব না। কিন্তু এদের থামাব কি করে ? আওয়াজ মাঝে-মাঝেই সমুদ্র গর্জনের মতো উঠছে, আর সেই সঙ্গে এদের মধ্যে থেকেই বেপরোয়া বক্তারও অভাব ঘুচে যাচ্ছে। কেউ কেউ উত্তেজিত লোকদের আরও উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু উত্তেজনার চেয়ে পেটের ক্ষিদে যে বড়, সেটা আমার মাথায় ছিল। সুতরাং কৌশল হবে কালক্ষয় করা। এইভাবে বারোটা-একটা নাগাদ ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই সামলে দেওয়া যাবে। অতএব—

অতএব আমি বক্তৃতা করতে লাগলাম। কে একজন একটা চোঙ আমার হাতে দিল। তাতে মুখ লাগিয়ে যে সব আপাত সত্য কথা বললাম, তার যে ষোল-আনাই মিথ্যে, তা আমি হলফ করে বলতে পারি। এই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম, সুবিধাবাদী নেতারা কিভাবে অনর্গল বানানো মিথ্যা পরম সত্যের মতো জোর দিয়ে বলে যেতে পারে এবং কিভাবে তারা 'ম্যানেজ' করে। গ্লানি এবং ধিক্কারে আমার মন ভরে গেল। ভিখু, তুমি যদি সেখানে থাকতে, দেখতে পেতে মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনা প্রহসনে পরিণত হওয়া কত মর্মান্তিক!

যা ভেবেছিলাম তাই। দুপুরবেলা তিনভাগ লোক চলে গেল। বাকী যারা রয়ে গেল তারা অধিকাংশ আশপাশের গ্রামের লোক। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু এমন সময়ে মূর্তিমান আর এক দুর্ভোগ এসে দেখা দিল।

উত্তরবঙ্গের এক বিখ্যাত ব্যক্তি এসে হাজির। তাঁর নামধাম করতে চাইনে,—কারণ যে কাণ্ড তিনি করেছেন তা যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে অতি লজ্জাকর। কলকাতায় লোকটিকে দেখেছি, অল্পবিস্তর পরিচয়ও ছিল, খাঁটি লীগের লোক। এখানে এসেই শুনেছিলাম লোকটি সপ্তাহ দুই আগে এই এলাকায় প্রচণ্ড এক দাঙ্গা বাধাবার উপক্রম করেছিলেন। হিন্দু মুসলিম কৃষক সম্পূর্ণ ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন দুই ক্রুদ্ধ জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন আজকের আত্মগোপনকারী নেতৃদ্বয়। তারপর তেভাগা শুরু হতেই কৃষকদের মধ্যকার ফাটল যখন জোড়া লেগে গেল, তখন উল্টোদিকে হিন্দু মুসলমান জোতদাররাও মিশে গেল ঝাঁকের পাখির মতো। আজ যিনি এসে উপস্থিত তাঁকেও জোতদাররাই পাঠিয়েছে কৃষকদের ঠাণ্ডা করতে।

কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো কৃষকদের স্তিমিত ক্রোধ তাঁকে দেখে আবার বেড়ে উঠল। আর কৃষকরা এতক্ষণ পর একটা কিছু নাগালের মধ্যে পেয়েছে। সব্বাই তাঁকে ঘিরে ধরল। কি করে তিনি গুলির খবর পেলেন? তিনি তো থাকেন দূরে শহরে। তাহলে গুলি চালানোর আগেই জোতদাররা নিশ্চয় তাঁকে খবর দিয়ে আনিয়েছিল। লীগনেতা কৃষকদের এতগুলো প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলেন না। আর

তাঁর পিঠের উপর কৃষকরা তখন সড়কি আর বল্লম উঁচিয়ে ধরেছে।

—দিই ব্যাটাকে শেষ করে। আপনি হুকুম দেন।

আমি জবাব দিলাম—এই যদি তোমরা কর, আমি এক্ষুনি চলে যাব।

হঠাৎ সেই লীগনেতা কেঁদে ফেললেন, আর সেইসঙ্গে মাটিতে বসে পড়ে আমাব হাঁটু জড়িয়ে ধরলেন—আপনি বাঁচান আমাকে।

আমি কি স্বপ্ন দেখেছি। এর নামই কি শ্রেণী সংগ্রাম? কিন্তু আমি যে কাণ্ড করলাম তা নিতান্তই মোলায়েম। আমি তাঁকে হাত ধরে তুলে ধরে বললাম,—আপনি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান।

তিনি তক্ষুনি সানন্দে জোতদারদেব গ্রামের দিকে রওয়ানা দিলেন। তাঁর অপসৃয়মান মূর্তিটিব দিকে চেয়ে আমার মনে হল, কেন কঠিন হতে পারলাম না। এদের মতো লোকেরাই তো দুর্ভিক্ষে মানুষ মেরেছে, আর এখন লোক একটা আন্দোলনের পথে এগুতে চাইছে বলে তাদের গুলি চালিয়ে মারছে। লোকটা যেদিকেই তাকাচ্ছে সেদিকেই তো মৃত্যু। তবু ও লোকটাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া কেন? আর আমি ছেড়ে দিতে চেয়েছি বলেই যে কৃষকরাও ছেড়ে দিয়েছে তাও তো ঠিক নয়। এত যে রাগ, তবু তারা মানুষের গায়ে সহসা হাত দিতে চায় না। আজ যে জোতদারদের গ্রাম জ্বলেনি, মানুষ মরেনি, তাতে তো তাদের একটুও নিরানন্দ দেখছি না, বরং তারা শেষ পর্যন্ত কি ব্যাপারটা এড়াতে পেরে খুশীই হয়নি? হিংস্রতা তো তাদের সহজাত প্রবৃত্তি নয়। মাটির বুকে সন্তানের মতোই যত্নে তারা ফসল ফলায়। তবু আমি জানি ক'দিনের মধ্যেই আসবে আরো বন্দুক, আরো পুলিস; জোতদারদের আরো গুণ্ডার দল। কিন্তু তার চেয়েও যে আরো কিছু ভয়ঙ্কর ঘটতে পারে, তখন তা কি ভেবেছিলাম?

বাংলাদেশে কৃষকদের জয় না হলে জাতি দুই টুকরো হয়ে যেতে বাধ্য। অথচ দাঙ্গার কলকাতা থেকে বেরিয়ে তো স্পষ্টই দেখলাম, ভাঙ্গা কি করে সহজে জোড়াও লাগে। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, বাংলা-দেশের সাহিত্যিক নাট্যকার যাঁরা এত করে সাম্প্রদায়িক মিলন চেয়ে এসেছেন, তাঁরা হয়ত আসল জায়গায় হাত দিতে পারেননি। কিন্তু আজ

আর তা নিয়ে আক্ষেপ নেই। কারণ কৃষকের জয় নামক বস্তুটার সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক কিছু জড়িত। সেদিন নিকট দূরের বহু শক্তি তাকে পিষে মারার জন্য তৈরি ছিল। তবু এর আর একটা দিকও ভাবতে ইচ্ছে করে। সময়টা ভারতের স্বাধীনতার লাভের আগের বছর। কিন্তু স্বাধীনতার ছায়াটুকু যে কতদূরে তা কেউ জানত না। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটা অনির্দেশ উত্তেজনার ঢেউ বইছে। অন্তত কল্পনা করতে দোষ নেই যে, সেদিন ষাট লক্ষ কৃষক অন্যান্য বহু লক্ষ মানুষের সঙ্গে মিলে দৃঢ়পণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে বাংলা দেশের অন্য চেহারা হত—এসব এখন ভেবে লাভ কি? তখন সব ভাবনাই ছিল অস্পষ্ট। শুধু তখন মাঠে মাঠে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়েছে, এসব কথা বড় বড় শহরের বড় বড় মাথাওলা নেতারা কি আর ভাবছেন না! তাঁদের উপরই ভার দিয়ে বসেছিলাম।

সরল বিশ্বাসের এই এক দোষ। কিন্তু ভিখু, তুমি কি এইসব বকুনির বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছ? পারলে সরল বিশ্বাস নামক দ্রব্যটা ত্যাগ করো! ওতে শুধু ভগবানই মেলে, আর কিছু না। তোমার আজ বয়স হয়েছে, ঘাড়ের উপরের মাথাটা দিয়ে কি কিছু ভাববে না?

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা ডিমলা ত্যাগ করলাম। পথে কয়েকজন কৃষকের বাড়িতে বসতে হল। তাদের আমি চিনি না, কিন্তু তারা আমাকে একদিনের মধ্যেই চিনেছে। তাদের মুখ আমার আজ মনে নেই, কিন্তু সেদিন বিদায় নেওয়াব সময় তাদের প্রত্যেকের চোখেই জল দেখেছিলাম। এমন কি সুকৃতি আমি করেছি, যাতে এতটা আশা করতে পারি? কিন্তু মানুষ মানুষের বন্ধু হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে। আমার চোখের জল আসেনি; এরা আমাকে দেখলেও এদের তো আমি ব্যক্তি হিসাবে দেখিনি। এরা সারাদিন আমার চোখে সমষ্টির মধ্যেই মিশে ছিল! আমার বরং এদের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, কারণ জানি—দুদিন পরেই এদের উপর আসবে শত্রুপক্ষের প্রবল আক্রমণ।

ভিখু, এরপর আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। বেশ কয়েকদিন নিশ্চিন্ত কাটানো গেল। একদিন সকালে চা খেতে খেতে কাগজের প্রথম পাতায় চোখ পড়তেই দেখি খাঁপুরে পুলিশের গুলিতে আঠারো জন নিহত। আর অনেকে আহত হয়েছে।

কলকাতা থেকে ডাক্তারসহ কয়েক ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হল। তাঁরা দুদিন পরে ফিরে এলেন। পুলিশ তাঁদের ঐ এলাকায় ঢুকতে দেয়নি।

তখন আমার কাছে প্রস্তাব এল, আমি ঐ এলাকায় অন্য কোনো পথে ঢুকতে পারি কিনা। আমি সহজেই রাজী হয়ে গেলাম। আমার কাছে ছবিটা স্পষ্ট ছিল। বালুরঘাট স্টেশনে নেমে খাঁপুর যেতে হয়—মাত্র কয়েক মাইলের পথ। এই পথটাই পুলিশ আটকে রেখেছে। কিন্তু বালুরঘাট ছাড়িয়ে ফুলবাড়ি স্টেশনে যদি নামা যায় তাহলে মাইল দশেক হেঁটে হয়তো পিছন দিক দিয়ে খাঁপুরে ঢোকা যেতে পারে! এতেও পুলিশের হাতে পড়ার সম্ভাবনা, কিন্তু এছাড়া অন্য পথ নেই। তবু ভাগ্যিস আমি রাজী হয়েছিলাম, নইলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হত না।

আমি আবার সেই স্টেশনে নামলাম যার কাছে একদিন দার্জিলিং মেল থেমেছিল। আমি আবার সেই মাঠ দিয়ে হাঁটলাম যেখানে একদিন নিশান উড়িয়ে ধান কাটা হয়েছিল। আমি আবার সেই গ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলাম যেখানে এক সময় দিবারাত্র উৎসবের বন্যা বয়ে গেছে। কিন্তু এবার কেমন যেন সব নিঃঝুম। দুই একটা আধা পরিচিত মুখ চোখে পড়ল, তারা পাশ কাটিয়ে গেল। ক্যাঁচর ক্যাঁচর করে ছইওয়ালা একটা গরুর গাড়ি আসছে। কাছে এসে থামতেই দেখলাম বসে আছেন কালী সরকার। তাঁর মুখচোখ শুকনো। আমাকে দেখে বললেন—আপনি! ও বুঝেছি।

কালী সরকারের শ্বশুরবাড়ি খাঁপুরে। গুলি চলার সময় তাঁর স্ত্রী ছিলেন বাপের বাড়ি। তারপর তাঁরা সেখান থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন কিছু দূরের একটা গ্রামে। এখন সেখান থেকেই স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে

ঢোকা যাবে!

মাইল সাতেক হেঁটে সন্ধ্যার মুখে যে গ্রামে আশ্রয় পেলাম, সেখানে খাঁপুরের আরো কয়েকজনকে দেখলাম। তারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে স্থান পেয়েছে। পরিচয় হল প্রৌঢ় নীলকণ্ঠ বর্মনের সঙ্গে। ভিখু, তুমি তাকে নিশ্চয়ই চেন। এঁর স্ত্রী যশোদা বর্মন খাঁপুরে মারা গেছেন। পরদিন সকালবেলা এই শোকাচ্ছন্ন প্রৌঢ় মানুষটি আমাকে খানিক দূরে এগিয়ে দিলেন। তারপর আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখালেন, ঐ যে গ্রাম দেখছেন ওর পাশে আড়াআড়ি যে মাঠটা সেটা পেরুলেই খাঁপুর। আমার আর এগুতে সাহস হচ্ছে না, আমি যাই।

নীলকণ্ঠ বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়েছেন। তাঁকে কে যেন এক-জোড়া নতুন চটিজুতো কিনে দিয়েছে। সেটা পায়ে দিয়ে মাথা নীচু করে নীলকণ্ঠ ফিরে যাচ্ছেন, আর আমি একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। নীলকণ্ঠ সহজে এলাকা ছাড়েননি। গুলি চলার পরেও কয়েক-দিন আশেপাশেই ছিলেন, আর প্রত্যহ শেষ রাত্রিতে তাঁকে শীত অগ্রাহ্য করে মাঠের মধ্যে এসে সটান শুয়ে পড়তে হত। কারণ পুলিশ হানা দেয় শেষ রাত্রেই।

আমি চলেছি একা। আশেপাশে অনবরত দৃষ্টি ফেলছি। আশ্চর্য, চোখে একটা লোক পড়ল না। মাঠ জনশূন্য, কেউ কোথাও কোনো কাজে আসেনি।

ক্রোশ খানেক এগিয়ে যে গ্রামে ঢুকলাম, সেখানেও সব নিস্তব্ধ। একটা সম্পন্ন কৃষকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যখন ডাক দিতে যাব— কেউ আছেন? এমন সময় তুমি কোত্থেকে এসে আমাকে দেখে বললে, আপনি কে?—তোমার কাছ থেকেই শুনলাম ঐ গ্রামেরও পুরুষ মানুষ সব পালিয়েছে।

এইখানে বলে রাখি এতকাল পরে তোমাদের রাজবংশী কৃষকের ভাষা বেমালুম ভুলে গেছি। যাই হোক আমার সব কথা শুনে তুমি বললে, খাঁপুরে যদি ঢুকতে চান, এই তার সময়।

—বলো কি ? এই দিন দুপুরে ? খোলা মাঠ দিয়ে গ্রামে ঢুকতে হবে না ?

—আমি তো দুপুরবেলাতেই গিয়েছিলাম সেদিন। এই সময়টা কেউ সন্দেহ করে না।

—কেন বলো তো ?

—এই সময় কেউ আসতে পারে, পুলিশ ভাবতেই পারে না।

—কিন্তু পাহারা তো দেয় ?

—না কোন পাহারা থাকে না। সব্বাই তেল মেখে পুকুরে স্নান করতে যায়।

—তুমি ঠিক জানো ?

—হ্যাঁ।

—তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

—হ্যাঁ।

—তোমার ভয় করবে না ?

—আমার ভয় কিছু করে না, তবু মা শুধু বকে।

—তাহলে তোমায় যেতে হবে না। আমি একাই যাব।

—না, আপনি সব চিনতে পারবেন না। ওরা টের পেয়ে যাবে। আমি হেসে বললাম—পেলেই বা।

—ওরা ধরতে পারলে খুব মারে।

—আমাকে মারবে না।

তুমি তবু আস্তে আস্তে বললে—আমি যাব আপনার সঙ্গে, আপনি কতদূর থেকে আসছেন।

তুমি আমার হাত ধরে টানতে লাগলে, চলুন নইলে মা টের পাবে, আমাকে যেতে দেবে না।

আমি তোমার সঙ্গে মাঠে নামলাম। হাঁটছি আর মনে হচ্ছে আমরা দুজনে যেন চক্রান্তকারী। আমরা পুলিশকে জানান দিয়ে যাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি লুকিয়ে। এক নিষিদ্ধ স্থানে ঢুকতে যাচ্ছি পিছনের দরজা দিয়ে।

এই সর্বপ্রথম আমার মনে হল, আমি যেন কৃষকদেরই একজন।

আগে আমি আন্দোলন দেখেছি একজন দর্শক হিসাবে। তাদের প্রতি আমার অগাধ সহানুভূতি আছে, কিন্তু আমি আর তারা আলাদা। এমন কি ডিমলায় যখন হাজার হাজার কৃষক আমার ওপর অমন করে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তখনও এই দূরত্ব ঘোচেনি। তখন শুধু মনে হয়েছে আমার ঘাড়ের উপর কে যেন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ আমি স্বেচ্ছায় লুকিয়ে লুকিয়ে এক অবরুদ্ধ গ্রামে ঢুকতে যাচ্ছি।

আমি এখন বুঝতে পারছি, কেন সব ছাড়িয়ে তোমার স্মৃতি আমার কাছে এমন উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমাদের এই খাঁপুর যাত্রার সময় সব আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে এসেছে। এখন আর সেই সভা-শোভাযাত্রা নেই। লাল নিশানের ক্ষীণতম ইশারাও লুপ্ত। চারিদিকে সব চাঞ্চল্য থেমে গেছে। সব আওয়াজ বন্ধ হয়েছে। শুধু একটা বীভৎস ভয় বিরাজ করছে গ্রাম গ্রামান্তরে। হাজার হাজার মানুষের উৎসাহ আর উত্তেজনার মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তোমার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন শস্যশূন্য মাঠ, ভাষাশূন্য গ্রাম। যেন এক বিরাট রঙ্গমঞ্চে আলো নিভে গেছে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিদায় নিয়েছে, পিছনের সাজ-ঘরও নীরব, দর্শকের আসনগুলিও ফাঁকা।

এই অবস্থায় একজন নির্ভীক বালক এবং একজন তরুণ সাংবাদিক মুখোমুখি হয়ে পরস্পরকে দেখছিল। পিছনে মৃত্যু, সামনে নিষ্পেষণের যন্ত্র, আর মাথার উপর মধ্যাহ্নের সূর্য। তখন আচমকা মনে পড়ে গেল, তেভাগা আন্দোলনের প্রথম দিকে একজন আমায় কোলে করে শীতল জলের ছোঁয়া থেকে আমার পদযুগলকে রক্ষা করেছিল, আর আজ খাঁপুরে এগিয়ে দেওয়ার জন্য একজন বয়স্কলোক খুঁজে পাওয়া গেল না।

মাঠের ওপার থেকে গান ভেসে এল। তুমি আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে বললে, পুলিসেরা রেকর্ড বাজাচ্ছে।

মাইল দুই দূরে লাউড স্পীকারের ধ্বনিতরঙ্গ এমনভাবে এসে

কানে ধাক্কা দিতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। আমি প্রশ্ন করলাম, ওরা কি রোজই বাজায়?

—হ্যাঁ, প্রায় সব সময়। খাসি মেরে মেরে খায়, আর রেকর্ড বাজায়, আর তাস খেলে।

—খাসি পায় কোথায়?

—সব গ্রাম থেকে ধরে ধরে নিয়ে যায়। আর জেলে এনে পুকুর থেকে সব মাছ ধরে।

গ্রামের কাছে এসে দেখি এপাশটা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরেছে। বহু কষ্টে সেটা পার হয়ে তুমি আর আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলাম।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। বেশ গরম বাতাস দিচ্ছে। গ্রামের মধ্যে টুঁ শব্দ শোনা যায় না, কেবল ঝরা পাতা মাঝে মাঝে এক একটা দমকা হাওয়ায় সরসর করে মাটির উপর উড়ে বেড়াচ্ছে। বাতাস থেমে গেলে সব নীরব। একটা মস্ত গোয়ালঘরের পাশে যেতেই পরিচিত একটা শব্দ কানে এল—গরুগুলো শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। কিন্তু জাবর কাটার এই ধরনের কোরাস কখনো আমি শুনিনি। কৌতূহলবশে গোয়াল-ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গোটা কয়েক গরু চোখ বুজে মুখ নাড়ছিল, আমাদের পায়ের শব্দে নির্বোধের মতো চোখ মেলে চেয়ে রইল। আমি ফিসফিস করে প্রশ্ন করলাম, কারা এদের ঘাস জল দেয়?

—পুলিস কটা রাখালকে ধরে এনেছে।

আমি বললাম, চল ভিতরে ঢুকি। বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। তকতকে ঝকঝকে নিকানো উঠান এবং ঘরগুলি। কোথাও একটু মালিন্য নেই। শুধু কিছু শুকনো ঝরা পাতা পড়ে আছে।

এইভাবে অনেকগুলি বাড়ির ভিতরে ঢোকা গেল, বেশির ভাগ বাড়িতেই লোকজন নেই। শুধু দু একটা বাড়িতে বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে স্ত্রীকণ্ঠে ভয়ার্ত আওয়াজ শুনলাম—কে? কে?

তুমি আমার হাত টিপে দিলে, অর্থাৎ যেন শব্দ না করি। আমার ভয় হচ্ছিল, হঠাৎ কোত্থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠবে, কিন্তু সারা গ্রামে কেন একটা কুকুর দেখলাম না। অবশেষে তুমি আমাকে একটা বাড়ির

উঠোনে এনে দাঁড় করিয়ে চাটাইয়ের দরজা ঠেলে ভিতরে গেলে। খানিক পরে তোমার সঙ্গে এক বুড়ি বেরিয়ে এল। বুঝলাম এই বুড়ির সঙ্গে তোমার প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়।

বুড়ি হাত নেড়ে আমাকে কাছে ডাকল। কাছে যেতেই ফিসফিস করে বলল, তুমি কার ঘরের ছেলে বাবা! কেন এই রাক্ষসপুরীতে এসেছ, পালাও শিগগির! নইলে এরা মেরে ফেলবে।

এতক্ষণে আমার পা শিউরে উঠল। বাল্যকালের কোন রূপকথা শুনতে শুনতে যেন এইরকম এক বুড়ির কল্পনা করেছিলাম, আর তার মুখের ভাষাও যেন এইরকমই ছিল। আজ বাস্তবে তার নমুনা দেখে ভয়ে বিস্ময়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হল রূপকথার গল্পকারেরাও বোধ হয় এমনি করে অবরুদ্ধ জনপদের অভিজ্ঞতাই কল্পনার রঙ চড়িয়ে প্রকাশ করেছিল। তাতে থাকত রাজকন্যা রাজকুমার তেপান্তরের মাঠ, জীয়ন কাঠি মরণ কাঠি। বুড়ি উঁচু দাওয়ার উপর বসে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,—আমাদের তুমি দেখতে এসেছ! আহা মায়ের বুকে ফিরে যাও বাবা, নইলে এরা তোমাকে খুন করবে বাবা।

বুড়ি ফিসফিস করে আরো কত কি বলতে লাগল আর মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি করে বলল—পালাও!

আমি বললাম,—এই ভিখু তো প্রায়ই আসে, তাকে বারণ কর না কেন?

—ও কিছুতেই শোনে না, একদিন ছোঁড়া মরবে।

তুমি আমাকে বললে, ওদের স্নান বোধ হয় হয়ে গেল, এবার জলদি চলুন!

আমি ভেবে পেলাম না এই গ্রাম থেকে আর কি খবর সংগ্রহ করার আছে। আরো কিছু শূন্য বাড়ি আর ঝড়াপাতা দেখবো শুধু। এর জন্যই এত পথ আসা?

তবু এঁকে বেঁকে পা টিপে টিপে গ্রাম পার হতে হল। আগের মতোই

কাঁটাতারের বেড়া পার হলাম। হঠাৎ পিছনে একটা গুলির শব্দ। আমরা প্রাণপণে ছুটলাম খোলা মাঠের উপর দিয়ে। খানিক পরে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম। কই কেউ তো তেড়ে আসছে না। গুলিটা আমাদের উদ্দেশ্যে ছোঁড়া হয়েছিল অথবা ঘুঘু জাতীয় পাখি মারাই তার লক্ষ্য ছিল তা আমি আজও জানিনে। যে গুলি করেছে সে কি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, আর ওটা যদি ফাঁকা আওয়াজ হয়ে থাকে, সে কী আমাদের ভয় দেখাবার জন্য ? মাঠের মাঝখানে এসে দুজনে থামলাম। তখন বিনা কারণেই বোধ হয় আমাদের চোখেমুখে দিগ্বিজয়ের আনন্দ ছিল। তুমি হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, ব্যাটাদের ফাঁকি দেওয়া গেল।

আমি বললাম,—ভালোই। কিন্তু পিঠে গুলি লাগলে লোকে কি আমাদের বীর বলত ?

তুমি সেকথায় কানই দিলে না। তুমি নাম ধরে ধরে কত লোক সম্পর্কে কত কথা বলতে লাগলে। কে কোন গ্রামে পালিয়ে আছে, কার পরিবারের কে মরেছে, প্রথম দিন কী হয়েছিল—এমনি অজস্র কথা। এক সময় তোমাদের গ্রামে এসে পড়লাম। তোমাকে বললাম,—এবার তুমি বাড়ি যাও, আমি চলি।

তুমি বললে, ঐ বাবলাগাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। তারপর সে গাছটা ছাড়িয়েও যখন তুমি আমার সঙ্গে আসতে থাকলে তখন আমি বললাম,—আর এসো না, এবার যাও।

হঠাৎ তুমি বললে,—আপনার তেষ্টা পায়নি ?

—পেয়েছে। সামনের গ্রামে গিয়ে জল খাব।

—না, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি দৌড়ে জল নিয়ে আসছি।

পাশেই একটা মরিচের ক্ষেত। চারপাশে উঁচু মাটির বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে কয়েকটি বাবলাগাছ যেন আমার জন্যই এতকাল অপেক্ষা করছিল। তাদের ছায়ায় গিয়ে বসলাম। বসে বসে তোমার ক্ষুদ্র মূর্তিটি ক্ষুদ্রতর হতে হতে হঠাৎ আমার মনে হল এই রকম এক একটি বালকই কি প্রাচীন কবিদের কখনো ধ্রুব, কখনো নচিকেতা, কখনো বা প্রহ্লাদ চরিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে ? হয়ত নিষাদপুত্র একলব্য

এইরকম কোন গ্রাম থেকেই দ্রোনাচার্যের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

একটু পরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে আবার তেমনি করে দৌড়ে আমার দিকে এলে, তোমার গা দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে।

তেষ্টা পাওয়ার কথা কেন জিজ্ঞাসা করেছিলে এবার বুঝলাম। মায়ের ভয়ে তোমাদের বাড়িতে ভাত খাওয়ানোর কথা বলতে পারনি। মুড়ি-মুড়কি আনা যাবে কিনা, তাতেও হয়ত তোমার সন্দেহ ছিল। এখন তুমি কোঁচড়ভর্তি মুড়ি আর আখের গুড় এনেছ। হাতে পিতলের ঝক-ঝকে মাজা বদনায় শীতল জল। খেতে খেতে এবার তোমাদের সংসার এবং গ্রামের অনেক খবর শোনা গেল। বিদায় নিতে গিয়ে বললাম,—আচ্ছা এবার যাই, কেমন ?

তুমি বললে,—আবার আসবেন!

—আসব।

তোমার মুখে হাসি ফুটে উঠল। কারণ তুমি আমার কথা সরল অন্তঃ-করণে বিশ্বাস করেছিলে। আমি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারিনি। আমার মনে পড়ল, ইতিপূর্বে কত জায়গায় কতজনকে বলেছি, আবার দেখা হবে। কিন্তু তাদের কতজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। অথচ এমনি করেই সারা জীবন বলতে হয়। তোমাকেও বললাম। আর মনে মনে এও জানি, কোন দিন দেখা হলে এই তুমি তো সেই তুমি থাকবে না।

আমি কিছুদূর এসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, তুমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছ। আমি যতই হাঁটছি, ততই বুঝতে পারছি আমার পিঠের উপর তোমার দৃষ্টি আছড়ে পড়ছে। আমি আর তাকাতে সাহস করলাম না।

তারপর এতগুলো বছর কেটে গেছে তোমার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। কলকাতায় কত চায়ের দোকানে 'বয়রূপী' কৃষক বালকদের মুখের দিকে তাকিয়ে কতবার তোমার কথা মনে পড়েছে। মাঝে মাঝে ওদের কারো মুখে হয়ত তোমার মুখের আদল লক্ষ্য করে চমকে উঠেছি। হয়ত তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। হলেও সেই পুরনো দিনের বালকটিকে

দেখতে পাব না, কালের স্রোত তোমাকে আজ যৌবনে উত্তীর্ণ করেছে। তবু তুমি এই সতের বছর ধরেই আমার চেতনায় বালক বেশে সেই মাঠের মধ্যেই একা দাঁড়িয়ে আছ।

তুমি যেন আমাদের এই বাংলা দেশের কৃষক আন্দোলনের কৈশোর অবস্থার প্রতীক।

কতকাল ধরে কত ধার্মিক ভক্তকে বৃন্দাবনের এক বংশীধারী কিশোর মাতিয়ে রেখেছে। আমার মতো ঘোর নাস্তিককে না হয় মাতিয়ে রাখুক তোমার মতো এক রাজবংশী চাষার ছেলে।

তুমি বেঁচে আছ, কিন্তু তোমার যৌবনের দিনগুলি নিদারুণ রুক্ষ ধূসর পথ পার হতে হতে এখন কোথায় এসে বিশ্রাম নিচ্ছে. তোমার বুকের মধ্যেকার সেই সাহস এখনো অক্ষয় আছে কিনা, এ সব আমি কিছুই জানি না। শুধু জানি, যতদিন কৃষক তার মুক্তি খুঁজে না পায়, ততদিন আমারও মুক্তি নেই, ততদিন বার বার তোমাকে আমায় খুঁজে ফিরতে হবে।

সাদা কুর্তা

উমানাথ ভট্টাচার্য



উমানাথ ভট্টাচার্য নাট্যকার হিসাবেই বিশেষ পরিচিত। তিনি বেশকিছু বিদেশী নাটকের বঙ্গানুবাদ এবং বাংলা নাট্যমঞ্চের উপযোগী করে সেসব নাটকের রূপান্তর করেন। তাঁর কৃত গোর্কীর 'লোয়ার ডেপথ'এর নাট্যরূপ 'নীচের মহল' এক সময় গণনাট্যের বিভিন্ন শাখা নানা জায়গায় মঞ্চস্থ করেছিল। তাঁর লেখা নাটক 'ঘূর্ণী', 'ধনপতি গ্রেফতার' এবং 'জল' বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বামপন্থী সাহিত্য ও নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত রাখেন। পঞ্চাশের দশকে তিনি প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রপত্রিকায় বেশ কিছু গল্প লেখেন। প্রতিটি গল্পই সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংগ্রামের সঙ্গে সংপৃক্ত।

সতীশ সামন্ত গ্রামে এসে ঢুকল। রাত তখন দশটা বেজে গেছে ; তবু মনে হল, ভুল করেছে সে, আগে থেকে ভালো করে খোঁজ খবর না নিয়ে আসা উচিত হয়নি। ভিন্ গাঁয়ে থাকতে লোক অবশ্য সে পাঠিয়েছিল এখানকার অবস্থা কি জানার জন্যে। তার কাছে খবর যা পেয়েছিল মোটামুটি ভালোই ঃ কাছারি বাড়ীতে লোক কিছু থাকে, তবে সংখ্যায় আগের তুলনায় তা অনেক কম। এবং মোড়ে মোড়ে পাহারা দেওয়ার রেওয়াজটাও কমে গেছে। সুতরাং গা বাঁচিয়ে চলতে পারলে দু একজনের সঙ্গে দেখা করে আসা খুব শক্ত হবে না। তাই সে এসেছিল, গা বাঁচিয়েই। কিন্তু গাঁয়ের মাঝামাঝি এসেই মনে হল, খবর যা পেয়েছিল তাই সব নয়, দু একজন এখনও আড়ালে বসে পাহারা দেয়, কে আসে কে যায় লক্ষ্য রাখার জন্যে।

সতীশ মেঠো পথ ছেড়ে ধাড়াদের বাগানে ঢুকল,—পথ কিছুটা সংক্ষেপ হবে, ওদের চোখে পড়ার ভয়টাও থাকবে না। গ্রাম ঘুমিয়ে পড়েছে, বাগানের তো কথাই নেই। একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার আওয়াজ আর মাঝে মাঝে শুকনো পাতার উপর খসখস শব্দ—শেয়ালের পদধ্বনি। জমাট অন্ধকারে বাগানটা একাকার হয়ে গেছে ; ভালোই হয়েছে তাতে—কারো চক্ষুশূল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বাঁচা যাবে। একটু অসুবিধা হচ্ছে বটে, তাড়াতাড়ি হাঁটা যাচ্ছে না অন্ধকারে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার ভয়ে। তবে সে এমন কিছু নয়। জন্ম থেকে সতীশ গাঁয়েই মানুষ হয়েছে এই বাগানেও বলা চলে। মনে মনে সতীশ একটু হেসে নিল। সেই কোন যুগের চোর পুলিস খেলা থেকে শুরু করে এই সেদিনও পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে সলা পরামর্শ সবই এই বাগানে।

ভাবতে ভাবতে সতীশ বাগান পেরিয়ে ধাড়াদের একতলা বাড়ির পিছনের পথের উপর এসে পড়ল। একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল বোধ হয় ; নইলে নিশ্চয়ই সতীশের চোখে পড়ত ; ধাড়াদের একদিককার জানলার সামনে কে যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, যেন তারই পথের দিকে চেয়ে।

সতীশ চমকে উঠল, কে ? ধাড়াদের বড় ছেলে না ? শেষ গাছটার

আড়ালে সতীশ গা ঢাকা দিল। জানলার কাছ থেকে লোকটি ততক্ষণে সরে গেছে। সতীশ ভাবল, তাকে দেখে ফেলেছে কি? বোধ হয় না। একবার নিজের দিকে ভালো করে চেয়ে নিল সে, কই, সে নিজেই নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না, তা অতদূর থেকে—। সম্ভব নয়। সতীশ কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। তবু দুশ্চিন্তা একেবারে কমে কই? বিশ্বাস কি? ওদের যা হায়েনার চোখ! সাবধানে সতীশ আবার হাঁটা দিল। চেনা কুকুর দু-একটা দূর থেকে ডেকে উঠেছে—যেমন তারা ডাকে। সে একটু কাছে এগিয়ে যেতেই তারা চুপ করে সরে যেতে লাগল, সে যে গাঁয়ের কত পুরানো লোক!

পথটা একটু এগিয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। দুপাশে আগাছার জঙ্গল, মাঝে মাঝে বড় গাছও আছে দু একটা—আম, জাম, বা ওই ধরনের কিছু। কড়া নজরে চারদিকে ভালো করে একবার দেখে নিয়ে সতীশ মোড়টা পার হল। একটু পরেই কানাইয়ের কুঁড়ে।

সদরের ঝাঁপটা ধরে একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল সেটা। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার দাওয়ার উপর থেকে প্রশ্ন এল—কে?

সতীশ নীচু গলায় উত্তর দিল—আমি।

অন্ধকার থেকে কানাই বেরিয়ে এল। ঝাঁপটা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এত দেরী? স্ স্—আস্তে।

কানাই চমকে উঠল,—কেউ পিছু নিয়েছে নাকি?

ওরা ততক্ষণে দাওয়ার উপর উঠে দাড়িয়েছে। সতীশ অভয় দিয়ে বলল, না। তবে সাবধান হতে বাধা কি?

কানাই নিরস্ত হল; তবু বুকের টিপ্‌টিপানি কি সহজে থামতে চায়? তারপর তারা দুজনে ঘরে গিয়ে বসল; আলো জ্বালা হল না। অন্ধকারে বসে কিছু আলাপ আলোচনার পরে সতীশ কানাইয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, আমি গজেনের ওখানে যাচ্ছি। তোমায় যা বললাম, নামগুলো মনে থাকবে তো?

কানাই বলল,—তা থাকবে। কিন্তু তুমি গজেনের ওখানে?

সতীশ একটু হেসে বলল,—গজেনের ওখানেই ভালো।

কানাই বোকার মত প্রতিধ্বনি করল,—ভালো?

—নয় ? গাঁয়ের দুটো বাড়ি মাত্র বাদ পড়েছে হামলা থেকে, এক ধাড়াদের সে তো হবেই, তারপর ওই গজেন। আর তোমাদের বাড়িতে কবার করে এসে গেছে খেয়াল কর ?

—তা বটে, কানাই মাথা নাড়ল। কে জানে হয়তো আজই আবার এসে হাজির হবে যমদুতেরা !

কিন্তু গজেন, সে তো খুব ভালো লোক নয়, অন্ততঃ তার কথাবার্তা শুনে যতটুক বোঝা গেছে তাকে। তবে এসব ব্যাপারে সতীশের ধারণা চিরকালই নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

কানাই এতক্ষণে মাথা নেড়ে বলল,—আচ্ছা।

সতীশ উঠে দাঁড়াল।

কানাই জিজ্ঞাসা করল,—সঙ্গে যাব ?

সতীশ বলল,—নাঃ, দরকার হবে না।

সদরের দিকে এগিয়ে গেল সে।

গজেন মাইতি কাজের লোক। সেই সকালে গিয়েছিল সদরে, ফিরেছে এই ঘণ্টাখানেক হল। বড় শালার সঙ্গে বহুকালের পুরনো মামলা, ছোট শালার হয়ে ; মূলে আছে শ্বশুরের আট বিঘে জমি। এতে গজেনের লাভ নেই কিছুই, শুধু পরিশ্রম সার। তবে কাজটা ভালো। জমিটুক পাইয়ে দিতে পারলে ছোট শালা দুবেলা দু মুঠো খেয়ে বাঁচতে পারবে। আর সে যদি গজেনের এখানে একত্রে থাকতে চায় তাতেও আপত্তি নেই ; তারই লাগোয়া ওই জমিটা এক সঙ্গে হাল লাগাতে পারলে—। যাক সে চিন্তা পরে, আগে কোর্টে তাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত হোক।

গজেন এতক্ষণ বিশ্রাম করছিল। রাত হয়েছে অনেক। হাত পা ধুয়ে সে খেতে যাবে এমন সময়ে সদর দরজায় টোকার শব্দ ! গজেন উৎকর্ণ হয়ে মনে মনে প্রশ্ন করল কড়া থাকতে টোকা দেয় কে ?

নান্টু দেখতো কে ডাকে ? গজেনের বড় ছেলে, বয়স তের হবে। নান্টু গিয়ে দরজা খুলে দিতে হাতকাটা সাদা কুর্তা পরনে একটি মাঝবয়সী

লোক ভিতরে এসে দাঁড়াল। তারপর একবার গলা বাড়িয়ে বাইরে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে নিজের হাতেই দরজার খিলটা তুলে দিয়ে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল,—আরে তুমি দাঁড়িয়ে আছো?

গজেন দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিল সদরের দিকে। লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে নান্নুর মত সেও প্রথমে কিছুটা উৎসুক না হয়ে পারেনি। এবারে একেবারে সামনা সামনি সতীশ সামন্ত এসে দাঁড়াতে গজেনের কপালে কয়েকটা সূক্ষ্ম রেখা পরিস্ফুট হয়ে উঠল। গজেন উত্তর দিল,—কেন? দাঁড়িয়ে আছি, তাতে কি?

সতীশ একটু হেসে দাওয়ার উপর উঠে এল। বাড়িটা পুরনো, গজেনের ঠাকুর্দার আমলের। দেখলেই বোঝা যায় এ বাড়ির বয়স হয়েছে কিন্তু সংস্কার হয়নি একবারও, তাই জীর্ণ। সতীশ জিজ্ঞাসা করল,—তোমার ঘর কোন্‌টা?

গজেন মনে মনে বিরক্ত হল, কেন, সতীশ কি জানে না গজেন কোন ঘরে থাকত? সতীশ কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে সোজা গজেনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। একবার গজেনের দিকে চেয়ে দেখল, যেন প্রশ্ন করতে চায়, কেউ নেই তো! তারপর দরজা ঠেলে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। কোণে একটা হারিকেন জ্বলছে মিট মিট করে। আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে সতীশ খাটের উপর চেপে বসল! গজেনও তার সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। সতীশ পূর্ব দিকের বড় জানালাটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—শিকটা পালটেছ নাকি?

গজেন মনে মনে বলল,—দেখছ না; কিন্তু মুখে কোন কথা বলল না সে। সতীশ উত্তর না পেয়ে নিজে থেকেই উঠে গিয়ে দেখে এল ঠিক তেমনিই আছে যেমনটি ছিল দেড় বছর আগে। বেশ ভালোই। গায়ের কুর্তাটা খুলে সতীশ আরাম করে বসে গজেনকে জিজ্ঞাসা করল,—তোমার খাওয়া হয়েছে?

—না।

সতীশের মনে হল গজেন ক্রুদ্ধ হয়েছে।

—তবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, খেয়ে এস। আজ রাতটা এখানেই শোব।

কথা শুনে গজেনের ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হল ; সর্বনাশ কি এমনি করেই করতে হয় ? কিন্তু উতলা হলে চলবে না, ঠাণ্ডা মাথায় বোঝাপড়া করতে হবে। গজেন খেতে গেল, মেয়েরা অনেকক্ষণ বসে আছে ভাত বেড়ে।

সতীশ আলোটা কমিয়ে দিয়ে খাটের বেড়ায় মাথা রেখে বিশ্রাম নিতে লাগল ; চোখটা বুঁজে এল আপনা থেকে। বাড়ির পিছনে জঙ্গল থেকে একটানা ঝিঁ ঝিঁর ডাকে মাথায় মধ্যে কেমন একটা প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করছে। সতীশের দেহ মন এলিয়ে পড়ল আমেজে নিশ্চিন্ত আশ্রয় না পেলে এমন হয়।

দরজা বন্ধ করার শব্দে সতীশ চমকে উঠে বসল। কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে ?—খাওয়া হল ?

গজেন কোন উত্তর দিলনা। জানলাটা বন্ধ করতে করতে নিজের মনেই বলল,—যা গরম! তারপর আলনায় ঝোলান জামার পকেট থেকে বিড়ি বার করে জিজ্ঞাসা করল—খাও ?

সতীশ এবারে একটু ম'ন্বা না কবে পাবল না, মুচকি হেসে পাল্‌টা প্রশ্ন করল,—আমায় বলছ ?

গজেন সতীশের মুখের দিকে চেয়ে দেখল, তার কথার অর্থ যেন সে বুঝতে পারেনি। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলল সে,—হ্যাঁ তোমায় বলছি।

সতীশ হাত বাড়িয়ে বিড়ি নিল।

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ।

নীচু হয়ে গজেন মাটিতে চেপে জ্বলন্ত বিড়ির টুকরোটা নিভিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল,—তা, হঠাৎ আমার এখানে কেন ?

সতীশ একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল ; গজেন বুঝি বিগত দিনের ইতিহাসের রেশ ধরে টান দিতে চায়।—কেন আসতে নেই ?

কিন্তু গজেন লোকটা খুব শান্ত ; ঝগড়া সে সহজে করে না কারো সঙ্গে। তাই বলল,—না ; তা কেন ? আসবে বই কি নিশ্চয়ই আসবে। তবে কি জানো—গজেন কি ভেবে নিল, আমরা হলুম গিয়ে তোমাদের শত্তুর ; যদি ধরিয়ে টরিয়ে দিই। তাই বলছিলাম।

সতীশ জানে গজেনের ক্ষোভের কারণ আছে। কিন্তু লোকগুলোকে

এত করে বুঝিয়েও তো সে কিছু করতে পারেনি ! গজেনের কথা ভাবলেই নাকি তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এই বাড়িখানা ; আর তাদের বাপ-ঠাকুরদার আমলের পুরনো ইতিহাস। সতীশ বোঝাবার চেষ্টা করেছে, গজেনের ঠাকুর্দা ব্রহ্মচারী মাইতি হয়তো পাপ করেছিল, পাঁচজনকে ঠকিয়ে নিজে বড় হতে চেয়েছিল (বড় হয়েছিলোও সে) ; কিন্তু গজেনের মধ্যে তো তেমন কিছু দেখা যায় না। পনেরো-কুড়ি বিঘে জমি সে লোক দিয়ে চাষ করায় বটে, কিন্তু শুধু এই জন্যেই কি তাকে এক কথায় শত্রু বলে ঘোষণা করা যায় ? ঐ কথা তার কে শোনে ?

গজেনই বা কতদিন সইবে ? দোষ না করেও যদি দুষ্ট বলে বদনাম হয় তবে আসে বিরক্তি বিক্ষোভ। তাই মাঝে মাঝে সে কড়া কথা বলেছে, ঝগড়া করেছে, রাগের মাথায় বলে বসেছে—হ্যাঁ ; সে ওদের শত্তুর, সময় মত তার পরিচয়ও সে দেবে। কিন্তু সতীশ যার সঙ্গে তার এত দিনের বন্ধুত্ব সেও যখন ওই মাথা গরমগুলোর কথা শুনে তাকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করল, তখন গজেন আর সুস্থ থাকতে পারেনি, খোলাখুলিই ধাড়াদের বাড়িতে যাতায়াত আরম্ভ করেছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে তার মাথার উপর কবে ওদের খড়্গ নেমে আসবে, সে খবরটা তো অন্ততঃ পাওয়া যাবে তাদের কাছ থেকে !

সতীশ বলল,—গজেন, তুমি শত্তুর, একথা কি আমি কোনদিন বলেছি ?

গজেন ধীরে ধীরে উত্তর দিল,—বলনি, তবে কাজে দেখিয়েছ।

সতীশ বলল,—ভুল বুঝো না, আমাকেও তো লোকের কথা শুনে চলতে হয়। তুমি যদি ঘন ঘন ধাড়াদের ওখানে যাওয়া 'আসা কর, তাতে—।

গজেন কথা শেষ করতে দিল না, রাগতভাবেই বলল, তাতে তোমার লোকেরা বলল, আমি ধাড়াদের সঙ্গে মিলে দালালি করছি, এই তো ? গজেন চুপ করল। ব্যথা পেয়েছে সে, তার মুখচোখের দিকে চেয়ে সতীশের তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু কি করবে সে, কি বলে

প্রবোধ দেবে ? সতীশ গজেনের কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে ডাকল,—গজেন ! এমন ভাবে সে অনেকদিন ডাকেনি। গজেন মুখ তুলে তাকাল সতীশের দিকে। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় অনেক কালের পুরনো দৃষ্টি পরস্পরকে খুঁজে বেড়াতে লাগল : এই কি সেই সতীশ ? সেই গজেন ?

গজেন বলল, আমাকে ওরা দালাল বলে, আমার একখানা পাকা বাড়ি আছে কিনা, তাই। সুস্থ মানুষ গজেন, এই কথার ক্লেদাক্ত আঘাতটা সামলে নেবার চেষ্টা করল সে। তারপর আবার বলল, ঘরে বসে জোরে কথা বলতে ভয় হয়, ইঁট খসে পড়বে বুঝি। কী করব ? উদয়াস্ত খেটেও ছাতটা সারাবার কথা ভাবতে পারি না ; পেটেই দেবো, না—। গজেন মাঝপথে থেমে গেল।

সতীশ বলল,—আমি তা জানি।

—জানোই যদি তবে। কিন্তু কী হবে বলে ? আমাকে শত্তুর বলে যখন ঢোল পিটিয়ে দিয়েছে, বেশ, আমাকে ছেড়ে দাও। একটু নড়ে চড়ে বসল সে।

সতীশ চমকে উঠল। আমাকে কি চলে যেতে বলছ— ?

গজেন বলল,—না, এখন আর কোথায় যাবে এই রাত দুপুরে ? যাক্ আমি জেগে পাহারা দিই। পুলিসও আসবে, দা-কুড়ুল দিয়ে তোমার লোকেরাও আসবে। আমি বসে থাকি পথ চেয়ে।

গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা দুজনের মনেই কেমন একটা মাদকতার প্রভাব বিস্তার করেছে !

সতীশ জিজ্ঞাসা করল,—আমাদের ক্ষমা করতে পারো না, গজেন ? কেমন নিষ্ঠুর শোনাল আবেদনটা। উপায় নেই। তার অক্ষমতার কি আর চারা আছে ?

গজেন বলল,—কি দরকার ! আমি খেতে চাই না, পরতে চাই না, বাঁচতে চাই না। যারা তা চায় তাদের সঙ্গে শত্রুতা করি ; বেশ, তাই হোক।

সতীশ বুঝল, এটা গজেনের অনুযোগের কথা ; আপনজন ভেবে সতীশের কাছে অভিমান করছে। কিন্তু বলে কতটুকুই বা সে

বোঝাতে পারবে গজেনকে। অনেক দিনের অনেক ভুল জমা হয়ে পাহাড়ের আকাব নিয়েছে ; একদিন তা সরিয়ে মুক্ত বায়ু চলাচলের পথ সে একা করে দেবে কেমন করে ?

সতীশ বলল,—আব ভুল বুঝো না গজেন।

—নাঃ। একটা বুক ভাঙা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল গজেনের বুক থেকে।

কথা যেন ফুরিয়ে গেছে ; তুজনেই চুপ করে রইল। হারিকেনের তুর্বল আলো ঘরের মধ্যে কেমন একটা মায়াজালের স্বষ্টি করেছে। কি একটা পতনের শব্দে তুজনেই চমকে মুখ তুলে তাকাল। বিশেষ কিছু নয় ; দেয়াল থেকে এক চাবড়া চুনবালি খসে পড়েছে মেঝের উপর। তুজনেই সেদিকে চেয়ে দেখে একবার, তারপর পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল ;

—কিছু বলবে কি !

—নাঃ, কি আর আছে বলাব ! বাত হয়েছে অনেক। গজেন এক সময় উঠে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বলল, শুয়ে পড়। খাটের উপব নিজের বালিশটা সে ঠিক করে নিল ; হাত দিয়ে পরখ করল সতীশের জন্যে বালিশ ঠিক জায়গায় পাতা আছে কিনা। তারপর তুর্গা নাম উচ্চারণ করে শুয়ে পড়ল।

সতীশ বলল,—আমাকে খুব ভোরে ডেকে দিও কিন্তু।

গজেন বলল,—হ্যাঁ দেব। ঘুমপুরীর অন্ধকারে তার দেহমন ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল।

তখনও কাক ডাকে নি ; সদর দরজার ঠেলাঠেলি শুনে গজেন ধড়মড়িয়ে উঠে বসল, এত ভোরে কে ডাকে ?

সতীশকে একটা ঠেলা দিতেই সে ফিস ফিস্ করে বলল,—হ্যাঁ জেগে আছি। তারপর ধীরে সুস্থে খাট ছেড়ে নেমে দাঁড়াল। অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে জানলাটা খুলে দিল সে।

—আমার জামাটা কোথায় ?

—এই যে। গজেন জামাটা সতীশের হাতে তুলে দিল। তারপর ঠক করে একটা চাপা শব্দ হল জানলার কাছে।

সতীশ অন্ধকারে এগিয়ে গেল সেদিকে।

গজেন একটু উত্তেজিতভাবে ডাকল,—দাঁড়াও। এত কিছু করে বেড়াচ্ছ। আর এটুকু খেয়াল নেই। তার নিজের খাঁকি রঙের জামাটা এগিয়ে দিল সে,—তাড়াতাড়ি পরে নাও। সাদা জামা অন্ধকারেও দেখা যায়।

ততক্ষণে দরজা টপ্‌কে সবাই এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনের মাঝখানে।

রুক্ষ কণ্ঠে কে একজন ডাকল গজেনকে,—গজেন বাবু আছেন?

আর এক মিনিট, তাহলেই সতীশ পাঁচিলের ওপারে গিয়ে পড়তে পারবে। গজেন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। যাক আর ভয় নেই সতীশ চলে গেছে। জানলার শিকটা জায়গামত বসিয়ে দিয়ে গজেন খাটের উপর এসে বসল, কেমন যেন হাসি পাচ্ছে তার। বুকের সশব্দ কাঁপুনিটা এখনও থামেনি।

বাইরে থেকে আবার আহ্বান এল,—গজেনবাবু!

গজেন দরজা খুলল,—কে ডাকে? একবার হাই তুলে চোখটা মুছে নিয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল সে,—কী ব্যাপার? আপনারা আমার বাড়িতে?

অফিসারটি মুচ্‌কি হেসে বললেন,—কেন আসতে নেই?

তারপর বাড়ি সার্চ; কিন্তু আপত্তিকর পাওয়া গেল না কিছুই। তবে অফিসারটি গজেনের ঘরের মেঝের উপর হাতকাটা সাদা কুর্তাটার দিকে ভালো করে একবার চেয়ে দেখে বললেন,—আপনাকে এতদিন ঠিক চিনে উঠতে পারিনি, কি বলেন গজেনবাবু,—এ্যাঁ? বুদ্ধিসুদ্ধি সব খেয়ে বসে আছি একেবারে,—হেঃ হেঃ। ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলেন তিনি।

তখন ফর্সা হয়ে গেছে। কাক পাখীর ঘুম ভেঙেছে অনেক আগে।

অফিসার বললেন,—আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে, গজেনবাবু।

—আমায়? একটু আগের সেই অদ্ভুত হাসির দমকটা মনের মধ্যে আঁকুপাকু করে বেড়াচ্ছে। বেশ চলুন।

সকাল বেলার কড়া রোদ এসে আছড়ে পড়েছে দাওয়ার উপর। ভারি বুটের মচ্ মচ্ শব্দের সঙ্গে গজেনও সদরের দিকে এগিয়ে চলল।

সুন্দরী

আলাউদ্দিন আল আজাদ



আলাউদ্দিন আল আজাদের জন্ম ১৯৩২শে, ঢাকা জেলার রামনগর গ্রামে। ১৯৫৪ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে এম এ পাশ করেন। ছাত্রজীবনেই কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্র যুব আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেন। ১৯৫২র ভাষা আন্দোলনে তাঁর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। ইলা মিত্রকে নিয়ে লেখা তাঁর ছোট গল্প 'কয়েকটি কমলালেবু' দু বাংলার মানুষের কাছেই সমাদার লাভ করে। তাঁর 'জেগে আছি' এবং 'রাজকন্যা' পঞ্চাশের দশকে খুবই সমাদৃত হয়। পশ্চিমবাংলারও বিভিন্ন প্রগতিশীল পত্রপত্রিকায় তাঁর একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাস কর্ণফুলী, তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, শীতের শেষ রাত, বসন্তের প্রথম দিন, ক্ষুধা ও আশা এবং গল্পগ্রন্থ অন্ধকার সিঁড়ি, উজান তরঙ্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি কবি হিসাবেও পরিচিত। আজও তাঁর কলম অব্যাহত।

আমতলা ছাড়িয়ে কোণাকুণি রাস্তাটায় পা দিতেই পিছন থেকে কয়েকটি ছেলেমেয়ে চীৎকার করে ওঠে, এই সুন্দরী, সুন্দরী!

ওরা দৌড়ে কাছে এসে সুর করে ছড়া কাটতে থাকে। একটি দুষ্ট ছেলে টান মারে কোমরে গোঁজা কাপড়ের গাঁটে। বুড়ি নিমিষের জন্যে একবার তাকালো। সুতো দিয়ে লতা-পাতা আঁকা একটি ছোট্ট থলে হাতে দাঁতহীন মুখে পান চিবোতে চিবোতে চলতে থাকে নির্বিকার। ছেলে-পুলেদের অত্যাচারে রাগলে চলে না। তাছাড়া এই ছেলেদের দাদার আমল থেকে এসব মন্তব্য এত শুনে আসছে এখন আর এগুলোতে কান দেয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। আসল নাম ছিল বুবি, গায়ের রং কুচকুচে কালো, তাই বোধ হয়, গ্রামের কোন রসিক পুরুষ তার নাম দিয়েছিল সুন্দবী। তার আসল নাম এই নামের তলায় চাপা পড়েছে অনেকদিন।

এই নামটা ছেলেবুড়ো অনেকেরই কাছে প্রিয়। রসিকতা করার জিনিস। আজ দুদিন ধরে গ্রামে একটা চাপা আশংকা এবং উত্তেজনা বিরাজ করলেও, যে কেউ তাকে দেখেছে, একটু রসিকতা করতে ছাড়েনি।

তার গলায় সেকেলে পুঁতির মালা। পরনে বহু পুরনো একটি দিশি কাপড়। এই কাপড়টা এককালে বাবুর হাটের শাড়ি ছিল, এখন তেনায় পরিণতি হয়েছে। ডান হাতে মনকাঁটার ডালার মাথা বাঁকানো লাঠি। গায়ের চামড়া ছোট ছোট ভাঁজে ঢিলে হয়ে গেছে, শরীরের গড়নটা এমনই প্রকাণ্ড যে, আদ্দিকালের পাহাড়চারী বনমানবীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। থুতনির নিচে থলথলে গোস্ত ঝুলছে, হাতের হাড়গুলো পুরু পুরু। অনেকে দেখে ভাবে, বুড়ি হয়েছে এখনো এমন, আর জোয়ান ছুকরী যখন ছিল তখন না জানি কেমন ছিল। আগেকার দিনে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারাটি ছিল এ-গ্রাম থেকে পাকা দেড় মাইল দূরে। তার পানি এমনই পরিষ্কার টলটলে ছিল যে, লোকে বলতো ডালিমের রস, এক গেলাস খেলেই মনপ্রাণ জুড়ায়। তখন বুবির জোয়ানীকাল। প্রত্যেকটিতে আধ মণ করে পানি ধরে, এমন দুটো তামার কলসী দুই

কাঁধে নিয়ে হনহন করে চলে আসতো, একটুও ক্লান্তি বোধ করত না। আফেন্দি ছিল গ্রামের সেরা লাঠি খেলোয়াড়। বিয়ে হওয়ার দু'বছরের মধ্যে স্বামী মারা যাওয়ায় বুবিকে থাকতে হত একলা ঘরে। এক অমাবস্যার রাত্রে বাঁশের দরজাটা কেটে ঢুকে আফেন্দি বসে গিয়ে ওর বিছানায়। তার নিশ্চয় কু-মতলব ছিল। বুবি টের পেয়ে খপ করে ধরে ফেলে তার কব্জিতে, এরপর দাঁড়িয়ে উঠে এক ধাক্কায় ফেলে দেয় তাকে উঠোনে। আফেন্দি অজ্ঞান হয়ে যায়। বুবি বাতি জ্বেলে বাইরে এসে দেখে, সে চোখ উলটিয়ে পড়ে আছে। পরে তেলপানি দিয়ে যত্ন করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো তার। বলল, আফিন্দা, এই তাকত লইয়াই আইছিলি বুবির কাছে!

এই সব কাহিনী বুড়োদের অনেকের মনে আছে।

সামনে একটি বড় ছাউনি। তার পাশ দিয়ে পা'য়ে-হাঁটা পথ। ছাউনির আশেপাশে ঘন আম বন। ডালপালার ফাঁক দিয়ে ওপরে উড়ছে ধোঁয়া, যা' দেখা যায় বহু দূর থেকে। আমবনটি গ্রামের বাইরে হলেও, কাছাকাছি। ওর একদিকে কয়েকটি পাকা ভিটি, কিন্তু ওপরে ঘর নেই। পোড়া কাঠ, আসবাবপত্র, কাগজের স্তূপ ইতস্তত ছড়ানো। একেক জায়গায় কালো হয়ে জমেছে ছাই। দেখলেই বোঝা যায়, ঘরগুলো বেশিদিনের পোড়া নয়।

একটা আমগাছের নিচে এসে সুন্দরী লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল। গাছের ছায়ায় ফুরফুরে হাওয়া—আরাম লাগছে। লাঠিটা গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রেখে, ও বসে একটা শিকড়ের ওপর। আরেক খিলি পান খেয়ে নেয়া যাক। কোমরে গোঁজা পানের থলেটা ঝুলছে, এমন সময় ছাউনির ভেতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে আসে। গায়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবী, চোখে চশমা। পরনে শাদা ধুতি। চেছে কামানো থুতনিতে খুরের দাগ। কোটরে বসে যাওয়া তার দুই চোখে তীক্ষ্ণ সন্ধানী চাউনি। বেড়াল যেভাবে ইঁদুর ধরতে যায়, তেমনি সতর্ক পায়ে এগিয়ে আসছে লোকটা। চতুর্দিকে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই, কেবল দেখা যায় গ্রামের প্রান্তে কতকগুলো ছেলে মেয়ে বসে বসে জটলা করছে। মাঠও শূন্য। ধানক্ষেতগুলো দুপুরের রোদে হেলছে দুলছে হাওয়ায়। লোকটা কাছে এসে জুতোয় একটা শব্দ

করে ডাকলো,—এই বুড়ি!

কেডা তুমি? মুখ নিচু রেখেই থলে থেকে পান-সুপারি খুলতে খুলতে জিগগেস করে সুন্দরী। গলার স্বর ঠাণ্ডা, আর গম্ভীর।

বুড়ির কথা বলার ধরন দেখে বিকৃত হয়ে উঠে লোকটার মুখ। মনের ভাবটা দমিয়ে রেখে বলে, আমি কেডা তা পরে জানতা পারবা। আও, তোমার লগে কিছু কতা আছে।

পানের থলেটা উরুর ওপর রেখে এইবার সুন্দরী মুখ তুলে চায়। মিটমিট করে ভালোরূপে দেখলো, মুখটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। কাছারির নায়েব নাতো? কিন্তু তার সঙ্গে কি কথা থাকতে পারে? সুন্দরী জিগগেস করলো, আমার লগে আবার কি কতা? অনেক দূর যাওন লাগবো। দেরী করতাম পারি না।

লোকটা হাত নেড়ে আশ্বাস দিয়ে বলে, না, একটুও দেরী অই ত না।

তাহলে কও হুনি।

আসল কথা পাড়বার আগে খাতির জমাবার জন্যেই যেন লোকটা জিগগেস করে, অত তাড়াতাড়ি যে। তুমি কই যাইবা?

যাইয়াম আমার মার বাড়ি, আংকাপাড়া। সুন্দরী পান মুখে ঠেসে দেয়।

লোকটা হাসে, ভাবে, সত্তর বছরের বুড়ি, তার আবার মায়ের বাড়ি। আড়াই মাইলের দূরত্বটা যেন কিছুই নয়, এমনি ভাব দেখিয়ে বলে, ও। তা আর কদ্দূর। লও যাই।

সুন্দরী বিরক্তি প্রকাশ না করে উঠে দাঁড়াল। লোকটা আগে আগে চলে, আর ও তার পিছনে। তাঁবু কাছেই, রাস্তা থেকে হাত বিশেক দূরে। সেখানে ইট দিয়ে তৈরী চুলোর ওপর বড় ডেকচি চাপিয়ে কি রান্না করছে একজন। ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল, তিনজন তাদের দিকে চেয়ে আছে। ওদের হাতে কি এসব? বন্দুক না? ওগুলোর মাথায় ছুরির মতো ধারালো কি সব চকচক করছে। হা, এতো ছুরিই দেখা যাচ্ছে। সুন্দরীর বুকের ভেতরটা হঠাৎ ছাৎ করে ওঠে। তা'হলে না জেনে সেই ভয়ংকর জায়গায় এসে পড়েছে? গতকাল সে চাল তুলতে গিয়েছিল অন্য গ্রামে, ফিরে এসে রাত্রে

শুনেছে সৈন্য আসার কথা। অনেকের সঙ্গে আসার পথে দেখা হয়েছে, অথচ এখানেই যে ওরা তাঁবু গেড়েছে কেউ বলে দেয়নি। বলে দিলে হয়তো সে অন্য পথে যেত। কিছু দেখাও যায় না। যাক্ ভয় করে লাভ নেই। শত্রু হলেও এরাও তো মানুষ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে লোকটা জিগগেস করল, কাছারি-ঘর কেডা পুড়াইয়াছে—এ-সম্বন্ধে তুমি কি তা জান?

কেডা আগুম লাগাইয়াছে তা আমি কেমনে কইয়াম। হেদিন রাইতে দেখি আগুন জ্বলতাছে, আসমানডা এক্কেবারে ফর্সা অইয়া গেছে। হুনলাম, আগুন লাগছে কাছারি ঘরে। ভাবলাম, বালাই অইলো।

পানের রসের ঢোক গিলে বলতে থাকে সুন্দরী, আগুন লাগাইব না? পরজার কইলজা পুইড়া লইছে না নায়েব সয়তানডা।

থাক এসব কথা হুনতাম চাই না! ধমকের সুরে লোকটা বলে, যা জিগাইছি তার জওয়াব দেও।

ধমকাও ক্যারে? মনে করছ আমি তোমারে ডরাই? হক কতা কইয়াম, ডরাম ক্যান।

ঠিক কতা.কইছ। লোকটা কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে, তুমিত খুব পান খাও,—না?

সুন্দরী একটু ঠাণ্ডা হয়ে জবাব দিল, হ। পান আমার খাওন লাগে। অহন ভাত বেশী খাইতাম পারি না।

লোকটা জিগগেস করে, ভাত কেডা খাওয়ায়? রোজগারী পোলা আছে?

না। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুন্দরী বলে, মাইনষে দিলে খাই, না দিলে না খাই।

অহন পড়তি বয়সে অত কষ্ট কইরা লাভ কি! লোকটা তার দিকে নুয়ে ফিসফিস করে বললো, নামগুলা কইয়া দেও। তোমার কপাল ফিরাইয়া দিয়াম।

কেমনে?

বুড়ো আঙুলের সঙ্গে তর্জনীটাকে ছটকা মেরে বললো, টেহা

পাইবা, টেহা।

সুন্দরী কোন কথা বলল না। ক্ষণিকের জন্যে রাঙা হয়ে ওঠে তার ঝাপসা চোখ জোড়া। তাকে নীরব দেখে নায়েব বলতে থাকে, তোমার কোন ভয় নাই। তোমাকে কেউ কিছু করতে আইলে—ওই দেহ।

নায়েব বন্দুকধারী তিনজন সেপাইর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় সুন্দরীর কাছে। সে চুপ হয়েই থাকে। চোখে বেশী দেখতে পায় না, তবু মনে হয়, তার দৃষ্টি এই আমগাছের ছায়া, ওই ধানখেত ভরা মাঠ, ঝিলিমিলি হাওয়ার স্রোতে আর মাঠের শেষে তাল গাছের মাথা ছাড়িয়ে দিগন্তে মিশে গেছে। থোকাথোকা শীষ নিয়ে ধানখেতগুলো দুললো, পেঁজা তুলার মতো একখণ্ড সাদা মেঘ দক্ষিণ থেকে উত্তরে উড়ে চলে, আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে আনলো সুন্দরী। তার মুখে পান চিবানো বন্ধ হয়ে গেছে।

কি কও না যে কিছু? আর ভাবতে অইব না। কেউ তোমার আপন নাই তো?

না, আপন না। সুন্দরী বলে, তবে নামগুলান ভুইলা গেছি। নামগুলা কইয়াম। কইয়াম পরে।

লাঠিটা হাতে নিয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে উঠে হাঁটতে শুরু করে সে। নায়েব পিছন থেকে ডেকে বলে, মনে থাকে যেন।

আধ পাকা একটি ধানখেতের ধারে এসে থমকে দাঁড়াল, কিসে যেন তাকে পিছন দিকে টানছে। মনটা এলোমেলো হয়ে গেছে তার। সে যাবে নাকি? কিন্তু আজকে উদ্দেশ্য করে রওয়ানা দিয়েছে, মায়ের বাড়িতে না গেলে যদি কোন অমঙ্গল হয়? ওদের রুহ বদদোয়া দিতে পারে! পাশাপাশি বড় কাঁঠাল গাছের নিচে বাপজান ও মায়ের কবর। ঘন সবুজ ঘাস ও লতাপাতায় জড়ানো। মায়ের বুকের সোহাগ এখনো যেন ফুল হয়ে ফোটে, বাপজানের আদরের ডাকটি কানে এসে বাজে; মায়ের বাড়ির পথে পুকুর ঘাটে, আমবনের তলায় তার শৈশবের কত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, মাসে দু তিনবার গিয়ে কবরের পাশে বসে সেগুলো আবার মনে গেঁথে আসে। মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, মনে

হয়, সে যেন সেই ছোট্ট খুকিটি, পরনে রঙের ছোপ লাগানো শাড়ি, কানে ফটিকের দুল, গলায় আধুলি ছড়া। হঠাৎ চৈতন্য ফিরে এলে নিজের জন্য করুণায় মনটা ভিজে যায়।

বাপজানের মৃত্যুর কথা মনে হলে এখনো তার চোখ জ্বলে ওঠে। তিনি ছিলেন জাতচাষী। মাটির গতর, মাটির সঙ্গেই মিতালি। সেবার ছিল আকালের বছর, শিলাবৃষ্টিতে জমিজমা সব ভেসে গিয়েছিল। ইচ্ছে থাকলেও মহাজনের খাজনা দিতে পারেননি। একদিন কাছারী থেকে পাইক পেয়াদা এলো, ঢোল বাজিয়ে জমিজমা সব নীলাম ডেকে চলে গেল। বাপজান সহজে রাগতেন না। তাঁর মেজাজ ছিল এমনি ঠাণ্ডা। কিন্তু এই সঙ্গে অন্যায়ও মুখ বুজে সহ্য করতেন না। সত্যের জন্যে জান কোরবান করতে তাঁর আপত্তির কিংবা দ্বিধার কারণ থাকত না। তিনি ওদেরকে মানা করলেন, বাড়ির সীমানায় দাঁড়াতে বললেন, যেমন করেই হোক কয়েকদিনের মধ্যে খাজনা চুকিয়ে দেবেন। কিন্তু ওরা মানা শুনলো না। উলটে চশমখোরের মতো কথা বলতে লাগলো। বাপজান আর স্থির থাকতে পারলেন না। একটা বাঁশ হাতে নিয়ে ছুটে গেলেন। ওরা- ছিল দলে ভারী। কাজেই তিনি ওদেরকে কাবু করতে পারলেন না।

বাপজান ওদেরকে মারতে পারেননি, কিন্তু ওরা তাকে মেরেছিলো। রাত্রে পাড়াপড়শী যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ছয়-সাতজন পেয়াদা লাগিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এমন মারা মেরেছিল তিনি আর সে ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি। তাঁর বুকের ওপর শক্ত কাঠ রেখে সাতটি জোয়ান মানুষ দিয়ে চাপা দেয়া হয়েছিলো। অবশ্য পরদিন গ্রামের মাতব্বরদের তদবিরে তিনি ছাড়া পেয়েছিলেন, কিন্তু এরপর আর বেশীদিন বাঁচেননি। লোকে বলে, চাপা খেয়ে তার কলজাটা থেৎলে গিয়েছিল।

জীবনের অনেক ঘটনা বুবি ভুলেছে, কিন্তু এইটি ভুলতে পারেনি। তার বুকের তলায় একান্তে একটা বিষাক্ত ঘৃণা সে পুষে রেখেছে। সামান্য কারণেই তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

মায়ের বাড়ি থেকে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেলো। আবছা

অন্ধকারে ধানখেতের আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার ফিরে আসে তাঁবুর কাছে। আমগাছের নীচে অন্ধকার। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে কতক্ষণ চেয়ে থাকার পর ছাউনিটা চেনা গেল। তাঁবুর ভেতরে মিটমিটে আলো। তেরপলের ফাঁক দিয়ে তার একটি ফালি বাইরে এসে পড়েছে। বাইরে পাহারা থাকতেও পারে, কিন্তু আপাতত দেখা যাচ্ছে না। সুন্দরী পা টিপে টিপে তাঁবুর কাছে গিয়ে কান পেতে শোনে, ভেতরে মৃদুস্বরে আলাপ আলোচনা চলছে। ফাঁক দিয়ে চকিতে একটু চোখ বুলিয়ে দেখল, খাকি পোশাক পরা অনেক মানুষ। তাদের সঙ্গে আছে সেই লোকটা।

হঠাৎ একটা কথা কানে বাজতেই শিউরে উঠল, সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। লাঠি ঠুকে ঠুকে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল গ্রামের দিকে।

পাড়ায় কয়েক বাড়ি পর-পর লোকের জটলা। ছেলে বুড়ো সকলের এই একই আলোচনা, সৈন্য এসেছে। এখানে ওখানে এই একই কানা-কানি। কি জানি কি হয়। কাছারিতে কিভাবে আগুন লাগল, কেউ যেন তা জানে না। ওরা শুনেছে, নায়েব মশাই নাকি মোমবাতি জ্বালিয়ে কি একটা কাজে বাইরে গিয়েছিল। মোমবাতিটা পুড়তে পুড়তে কাপড়ে লাগে, এর পর দমকা হাওয়া পেয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে; যে ভাবেই লেগে থাকুক, গ্রাম থেকে কেউ যে আগুন নেভাতে যায়নি একথা ঠিক। ওরা পথে এসে দেখেছে, আর হৈ হৈ করেছে। নায়েব শয়তানটা এর সুযোগ নিতে পারে তা তখন কারো মাথায় ঢোকেনি।

পাড়ার একপ্রান্তে ফজর আলি প্রধানের বাড়ি। তার উঠোনে লোকের আনাগোনা বেশি। নারকেলের ডাবা থেকে মুখ তুলে প্রধান বলল, মিয়ারা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো। নইলে ভোগান্তি আছে।

ভয় কি চাচা, আমরা থাকতে দেহি কোন্ কোন্ হালা আইয়ে। রাম দাওগুলো বার কইরা রাহেন। বাড়াবাড়ি করলে ভাতিজাদের কল্লা রাইখা দিয়াম।

ফজর আলি প্রধান চিন্তিত ভাবে বলে, রামদাও দিয়া কিছু করন যাইব না। তুই কাছে যাওয়নের আগেই বন্দুক দিয়া শেষ কইরা দিব।

জব্বার জবাব দেয়, মরি যদি দুই একটা না লইয়া মরতাম না।

কিন্তু মিছামিছি মইরা তো লাভ নাই? হুঁকোটা বাড়িয়ে দিয়ে ফজল আলি প্রধান বলে, আগুনডা লাগাইলো কেডা? দুই একজনের লাইগা হগলতে কষ্ঠ পাইবাম।

একেক সময় উঠানের আলোচনা গরম হয়ে ওঠে, বাইরে বড় বড় কথা বললেও সকলের মনেই কিসের যেন ভয়। একজোট হয়ে দাঁড়ালে মুষ্টিমেয় লোক কিছুই করতে পারবে না, তাদের হাতে থাকুক না বন্দুক। তবু গ্রামের একটি লোকেও কেন যে সবাইকে নিয়ে সাহস করে দাঁড়াতে পারছে না, তা বোঝা মুশকিল। নিজের ঘরের ভাত খেয়ে অনর্থক ফ্যাসাদ করতে হয়তো প্রস্তুত নয় কেউ।

কথাবার্তা চলছে এমন সময়ে সুন্দরী উঠোনে এসে হাজির। এত পথ অন্ধকারে কেমন করে হেঁটে এল তাজ্জব লাগে ওর। কেরোসিন কুপির আলো মুখে পড়তেই অনেকে চাইল তার দিকে। ফজর আলি প্রধান জিগ্‌গেস করল, বুড়ি কইথে আইলা?

হে কতাই কইতাম আইছি। সুন্দরী হাতের লাঠিতে ভব দিয়ে বলতে থাকে, আৎকাপাড়া থে আইবার সময়, তাম্বুর কাছে গেছলাম। হুনি, তারা পরামিশ করতাছে আজগা রাইতে গেরাম ঘেরাও কবব।

ঘেরাও করব! হঠাৎ যেন কাঁপল সবাই। তাকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করতে লাগল, তারা কয়জন?

নায়েবডা লগে আছে?

বন্দুক না, আর কিছু?

সুন্দরী একমুখে সকলের জবাব দিতে পারে না। হাত নেড়ে জোরে জোরে বলে, তোমরা হগলতে বইয়া পড়। আমি বড় কাইল, সব কতাই কইয়াম।

ঠেলাঠেলি করে বসে সবাই। ঘর থেকে সুন্দরীকে একটা পিঁড়ি আনিয়ে দেওয়া হল। ধীরেসুস্থে এক খিলি পান খেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করে সে। সমস্ত আসর চুপচাপ। পরে উঠল একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন। কিছুক্ষণ আগেও যারা লাফালাফি করছিল, তাদের মুখ থেকেও রা সরেনা কোন।

অহন কি করবার কর। পলাইলে মেয়েদের মানইজ্জত থাকব না, কইয়া দিলাম। সুন্দরী উঠতে উঠতে বলে, আমি ঘরেই থাহুম। দেহি আবাগীর বেডারা কি করতে পারে।

কথাটা কানাঘুষার মধ্যে দিয়ে সমস্ত গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেল। যারা খায়নি, তারা খাওয়া দাওয়া সেরে নেয় তাড়াতাড়ি। বাইরে ছিল যারা, তারা ঘরে আসে। সবাই পরামর্শ করে কয়েকটি বাড়ি পর পর একেকটি ঘর ঠিক করে নেয়। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে সেই ঘরে গিয়ে জড়ো হয় অন্যান্য বাড়ির মেয়েরা। পুরুষদের কেউ কেউ গিয়ে শোয় ঘরের চালের ওপর বিছানা পেতে, কেউ কেউ চৌকির নিচে আর বেশির ভাগ চলে গেল নৌকায়, এবং নদীর ওপারে। বুকের কলজে পিঠে বেঁধে কেউ কেউ নিজের ঘরেই শুয়ে থাকে। ফজর আলি প্রধানের কথাবার্তাগুলো কেমন রহস্যপূর্ণ, তার মনের ভাবটা কি, পরস্পর আলোচনা করে ওরা ঠাহর করে উঠতে পারল না।

বাড়ির পিছনে গোরস্থানের কাছে একটা টিলার ধারে বসে আছে আয়নদ্দি এবং তার সঙ্গে আরো ছয়জন। অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যাচ্ছে না। ফিসফিস করে কথা বলছে ওরা। কিছুদিন আগে আয়নদ্দির সঙ্গে নায়েবের ঝগড়া হয়েছিল মুর্গির দাম দিয়ে, বংশ তুলে গাল দয়ায় সে একটি থাপড় মেরেছিল তার গালে। এই গ্রামে চারশো ঘর প্রজার মধ্যে আড়াইশ ঘরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করেছে নায়েব, বকেয়া খাজনা পরিস্কার করছে না বলে। অভাবের বছর, সকলে হাঁতেপায়ে ধরে পড়েছিল, হাল খাজনাটা দিয়েই যেন খালাস পায়। কিন্তু জমিদারের ভাগ না দিয়ে জমি দখলে রাখা চলে না।

ইতিমধ্যে এদের সাতজনের জমি দখল করা হয়েছে। পালটা মামলা করার সংগতি নেই, তাই একতরফা রায় হওয়া সত্ত্বেও ওরা চুপ মেরে থেকেছে। গম্ভীর গলায় শবদরালি বলল, আমরা যদি পলাইয়া থাহি তাইলে গেরামের মাইনষের উপরে বেশি অত্যাচার করব।

এতো হাচা কতা।

শবদরালি জিজ্ঞেস করে, তাইলে কি করবা ?

সব চুপ হয়ে থাকে। সত্যি, এখন কী করন যায় ?

আয়নদ্দি শুনতে পেল, বাড়ির ভিতরে ঢুকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থেকে ওদেরকে বলে, তোমরা বও। আমি একটু আই।

আয়নদ্দি বাড়িতে এসে দেখে, উঠোনে দাঁড়িয়ে সুন্দরী বুড়ি। কোন ভূমিকা না করে সুন্দরী বললো, আয়নদ্দি তোরা চইলা যা গাঙের ওপারে।

আমরা গেলে গা কি বালা অইব? আয়নদ্দি জিজ্ঞেস করে।

খুব বালা অইব। নাইলে তোদের কপালে অনেক দুঃখ আছে।

আয়নদ্দি কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থেকে বলল, আচ্ছা দেহি কি করা যায়।

ওখান থেকে ফিরে এসে পাশের বাড়িতে আগুন আনতে গেল সুন্দরী। ও ঘরেও পুরুষ মানুষ কেউ নাই। দু'বছর ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে কিছুদিন আগে মরেছে জুম্মন। বৌটা বাড়ি বাড়ি ধান ভানে আর এভাবেই কোনমতে আত্মাটা বাঁচিয়ে রেখেছে। কাছাকাছি বাড়ি নেই, সুখে দুঃখে বুড়িই তার একমাত্র ভরসা। ঘরে ঢুকলে বাতাসি মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে, কিগো নানি এতক্ষণ কই ছিলে?

হ্যা লা বইন, আর কইস না। সুন্দরী সরাসরি জানতে চায়, খাওয়া-দাওয়া করছস?

হুঁ করছি। দুপুরের একমুঠ ভাত আছিল। তাই খাইছি।

তাহ'লে ল' যাই আমার গরে। একলা এইহানে থাহিস না।

ক্যান, আবার অইলো কী? বাতাসি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল।

কাটা-কাটা কথায় ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়ে দিয়ে সুন্দরী বলে, তুই আ। আমি যাই।

কেরোসিন সব সময় পাওয়া যায় না। মোমবাতির দাম সস্তা। গতকাল একটা মোমবাতি চেয়ে এনেছিল বসিরদ্দিন দোকান থেকে। আগুন এনে মোমবাতিটা ধরিয়ে পিঁড়ির ওপর তা বসিয়ে দেয় সুন্দরী, ঘরের মেঝেয় একটা হোগলা পাতা। তাতে জোড়াতালি দেয়া দু'টো কাঁথা ও একটি ময়লা বালিশ। উনুনটা এক কোণায়, তার পাশে দু' তিনটা মাটির পাতিল। ঘরটা ছন দিয়ে ছাওয়া হলেও এখনো বেশ শক্ত

আছে, অন্তত এবারের জন্য তুফানের ভয় নেই। তাছাড়া দরজার ওপর তেনা দিয়ে মুখ বাঁধা ঘটির ভিতরে যে তাবিজটা আছে তা খুব সজাগ। মহেশপুরের কাসেম খন্দকারের কাছ থেকে আদায় করে এনেছে তাবিজটা। যতদিন তা দরজায় থাকবে কোন বিপদ আসতে পারবে না ঘরে।

পাতিলে ভাত ছিল না। এত রাত্রে উনুন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে প্রবৃত্তি হল না। হাড়িতে চাল আছে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। সুন্দরী বেড়ার কাছে গিয়ে পিতলের গেলাসটায় পানি ভরে পেট ভরে খেল। একটা রাত পানি খেয়েই কাটিয়ে দেওয়া যাবে। রাত্রে তো আর কাজ করতে হয় না। হাঁটতেও হয় না। ঘুমিয়ে পড়তে পারলে খিদের কথা ভুলে যাবে।

নানি, দোর মেল গো। বাতাসী এসে ডাক দেয়।

ঠেলা দে। খোলাই।

বাতাসী ভীষণ ভড়কে গেছে। মুখের দিকে চেয়ে সুন্দরী বুঝে ফেলে ওর মনের অবস্থাটা। থলথলে মুখে হেসে বলে, পাগলি, অত ডরাস ক্যান, আমি তো আছি। কিছু করতে আইলে, এই দেখ।

বালিশের নিচে রাখা দাটা তুলে দেখায় সুন্দরী। বাতাসী জানে, নানির পাঁচসেরি কলজে। তাই সে অবাক হলো না। পিড়ির ওপর মোমটা গলে পড়ছিল। মোমের আগুনে এত তেজ যে, আঙুল কাছে নেয়া যায় না। অথচ তার আলো কত স্নিগ্ধ। সাদা। আলোয় নানির ভাঁজপড়া মুখটা ভালো লাগছে বাতাসীর। কোচকানো রেখাগুলো গোপন স্নেহের প্রকাশে নরম।

দু'জনে শোয়ার পর বাতি নিভিয়ে সুন্দরী বলল, যাদ আলাপ পাস আমারে ডাক দিস। কেমন?

আইচ্ছা। বাতাসী জবাব দেয়।

বাতাসীটা ভারী ভাবপ্রবন। কোন জিনিস তার কাছে খারাপ লাগলে অনেক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে তাকে সে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে এমনি তার কল্পনা শক্তি।

নানাকথা ভেবে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না তার চোখে, অথচ

নানি বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওর মগজের ভিতরটা সা সা করতে থাকে। বাইরে কারো পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না? অনেকক্ষণ কান খাড়া করে রেখে বুঝতে পারল, এ তার মনের ভুল। কাত হয়ে ওপর কান বাঁ হাতে বন্ধ করে নীচের কানটা বালিশে চেপে রাখে। কোন অনাবশ্যক শব্দ ও শুনতে চায় না।

কতক্ষণ পর জানে না এক সময় বাতাসী দেখে দুয়ার ভেঙে বিকট চেহারার দুটো লোক ঘরে ঢুকছে। কালো কালো হাত বাড়িয়ে তাকে যেন ধরতে আসছে।

নানি, নানি, বাতাসী চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ধর ফর করে জেগে ওঠে সুন্দরী। বলতে থাকে, কি লো, কোন হারামজাদা। দেহি, দাওডা বার কর।

মুহূর্তের মধ্যে দা হাতে নিয়ে সুন্দরী এগিয়ে যায় দরজার দিকে। দেখল দরজা ঠিকই আছে।

খিলটা মজবুত করে আঁটা। বাইরে কারো সাড়া শব্দ নেই।

বাতাসী বাতি জ্বাল। সুন্দরী জোরে জোরে অদেখা শত্রুর উদ্দেশ্যে বলেঁ, দেহি হতীনের পুত, কই গেছে।

চোখ কচলাতে কচলাতে এত দুঃখেও বাতাসীর হাসি পায়। উঠে বসে বলে, আগো নানি, আমি খোয়াব দেখছিলাম।

ও, খোয়াব। আমি ভাবছিলাম সিপাই আইলো বুঝি।

দুয়ার খুলে বাইরে এসে দেখল, দুপুর রাত। জ্বলজ্বলে তারাটি ঠিক মাথার ওপর। চারদিক নিঝঝুম। আসমানে অনন্ত শান্তি বিরাজ করছে। উঠোনের চারপাশটা ঘুরে দেখে এসে, বাতাসীকে জড়িয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে সুন্দরী। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকানো শুরু হল।

অনেক রাত্রে শুলেও, ভোররাতে বিছানা ছেড়ে ওঠা তার অভ্যাস। বাঁশঝাড়ে শালিকের কিচিরমিচির শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরীর চোখের পাতা খুলে গেল। রাত পোহায়ে এসেছে। তাহলে আজকে আসেনি সৈন্য?

চোখ কচলিয়ে বিছানায় উঠে বসেছে এমন সময় দরজায় আঘাত

শোনা যায়। কাপড়টা ভালোমতে পেঁচিয়ে পড়ে, দা হাতে নিয়ে দরজার খিল খুলল। তাহলে এসেছে এতক্ষণে ?

গ্রামটা সৈন্য দিয়ে ঘেরাও করিয়ে দশ বারটা বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধান করছেন বড় দারোগা। সুন্দরীর হাতে অস্ত্র দেখে তাকে জোর করে ধরবার জন্যে পুলিশদের আদেশ দিলেন।

একটা মানুষকে ধরতে এতগুলো লোকের বেশিক্ষণ লাগে না।

তবু অনেক ধস্তাধস্তি হল। উত্তর দিকে বাঁশের দরজাটা ভেঙে তিনজন ঘরে ঢুকে যখন তাকে ধরে ফেলল, তখন একটা পুলিশকে কোপ মেরেছিল সুন্দরী। সে আঘাত লাগেনি। বরং উলটে বেয়নেটের খোঁচা লেগেছে তার হাতে।

তাকে উঠোনে ধরে আনলে সুন্দরী দেখল, কেবল দারোগা পুলিশ নয়, আরো অনেক লোক। কয়েকজনকে হাতকড়া লাগিয়েছে। ওকে ধরে সামনে আনতেই ফজর আলি প্রধান বলে উঠল, দেহেন হুজুর। এই বুড়িই সব কিছুর মূল।

সুন্দরী কটমট করে তাকায় প্রধানের দিকে। তার চোখদুটো ঝাপসা, তবু যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে পুতুলি থেকে। কী বলছে বেঈমান। ও না দাড়ি রাখছে ? সব সময় টুপি মাথায় রাখে ? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ? সুন্দরীর থলথলে মুখটা কাঁপতে লাগল !

এই বুড়ি কাইল রাইতে আইয়া গ্রামে খবর দিছে, আইজ সহালে আপনারা আইবেন। তাই না রাইতে সব হালায় পলাইয়া গেছে বাড়িত থে। আর যারা বাড়িত থাকবো, হেরারে কইয়া রাখছে খন্তি, দাও কুড়াল ঠিক কইরা রাখতে যাতে আপনেরারে মারুন যায়। আমরার কোন দোষ নাই, হুজুর। হাতজোড় করে ফজর আলি প্রধান বলে, জমিদার আমরার বাপ মা! আমরা কি তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি ? সব নষ্টামির মূলে ঐ বুড়ি।

দারোগাবাবুর কিছু বলার আগেই হঠাৎ সুন্দরী খনখনে গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, থামলা ক্যান ? অহনোই থামলা ক্যান তুমি ? কইয়া যাওনা, আরো কইয়া যাও—জমিদাররে কুত্তা ডাকছি, নায়েবরে শয়তান ডাকছি। সব কও—চেঁচাইয়া কও।

এমন সময় আয়নদ্দি, শব্দরালি ওরা সাতজন ভীড় ঠেলে এগিয়ে এল। আগে তাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। নিজের থেকে এদের কাছে আসার মানে স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়া, এ জানে ফজর আলি প্রধান, তাহলে কেন তারা এল? প্রধান ঠাহর করতে পারে না কিছুই।

সামনে আসতেই সুন্দরীর চোখ যায় তাদের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে ও শিউরে ওঠে। এত মানা সত্ত্বেও কেন এসেছে এখানে বোকার দল? নিজেদের জানের না হয় ভয় নেই কিন্তু কাচ্চা-বাচ্চাগুলো? কাচ্চা-বাচ্চাগুলোর অবস্থা কি হবে? ওরা যে না খেয়ে মরবে।

আয়নদ্দি দারোগাব কাছে কি বলতে যাচ্ছিল, সেই মুহূর্তে তার চোখে এসে পড়ে সুন্দরীর অগ্নিদৃষ্টি। সে বুঝল এর অর্থ কি। কিন্তু যারা সত্যিকারের নির্দোষ তারা কেন শাস্তি পাবে? তবু আয়নদ্দি কিছু বলতে পারল না। শুধু একটু নড়ে উঠে থেমে যায় তার ঠোঁটজোড়া।

দারোগাবাবু। কারোর দোষ নাই। এ হাচা কতা। সবাইরে আপনে ছাইড়া দ্যান। ভাঁজ পড়া শান্ত মুখটা তুলে ঠাণ্ডা গলায় সুন্দরী বলল, আগুন আমিই লাগাইছিলাম।

উপস্থিত সকলে চঞ্চল হয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। আয়নদ্দি ব্যাকুলভাবে আবার কি বলতে চায়, কিন্তু এবারও থেমে গেল তার শাসন ভরা কঠিন দৃষ্টির সামনে। সবাই দেখল, বুড়ি সুন্দরীর হাত থেকে টপটপ করে মাটিতে পড়ছে লাল রক্ত।

দারোগার ইঙ্গিতে পুলিশ হাতকড়াটা এগিয়ে নিয়ে গেল।

দালাল

মিহির আচার্য্য



মিহির আচার্য্যর জন্ম ১৯২৭ সালে উত্তর বাংলায়। তিনি উপন্যাসিক এবং গল্পকার হিসাবে বিশেষ পরিচিত। গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষই তার লেখার প্রধান উপজীব্য। সাহিত্য জীবনের প্রথম থেকেই বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'নীলচোখ' প্রগতিশীল পাঠকমহলে সাড়া জাগায়। তাঁব অনেক গল্প পরিচয়, নতুন সাহিত্য এবং অন্যান্য প্রগতিশীল সাহিত্য পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বহু গল্প ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এবং চেকোশ্লোভাকিয়া হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশে অনূদিত হয়েছে। উপন্যাস ধূসরপদাতিক, সম্রাটের মুখ, দ্বিরাগমন এবং গল্পগ্রন্থ অপরাহ্নের নদী, আজ কাল পরশু বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। তিনি কিশোরদের জন্যও বেশ কিছু গল্প উপন্যাস লিখেছেন। তার কলম এখনও সজীব।

'রাত-বেরাতে কে যায় রে?'

'বুন শেয়াল—'

'আর কে যায়?'

'চৌকিদার বহুন্নু —'

'আর কে যায় উটা?'

'লাঠুয়া ঢিপা—'

তারপর গম্ভীরার আসরে একটা মুর্তি হাজির হয়। দরকচা মারা চেহারা, বেঢপ মাথায় নারকেল ছোবড়ার মতো মোটা মোটা-চুল, কাঁধ থেকে ঝোলা লিকলিকে দুটো হাত, পেট মোটা, খুদে খুদে চোখ।

ফি বছর চৈত্র ও বৈশাখ মাসে গম্ভীরার আসরে অন্যান্য গানের সঙ্গে লাঠুয়া ঢিপারও গান বাঁধে গায়েনরা।

দ্বীপচাঁদ ওরফে ঢিপা গাঁয়ের দালাল। পাকা-পোক্ত লোক। আশে-পাশে তল্লাট জুড়ে তার নাম ডাক আছে। এক পুরুষের পেশা। উর্ধ্বতন পুরুষেরা ছিল জাত চাষী। দ্বীপচাঁদ জাত খুইয়ে দালাল বনেছে। এই বৃত্তিতে প্রথম হাতে খড়ি পড়ে ব্রিটিশ প্রভুদের আমলে—বছর পাঁচেক আগে। আকালের সময়। সে এক লোমহর্ষক স্মৃতি—মরা স্মৃতি।

গাঁয়ে গাঁয়ে তখন ভুখা মানুষের মধ্যে ক্ষুধা এক অনিবার্য মিল এনে দিয়েছে। অনশন আর অনাহার জ্বালিয়ে তুলেছে গাঁয়ের লোকদের বুক। চালা ভেদ করে কাচ্চা-বাচ্চার কান্না, বউ-মাগীদের গোরুর মতো ড্যাবডেবে চাউনি। ধৈর্যের শেষ সীমা পার হয়ে আসে ওরা। বাঁচতে হবে—এমনি করে ঘরের মেঝেতে মুখ ঠুকে রক্ত তুলে মরবে না। নিঃশব্দ প্রতিরোধের দুর্বার বন্যা উদ্বেল করে তুললো বুভুক্ষু লোকগুলোকে…। দ্বীপচাঁদ তখন ওই ভুখা মানুষের নেতা। তখন ওর শরীরে তাগদ ছিল, তার বেঁটে খাটো শরীরের গাঁথুনি ছিল লোহার মতো মজবুত, ছোট ছোট চোখের তারায় ছিল আগুনের ঝিলিক। আশেপাশেরগাঁয়ের লোকেদের

জমাট একতা—শপথ-কঠিন জনতার সমুদ্রে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছিল দ্বীপচাঁদ।···কিন্তু দ্বীপচাঁদের একটা দুর্বলতা ছিল—যে দুর্বলতা তার পরিণামে ধ্বংস এনেছিল। জনতার মধ্যে সে এক বলিষ্ঠ মানুষ, ইস্পাতে গড়া এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, কিন্তু একক, বিচ্ছিন্ন দ্বীপচাঁদের ছিল আর এক আলাদা পরিচয়ঃ দুর্বল, ভঙ্গুর আর পরাভূত। চাষীদের মধ্যে গাঁয়ে গাঁয়ে রায় হয়ে গেল, জমিদার পঞ্চাননের গোলা লুট করতে হবে। ওদের হাতে বন্দুক আছে, সেপাই আছে মানি—কিন্তু উপায় কী! জান দিয়ে অধিকার করতে হবে খামারঃ না এ আর সয় না!

তারপর কী হল? দলেরই এক ছোকরা বিশ্বাসঘাতকতা করলো—রাতারাতি খবর দিয়ে এল জমিদার বাড়িতে। আক্রমণ এলো ওই পক্ষ থেকে। অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল প্রজাদের শায়েস্তা করবার জন্যে কয়েক মাস ধরে গাঁয়ের মধ্যে বিভীষিকার রাজ্য সৃষ্টি হল। অত্যাচারের ভয়ে গাঁয়ের জোয়ান মরদেরা পাহাড়ে জঙ্গলে লুকোলো, ঘরে বউ বেটি কেউ রেহাই পেল না আক্রোশ থেকে। তখনো পর্যন্ত ভুখা জনতার নেতৃত্বের রশি ধরেছিল দ্বীপচাঁদ। তারপর হঠাৎ এক অসাবধান মুহূর্তে রাত্তিরে বাড়িতে ঢোকবার সময় আশেপাশে ঘাপটি মেরেছিল সেপাই ধরে ফেললো ওকে।

জমিদার কাছারির অন্ধকার সাজাঘরে তিনদিন তিন রাত হাত পা বেঁধে অনাহারে ফেলে রাখলো ওকে, চার দিনের দিন আর পারলো না। একলা নিঃসঙ্গ দ্বীপচাঁদ দমে গেল, ভেঙে দুমড়ে গেল, হার মানলো। জীবনের বিনিময়ে মাথা বেচে ফেললো সে। দেনার ভারে ভারে সে মাথার সবকটি চুল আজ বিকিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়—দ্বীপচাঁদ মরে গেছে।

তবু···অনেক আশা ছিলঃ রাতারাতি হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে যখন নেতারা দেশের স্বাধীনতা এনে দিলেন, তখন একটা পরিবর্তনের ঢেউ আঘাত দিয়েছিল ওর মনে। পরিবর্তিত পশ্চাদপটের সঙ্গে সেও নিজেকে পরিবর্তন করবে। তার বিক্রীত মাথাকে আবার আকাশের দিকে তুলে ধরবে, সে দেশের মাটিকে ভালোবাসবে, মানুষের ভালবাসা ফের ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু কই স্বর্গে গিয়েও ঢেঁকির ধান

ভানা থেকে অব্যাহতি নেই।

বেশ মনে পড়ছে। কিছু দিন পর থানা থেকে দারোগা সাহেবের জরুরি তলব। ঘাবড়ে গিয়েছিল সে। এতো দিনকার জমানো সমস্ত দালালিপনার কী আজ নগদ হিসেব নিকেশ নেবে ওরা। বেইমানীর চরম সাজা! ভয়ে আতঙ্কে মুশড়ে গেল সে। দারোগার পা জড়িয়ে ধরলোঃ দারোগা সাহেব হামাক সাজা দিয়েন না। হামাক মাফ করেন। হামি ভালো হবো, সৎ হবো, বেইমানি আর কোরবো নি।

দারোগার স্বরে হুমকি ছিল নাঃ আরে ওঠ ওঠ। সাজা পেতে হবে না তোকে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, এবার তুই ভালো হয়ে ওঠ। স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক তুই—এবার তো তোদেরই সরকার।

ঠিক ঠিক। আবেগে চোখে জল এসে গিয়েছিল দ্বীপচাঁদের এবার তাদের ভাবনা কী! কোন দুঃখ-কষ্ট থাকবে না, খাওয়া পরার জন্যে আর মানুষকে লড়াই করতে হবে না, দালালি করতে হবে না।

খাটবে খাবে। জাত চাষীর ছেলে আবার শক্ত মুঠিতে লাঙল তুলে ধরবে। জমি তো তাদেরই!

চোখের জলে আর খুশির রোদে চিক্ চিক্ করে উঠেছিল দ্বীপচাঁদের গাল।

কিন্তু শোন--দারোগা হাত নেড়ে উপদেশ দিয়েছিলঃ দেশ স্বাধীন হল বলে চুপচাপ থাকলে চলবে না। নতুন পাওয়া শিশু রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে আমাদের। তাই তোর কাজ ফুরিয়ে যায় নি। আশেপাশে গাঁয়ের লোকদের গতিবিধি চলাফেরার ওপর নজর রাখতে হবে তোকে। স্বাধীনতা উপভোগ করবার মতো তৈরি হয়ে উঠতে পারেনি দেশের লোক—এমন কিছু করতে পারে যাতে করে আমাদের নতুন রাষ্ট্রের বিপদ নেমে আসতে পারে। তাই সে সব লোকদের ওপর কড়া চোখ রাখতে হবে।

কথা শুনে চমকে উঠেছিল দ্বীপচাঁদ। দারোগার কথাকে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। আবার···আবার সেই পুনর্মূষিকের জীবন। আবার বেইমানি আর দালালি—জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন এক ত্রিশঙ্কু জীবন।

দারোগা দ্বীপচাঁদের ছেলেমানুষি দেখে বাৎসল্য রসে হেসে উঠেছিল : বোকা কোথাকার। স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি লোকের মন বদলে যেতে পারে। এতোদিন যারা প্রকাশ্যে লুঠতরাজ আর হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছিল সেই সব লোকের মতিগতি তো আর রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে যাবে না। দুষ্টু লোক সব দেশেই আছে কি-না, বল ? আর তুই কি বলতে চাস দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে সাধু হয়ে যাবে।থানা পুলিস দারোগা আই. বি. আর কিছুই থাকবে না। তবে বিলেতে দারোগা পুলিস আছে কেন, আমেরিকায় আছে কেন ? ওরাও তো স্বাধীন রাষ্ট্র।

কিন্তু' আবার সেই জীবনের পুণরুক্তি। 'লাঠিয়া টিপার' ছাপমারা কুৎসিত জীবনের বোঝা। না না—আর লয় দারোগা সাহেব। হামাক আর দালালি করতে বলেন না। হামি চাষীর ছেলে। হামার ভাগে যেটুকু জমি উইঠবে, হামি তাই চাষ করবো, খাবো।

দারাগা একটু বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে : কী মুসকিল ! জমি তো-পাবিই। কিন্তু নিজের খাওয়া পরা চুকবার সঙ্গেই তো দেশের কাজ ফুরিয়ে গেলনা। দেশকে দেখতে হবে না, স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে না ?

মূঢ়ের মতো ফিরে এসেছিল দ্বীপচাঁদ । চিড় খাওয়া মনে ঘরের অন্ধকারে নিজেকে গুটিয়ে রইলো কিছুদিন। ভাবলো।

ওর মতো গাঁয়ের অনেক লোকই ভেবেছিল। স্বাধীনতার নতুন বেনো জলের আচমকায় ঢাকা পড়েছিল যতো খানা আর ফাঁকি। শক্ত ডাঙায় পা স্থির করে দাঁড়াতে পারলো মানুষ। স্থির হয়ে, ভাবাবেগ কাটিয়ে, খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারলো পরিস্থিতিকে-পায়ের তলের বনিয়াদকে।

বোকা নিরেট লোকগুলো, মাথা চুলকালো, থুথু ছিটকালো, দাদ চুলকালো, তারপর পরস্পরকে প্রশ্ন করলো : ইটা হইল কী, স্বাধীন হয়্যা পেনু কী। কানাকানি প্রথমে ছাড়া ছাড়া, ছেঁড়া ছেঁড়া, তারপর দানা বাঁধলো অসন্তোষ, বছর ধরে মুখ বুজে থাকার ভারি অসহ্য বেদনায় পাষান অহল্যা মুখর হয়ে উঠতে চাইলো, প্রতিবাদে ফেটে পরতে

চাইলো।

বুড়ো তিনকড়ি অভিজ্ঞতায় প্রাচীন। বহু খাত প্রতিঘাত আর নির্মল স্মৃতির বেদনা জড়িয়ে আছে ওর জীবনের ভাঁজে ভাঁজে। গর্বে ছাতি ফুলিয়ে হুঁকো টানতে টানতে সে সেদিনও হাত পা ছুঁড়ে ঘোষণা করছে নাতির কাছে। আর কী! আর ভাবিসনে। আমাদের গরীব চাষীদের দুঃখু ঘুচবে এবার। এবার তো আমাদের সরকার। কেমন বুলেনি ওরা: জমিদারী প্রথা তুইলা দিবো—বেবাক লোকে খাবা পরবা পাবে, আমরা মুখ্যু হলে কী হয়—হামাদের ছিলাপুলে নাতি নাতনী বিনা প্যায়সায় লিখা পড়া করতেপারবে। হুঁ হুঁ—। সেই তিনকড়ি গোটা কয়েক মাস যেতে না যেতেই। ঘা খাওয়া কুকুরের মতো কেঁমন খিঁচিয়ে উঠলো: ওরে নিপতি—ই কীরে বাপু, ছ্যাবতাকে ডাকতে ই কুন দানো পেনু। জান দিয়ে কুন জানোয়ার আইসে ভর করলো!

গাঁয়ের এই আবর্তের মধ্যে পড়ে দ্বীপচাঁদও ঘুরপাক খেল, হাবুডুবু খেল কিছুদিন। তারপর কী করি, কী করি করে টলমল করছিল— জমিদারের পেয়াদা ধরে নিয়ে গেল একদিন। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে দাঁড়ালো সে।

জমিদার পঞ্চানন গম্ভীর হয়ে আহ্বান জানালো। হ্যাঁ—একী শুনছি দ্বীপচাঁদ? গাঁয়ের লোকেরা নাকি জোট পাকাচ্ছে।

—আজ্ঞে হাত কচলালো দ্বীপচাঁদ।

—শুনছি কী সব হাঙ্গামার কথা বলাবলি করছে ওরা। জমির ধান নাকি সব এবার ওরাই নিবে—

—আজ্ঞে হুজুর, উরা বলছিল: ছ্যাশ স্বাধীন হইছে.জমিতো এখন চাষীরাই পাবে।

হুঁ……স্বাধীনতা মানেই মগের মুল্লুক নয় দ্বীপচাঁদ। ব্রিটিশের আমলে যা ইচ্ছে করেছিল বলে কী এখনো ওসব ডাকাতি চলবে। তারপব আর্যবানী শোনাবার ঢঙে বলেছিল জমিদার: শোন দ্বীপচাঁদ —আমাদের পুরনো মনোভাব দূর করতে হবে।.আজ ইংরেজ নেই,

সবাই একই দেশের লোক। এখন আর পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ করলে চলবে না।...দুষ্ট লোকেরা সাজা পাবেই। তুমি ভাল লোক—তাই তোমাকে আমার দেখাশোনা কর্তব্য। শোন...

গভীর অবসাদ আর হিমেল রক্তের অনুভূতি নিয়ে ফিরে এসেছিল দ্বীপচাঁদ। সমস্ত রঙ আর কল্পনার পাতলা কুয়াশার জাল টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়েছিল চোখের পর্দা থেকে।

তারপর এক বছরের খতিয়ান। কেটে চলে লাঠ্য়িা টিপার জীবন। পিঠের ওপর যেন এক মস্ত দগদগে ঘা —লোকে দশ হাত দূর থেকে গন্ধে ছুটে পালায় ওর কাছ থেকে। শুধু ঘৃণা আর আক্রোশের স্তূপ জমে ওঠে তাকে কেন্দ্র করে।

বুড়োরা হাসে, করুণা জানায়—যেমন করে করুণা জানায় লক্ষণ সাহার হাড় শুকনো রোম ওঠা মরাটে ঘোড়াটার ওপর। জোয়ান মরদেরা আর করুণা দেখায় না, রক্ত টগবগে ওদের—লাল কম্বল দেখতে পাওয়া ষাঁড়ের মতো ক্ষেপে ওঠে, থুথু ছেটায়, গালাগালি করে ওঠে, 'শালা লাঠ্য়িা—'

আজকাল দিনের আলোতে বেরোতে পারে না সে। অসম্ভব গুমোট ভাব গাঁয়ের আকাশে। গা শিরশির করে, বুকের ভিতর গুরু গুরু মেঘের ডাক। ঈশান প্রান্ত থেকে ভেসে আসা ঝড়ের গন্ধ...তীব্র, তীক্ষ্ণ। তলে তলে এক গোপন, সঞ্চয়ের ইতিহাস প্রস্তুতির পটভূমি। বদলে গেছে লোকগুলো। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে কালো কালো রোদেপোড়া গাঁয়ের মানুষগুলো, একটু করে ইন্ধন যে কোন মুহূর্তে জ্বলিয়ে তুলতে পারে তাদের।

সেদিন রাত্রে দুজন সেপাই নিয়ে দারোগা হঠাৎ দ্বীপচাঁদের বাড়ীতে উপস্থিত হল।

—শুনছি, শহর থেকে বাবুরা গাঁয়ে এসে ঘাঁটি গাড়ছে। তুমি দেখেছো তাদের ?

হ্যাঁ। দেখেছে দ্বীপচাঁদ। আজ হপ্তাখানেক ধরে গাঁয়ের মধ্যে

লুকিয়ে রয়েছে ওরা। রাতের আঁধারে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে ওদের : ওরাও তার মতো রাত্রের যাত্রী। হাঁটুর ওপরে গুটিয়ে তোলা কাপড়, খালি পা, খালি গা, হাতে শক্ত বাঁশের লাঠি আর টর্চ। ঝাড়জঙ্গল কেটে রাতের মধ্যেই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ফিরেছে। কোথাও নির্দিষ্ট জায়গা নেই তাদের।

—সংখ্যায় কজন ওরা ? দারোগা জিজ্ঞেস করলো।

—পাঁচজন। মেয়েও আছে একজন—হ্যাঁ সে মেয়েকেও দেখেছে দ্বীপচাঁদ। বেতের মতো লিকলিকে, কিন্তু মজবুত কালো মুখের ওপর এক জোড়া ঝকঝকে চোখ, মাথাভরা অবিন্যস্ত চুলের পুঞ্জীকৃত ইজারা, ঋজু কঠিন তলোয়ারের মতো দৃপ্তভঙ্গী।কোমরে শক্ত করে জড়িয়ে নেওয়া কাপড়। পুরুষদের সঙ্গেই সমান তালে কাঁধ লাগিয়ে চলেছে।

—কোথায় আড্ডা গেড়েছে ওরা……

মাথা নাড়ে দ্বীপচাঁদ। বলতে পারেনা। কখন কোথায় থাকে কে জানে।

—বেশ। এবার থেকে খুব নজরে রাখবে। লাট কে লাট গ্রেপ্তার করতে হবে, সুযোগ পেলেই সব খবর দেবে থানায়।

ভাল মানুষ নিরীহ গ্রামের পশ্চাতপট দ্রুত পালটে যায়। লোক-গুলোও পরিবর্তনের কুচুকাওয়াজে পা মিলিয়ে চলে। মনের অশান্ত চিন্তা বাইরে রূপ পায়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাজের মধ্যে ফেটে পড়ে।

সমস্ত গ্রামটা যেন মারণমূর্ত্তি ধরেছে। এক দুঃসাহসী অভিযানে মুখর হয়ে উঠেছে।

হরিণখালির বিলদখল করেছে চাষীরা : জাল যার জল তার। ফুর্ত্তিতে:মাছ ধরছে ওরা। জমিদারের সেপাইকে মারধোর করে খেদিয়ে দিয়েছে।

নয়নদিঘির জোতদার বাড়ি থেকে ধান কেড়ে নিয়ে গেছে ওরা।

এক এক রাত্রে খবর আসে হিংস্র শকুনের মতো নখ বার করে।

ক-দিন থেকে আওয়াজ উঠেছে ঃ 'দালালকে হালাল করো।'

এ-কটা দিন ঘুম নেই চোখে দ্বীপচাঁদের। তাকে মধ্যে ফেলে যেন আগুনের একটা বৃত্ত জ্বলে উঠেছে ; পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে ওকে। ভয়ে কেঁপে ওঠে বুকের ভিতরটা। ঢেঁকি পড়ার মতো ধবধব শব্দ বাজতে থাকে হৃৎপিণ্ডে। বাহিরে রাস্তার পাশ দিয়েদ্রুত পদশব্দ। শুকিয়ে ছোট্ট হয়ে ওঠে দালালের মুখ। দারোগা আর জমিদারের অভয় বানীর ওপর আশ্বাস রাখতে পারে না। মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকগুলো, যদি রাত্রে হানা দেয়, আক্রমন করে, দু-মাইল দূরের থানা থেকে সাহায্য বাড়ি আসার আগেই খতম হয়ে যাবে যে।

কালো মিশমিশে রাত। থমথমে পরিস্থিতি।

রাতের পাহারায় বেরিয়েছিল দ্বীপচাঁদ, থমকে দাঁড়ালো রামেশ্বরের ঘরের পিছনে।

বেড়ার ওপর কুঁজো হয়ে দেখতে থাকে সে।

ভেতরে উঠোনে গোল হয়ে বসেছে শহরের বাবুবা মাতব্বর চাষীদের কয়েকজন। মৃদু স্বরে কিসের আলোচনা করতে চলেছে তারা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে অনেকক্ষণ ঃ মেয়েটি পর্যন্ত বসে রয়েছে, একটি হাত গালের ওপর রেখে নুয়ে পড়ে শুনছে। ঠিক। সমস্ত চেতনা যে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠলো দ্বীপচাঁদের মনে। এই মুহূর্তে ছুটে থানায় খবর দিতে পারলে হাতে নাতে সকলে ধরা পরবে।

না-সেও মরিয়া হয়ে উঠেছে, অহরহ প্রাণ হাতে নিয়ে চলাফেরা পারেনা। হ্যাঁ—বাঁচতে হবে একদিন—এই বাঁচবার উদগ্র 'নেশাতেই—মাথা বিকিয়ে দিয়েছিল সে—আজও দেবে।

ছুটে গেল সে, চৌকিদারের বাড়ি। চৌকিদার বাড়িতেই ছিল—সব বৃত্তান্ত শুনে উর্ধশ্বাসে দৌড়ালো থানার উদ্দেশে। এখুনি পুলিস দিয়ে ঘেরাও করতে হবে রামেশ্বরের বাড়ি, সব কটাকে একসঙ্গে গারদে পোরা যাবে।

দ্বীপচাঁদ ফিরে এসে রামেশ্বরের বাড়ির পেছনে ঘাপটি মেরে রইলো।

শোনা যাচ্ছে ভেতরের চাপা কণ্ঠস্বর। গম্ভীর আলোচনা আর প্রস্তুতির কায়দাকানুণ।

দ্বীপচাঁদ পায়ে পায়ে বেড়ার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে লোকগুলোকে আশ্চর্য নরম আর কঠিন। ভাবলেশহীন নির্বিকার ভাবে বৈঠক করে চলেছে ওরা।

হাসলে দ্বীপচাঁদ। এখুনি সবকটা ধরা পরবে। হাজত, জেল। তারপর? কারা উত্তেজিত করে তুলবে পরিস্থিতি, ক্ষেপিয়ে তুলবে ভোঁতা লোকগুলোকে? ব্যাস, থিতিয়ে যাবে অবস্থা বেশ। কিন্তু তাতে কী পাবে দ্বীপচাঁদ? লাঠ়িয়া ঢিপার দালালী; বেইমানীর বখরা? কিন্তু কী মিলছে তাতে—স্থায়ীভাবে কোন্ সমস্যা মিটেছে ওর, খাওয়া পরার কী কোন পাকা বন্দোবস্ত মিলেছে। খড়ের অভাবে ঘরের চাল ছাওয়া হচ্ছে না—সামনে বর্ষায় দুর্দশার সীমা থাকবে না। রোজ সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত—প্রতিটি দিনের সমস্যা জড়িয়ে রযেছে জমিদার বাবু ও দারোগাসাহের প্রতিদিনেব অনুকম্পার উপরে। দিনের পর দিন হাত তোলা জীবন, মুখে দাসত্বেব আর বিনয়েব ছাপ এঁকে জীবনকে ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ানো, পোষা কুকুবের মতো রোজ টুকরো টুকরো মাংস বিলিয়ে শেকলে বেঁধে ফেলা জীবনকে। কই, পারতো না ওরা ওকে একখণ্ড জমি দিতে, পারতো না?

আবার ভেতরের দিকে চোখ ফেরালো দ্বীপচাঁদ। নির্ভাবনায়, নিরুদ্বেগে মিটিং করে চলেছে ওরা। ওরা কী বলে? বাঁচার কথা—ভালোভাবে জীবনধারণ। চাষী জমি পাবে, ফসল ফলাবে। জমিদারি ধ্বংস হবে—অবাধ শোষণের ব্যবস্থাকে খতম করতে হবে, একজোট হয়ে লাগতে হবে তাই, তাই আন্দোলন তাই বেঠক। কী স্বার্থ ওদের? ওই শহরের বাবুদের? কিসের লোভে জীবনকে মাড়িয়ে ফেলে ছুটে এসেছে ওই মেয়েটি। কেন? কেন? কেন?

মস্তিষ্কে আগুন জ্বলে উঠেছে দ্বীপচাঁদের। দালালী জীবনের উর্ধ্বে পুরনো দিনের রেখে আসা জ্বলন্ত স্মৃতি যেন ইস্পাতের মতো ঝলসে উঠেছে ওর মনে। ভুলে গেছে ও—সে দালাল, লাঠ়িয়া।

সেদিনকার চাপা পড়া ঘুমন্ত বিদ্রোহী সর্দার যেন রক্তে গর্জন তুলেছে।

দ্বীপচাঁদ আজ বেইমানি করবে, সত্যিকারের দালালি। মুহূর্তের মধ্যে তীব্র জ্বালায় চিৎকার করে উঠলো সেঃ পুলিস—পুলিস, পালাও ...তারপর ঝড়ের বেগে ছুটে চললো অন্ধকারের ভেতরে।

এবছরও গম্ভীরা গানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল গায়েনরা, প্রচলিত অনুসারে লাঠুয়া টিপারও গান বাঁধা হয়েছিল নতুন কায়দায়—হঠাৎ সব উলটে গেল। ওপাড়ার রামু মুচি এসে খবর দিল লাঠুয়া টিপা আত্মহত্যা করেছে। তার বাড়ির পেছনে পেয়ারা গাছে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে ওর শব।

কাজে কাজেই অনিবার্য কারণে লাঠুয়া টিপার গানটা বাদ দিতে হল।

হাউস

মিহির সেন



মিহির সেনের জন্ম ১৯২৭ সালে বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়, কৈশোর জীবন কাটে পূর্ব দিনাজপুরে। তিনি গল্পকার হিসাবে সমধিক পরিচিত হলেও উপন্যাস, নাটক, বেতারনাটক চিত্রনাট্য ইত্যাদি সবরকম লেখাতেই সিদ্ধহস্ত। ছাত্রজীবন থেকেই বামপন্থী আন্দোলনে সংযুক্ত, মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী। 'পরিচয়', 'নতুন সাহিত্য' এবং বিভিন্ন প্রগতিশীল পত্রপত্রিকায় তাঁর একাধিক গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখায় শহর এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম এবং জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার সংকল্প প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাস 'শেষ তিনদিন', 'কাগজের দেওয়াল' এবং নাটক 'প্রবেশ নিষেধ', 'ইশারা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা 'লেনিনের মা' এবং 'লোকহাসানো লোকটি' এক নতুন ধরণের জীবনোপন্যাস।

অনেকক্ষণ একটানা কেঁদে হাঁপিয়ে পড়ে পোহালু। এখন শুধু থেকে থেকে রেশটুকু চলছে,—ওঁ-ওঁ-ওঁ! খানিক পরে সেটাও থিতিয়ে আসে। এতক্ষণে খেয়াল হয়, বেশ শীত করছে। সময়টা সবে আশ্বিনের শেষ, তবু উত্তরবঙ্গের হাড়-কাটা শীত যেন কাস্তের ধারালো দাঁতে চুপিয়ে যাচ্ছে।

দাওয়ার এককোণে ভাঙ্গা কড়াইয়ের ভেতর থেকে তখনও উষ্ণতা বিলোচ্ছিল গোটা কয়েক অঙ্গার। পোহালু গড়িয়ে সেদিকে এগিয়ে যায়। কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে সেটার পাশে। বেড়ার গা ঘেঁষে।

কান্নার রেশটা আবার শুরু করে নিজের জানানিটা দেবে কিনা ভাবছে—ভেতর থেকে মার গলা শুনতে পেল।

—জাড়ে জমি যাবে নাকি ছোঁয়াটা? মার স্বরে চাপা অনুযোগ। ভিতরে আনিবা না?

—না হয়। বাবার জবাবটাও শুনল।

—কেনে না হয়? অল্যাজ্যটা কি কইছে? সখ হাউষ কার না আছে, কহেন—হামার নাই? তুমার নাই?

নিঃসাড়ে শুনছে পোহালু। ভাল লাগছে শুনতে। মা-টা বড় ভাল! ওর মনের কথাটা একমাত্র মা-ই কিছুটা বুঝতে পাবে।

—থাকবু না কেনে, ফের সীমা থাকিবে তো? না কহেছি হামি কুনোদিন? তা অত বড় ছোয়াটা বুঝিবে না বাপেরটা? না ঘ্যান-ঘ্যান করি মাথাত পোকা খসাইছে। থাক, বাইরেই পড়ি থাক।

পাশ ফিরে শুল বোধ হয় বাবা। মাচার আওয়াজ থেকে অনুমান করে পোহালু।

বলে বটে, কিন্তু নিজের চোখেও ঘুম আসেনা ডোমারের। একটা চাপা অস্বস্তি। কিছুক্ষণ পর আড়চোখে তাকিয়ে দেখে একবার নীলমণিকে। বোঝেনা, সারা দিনের খাটাখাটুনির পর ঘুমিয়ে পড়ল কিনা। নিজের মনেই গজগজ করে ডোমার, দরদ দেখনা, দরদ দেখাবা আসিছে। ছোঁয়াটাক ঘরে আনিলে যেন গিলি ফেলিতাম। মাসীর দরদ।

উঠে বসে ডোমার। ঝাঁপটা খুলে বাইরে যায়। প্রথমে একটু

অবাকই হয়, ছেলেটা গেল কোথায় ? তারপর হঠাৎই আবিষ্কার করে আগুনের পাশে। হাঁটুর সঙ্গে মাথাটা ঠেকিয়ে তালগোল পাকিয়ে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে শীতে কেঁপে উঠছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় উড়ে আসা গুঁড়ো গুঁড়ো ছাই ছড়িয়ে পড়েছে উস্কোখুস্কো চুলের ডগায়। ছেলের দিকে এগিয়ে যায় ডোমার। সামান্যক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে, তারপর আলতো হাতে ছাই-গুলো ঝেড়ে ফেলে চুল থেকে। তুহাতে নিবিড় করে তুলে নিয়ে দরজা ঠেলে ঢোকে। শুইয়ে দেয় বিছানায়।

পাশ ফিরে ছিল, তায় অন্ধকার, ডোমার তাই দেখতে পায়না, চোখ বুজেই মিটমিট করে হাসছে নীলমণি।—ইটা হবে জানা কথা। অবাক মানুষটা।

অন্ধকারেই তাকিয়ে থাকে ডোমার পোহালুর দিকে। হাড্ডিসার ছেলেটা। জালার মত পিলে-ফাঁপা পেটটা নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হাপরের মত উঠছে নামছে। মায়া হয় দেখে। হবেই বা না কেন ? কী খায় ? কী খেতে পেল জীবনভর ? ভাবে ডোমার। এমনিতেই বাড়তি মাসে হওয়ায় ছেলেটা ছিল রুগ্ন। তায় হল একেবারে গত তুর্ভিক্ষের কান ঘেঁষে। বড় ছেলে মেয়ে তুটো তো কচু খেয়ে খেয়ে মরে গেল। কিন্তু তাজ্জবভাবে আধমরা হয়ে বেঁচে রইল পোহালু। বংশের বাতিদার। তাই সাধ্যমত ওর আবদার রেখে চলে ডোমার। হালকা কাজগুলো পর্যন্ত করতে দেয় না। ওর বয়সী ছেলেরা বাপ কাকাদের কত সাহায্য করে, এমন কি ক্ষেতি কাজেও। কিন্তু মাঠে খাবারটি পর্যন্ত নিয়ে যেতে দেয় না ওকে ডোমার, পড়াতে চায়, পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়েছে, শহর থেকে বই আনিয়ে দিয়েছে। তবু মাঝে মাঝে যে মারধোরও না করতে হয়, তাও নয়। না মেরে পারে কই ? চণ্ডাল সেই রাগটা মাথায় চাড়া দিলে খেয়াল থাকে ডোমারের—কোথায় কে আছে ?

সেই রাগ যে আজও ভর করেছিল বাবার মাথায়, কি করে জানবে পোহালু ? কী করে জানবে, যে এমন ফনফনা ধান হওয়া সত্ত্বেও ডোমার অমন গুম মেরে থাকে কেন ? কার ওপর অসহ্য ক্রোধে ফেটে পড়বার জন্যে গুমরে মরে। তাই নেহাত এক অসতর্ক মুহূর্তেই আজও একবার শুধু মনে করিয়ে দিয়েছিল বাবাকে তার হাউষটার কথা।

ছেলের দিকে তাকিয়ে অনুতাপে মনটা মুষড়ে ওঠে ডোমারের। আর অদ্ভুত একটা ক্ষোভ। হাউষ ? হাউষ কি আর ডোমারের ছিলনা ? ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যাওয়া বাপের দেনা শোধ করে জমি বাড়িয়ে বাড়িয়ে একদিন জোতদার হয়ে বসবার, বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে সুন্দর একটা সংসার গড়ে তুলবার হাউষ কি আর ডোমারেরও ছিল না ? কিন্তু কেন হাড়মাস কালি করে খেটেও সে দেনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে ? তার জমিগুলো থেকে টুকরো খসে খসে গিয়ে জমিদারদের জমির সঙ্গে যোগ হচ্ছে ? একটা মাত্র বৌ ছেলেকেও কেন দু বেলা ভরপেট দানা জোটাতে পারেনা ? হাউষ ? ঝিমঝিম করে ওঠে ডোমরের মাথাটা। একটা অব্যক্ত প্রতিহিংসা ফুঁসে ওঠে রক্তের কণায়। নিজের চুল টেনে ছেড়বার জন্য নিসপিস করে আঙুল। হাউষ ?

তবু ভূতের মত পেয়ে বসা হাউষটাকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারে না পোহালু, এত মার খেয়েও না। সম্পূর্ণ জীবনটা ওর আচ্ছন্ন করে রেখেছে ছোট্ট একটি হাউষ—শহর দেখবে, শহর দেখবে পোহালু।

তাই স্কুল থেকে যখন আর সব ছেলেরা পালাবার সুযোগ খোঁজে তখন ছুটির পরও বাড়ি আসতে চায় না পোহালু। মাষ্টারমশায়ের কাছে নানা অছিলায় শহরের কথা শোনার লোভে। ধান কাটার মরশুমে স্কুল বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। কিন্তু নানা অজুহাতে প্রায় রোজই মাষ্টার মশায়ের বাড়ি এসে হাজির হয় সে। মাষ্টারমশায়ের খাওয়া শেষ হবার আগেই দাওয়ায় বিছিয়ে দেয় মাদুরটা। সেজে দেয় হুঁকো। তারপর তাকের ওপর থেকে মাষ্টারমশায়ের ভূগোল বইটি এনে নাড়া-চাড়া করে আনমনে। একটি মাত্র ছবি আছে বইটায়, সামনে ফুল-বাগানসহ মিউনিসিপ্যালিটির ছবি। জাবড়ানো ছবিটার সব কিছু মিলিয়ে কটি থামই শুধু এখন বোধগম্য। তবু উদগ্র দৃষ্টির সামনে সেই ছবিটা মেলে তন্ময় হয়ে বসে থাকে পোহালু। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গল্প শোনে মাষ্টারমশাইএর কাছে। নায়কোচিত গর্ব ও গাম্ভীর্যে মাষ্টারমশায়ও তার শহর-অভিজ্ঞতা রূপকথার মত বলে চলে ওকে। এত বড় মনোযোগী শ্রোতা এ তল্লাটে আর নেই তাঁর। বলেন ইয়া বড় বড় সব ইটের কোঠার গল্প। পিচঢালা ঝকঝকে সব রাস্তার কথা।

গোরুঘোড়া বিহীন হু-হু করে ছুটে চলা হাওয়া গাড়ির কাহিনী। আরও কত কি! কথা তো নয়, রূপকথা সে। শুনতে শুনতে উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে পড়ে নিস্পন্দ পোহালু, নিশ্বাস বন্ধ করে ডাগর চোখদুটো মেলে ধরে থাকে মাষ্টারের মুখে। আর চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে কল্পিত শহরের ছবি। ছবির শহর।

আর রাত্রে তাই শুয়ে, সুযোগ বুঝে প্রায় রোজই একবার বাবাকে মনে করিয়ে দেয়,—ইবার ধান উঠিলে শহর লিযাবি না বাবা?

মেজাজ যেদিন ভালো থাকে হাসে ডোমার,—ছোঁয়াটা পাগল করি দিবে। হয় হয়, লিযাব লিযাব। শহর যে মরদ না দেখিছে সে এখুনো মায়ের গভ্যে।

হাওয়ার গতিটা পরখ করে নীলমণিও মাঝে মাঝে ফোড়ন কাটে,—লিযাবে না? যাবৎ মিঞা ঘর লিবে, তাবৎ বিবি গোর লিবে।

কখনো লাজুক লাজুক হাসে ডোমার, কখনো হঠাৎই গম্ভীর হয়ে ওঠে। পৌরুষে আঘাত পড়ে। ইঙ্গিতটি যেন তার অক্ষমতার দিকেই আঙ্গুল উচিয়ে আছে বলে মনে হয়। নিজের কাছেই ফাঁকা ঠেকে, তবু আশ্বাস দেয় ছেলে বউকে—না হয়, দেখিস ইবার লিযাব। তুকেও লিযাব কান্তনগরের মেলায়। ধানটা ইবার ভালোই হবে মনে লিছে।

তবু হয়ে ওঠে না কোনবারই। ওর প্রত্যাশিত, প্রতীক্ষিত দিন আসে বিরাট ব্যর্থতা নিয়েই। ধান ভাগ করে গোলাছাউনী, বরকন্দাজী, মাছ খাওয়ানী ও আরো দশ-বিশ রকম আবোয়াব মিটিয়ে, বীজ ধানের দেড়িয়া কর্জা শুধে যে ধান নিয়ে ঘরে ফেরে ডোমার, ফুটো চাল সারতে আর হালটা জোড়া দিতেই ফুরিয়ে যায় তা। দীর্ঘ প্রতিশ্রুত নীলমণির নতুন সাড়ি তো দূরের কথা, একটা বুকানিও হয় না। পোহালুর শহর দেখা তো দূরঅস্ত। এড়িয়ে এড়িয়ে চলে এ সময়টা ডোমার তার মাগ-ছেলেকে। মুখ ফুটে কিছু না চাইলেও ওদের ড্যাবড্যাবে চাউনিগুলো যেন মৌন অভিযোগ মেলে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। নিজের অক্ষমতাটা নিজের কাছেই আরো প্রকট হয়ে ওঠে তাতে। বিশেষ কারো উপর নয়, এমন একটা নৈর্ব্যক্তিক রি রি করা রাগ যেন চাড়িয়ে উঠতে থাকে রক্তের কণায়। মাগ ছেলের নির্বাকতা আরো ইন্ধন যোগায় তাতে। নিজের মনেই গজগজ করে

চলে ডোমার, চাহিবা পারে না? মুখ ফুটি চাহিবা পারে না? গোরুর মত ড্যাবড্যাব করি চাহি থাকে ক্যানে, গলা মরি গিছে?

তারপরই হয়তো চিৎকার শুরু করে দেয়,—পারিমো না, কারু হাউষ মিটাবা পারিমো না হামি। হামার হাউষ কে মিটায়?

লোকটাকে ঠিক বুঝতে পারে না নীলমণি। তামাক সেজে দিতে এসে সান্ত্বনা দেয়,—হামরা কি চাইছি? ইবার না হয়, সামনে সনে হবে। না পারিলে কি করিবা।

এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় থাকে যেন ডোমার। যে-কোন একটা কথা বললেই হল। ঠিক তা থেকে খেই বের করে নেবে সে। চিৎকার করে উঠবে,—কি কহিলি, পারি না? মুরাদ নাই হামার? কহিলি হারামজাদী? চুলের মুঠি ধরে পেড়ে ফেলবে ডোমার নীলমণিকে। হাতের কাছে যা পাবে তাই দিয়েই পিটিয়ে চলবে ক্রমাগত। দোষ থাক না থাক, হাতের কাছে পেলে পোহালুকেও বসিয়ে দেবে কয়েক ঘা। তারপর গজগজ করতে করতে বেরিয়ে যাবে বাড়ি থেকে। —হাউষ? হাউষ? হাউষ দেখাবা আসিছে।

বাপের ওপর ভরসা তাই আজকাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছে পোহালু তবু অভ্যাসবশেই মাঝে মাঝে বলে বসে হয়তো হাউষটার কথা। মেজাজ অনুযায়ী কোন দিন তাতে সান্ত্বনা পায়, পায় প্রতিশ্রুতি। কোনদিন বা শুধুই প্রহার। কিছুদিন পর মনে মনে তাই ঠিকই করে ফেলে পোহালু, বাপের ভরসা আর নয়। নিজেই চেষ্টা করে দেখবে এবার। যেমন করেই হোক শহর দেখবেই সে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাই সে জানতে শুরু করল শহর যাবার পথের কথা, শহর ফেরৎ আত্মীয় বন্ধুদের কাছ থেকে, পণ্ডিত মশায়েব কাছ থেকে। কিছু হদিশ মিললও। কিন্তু পাথেয়? অন্ততঃ গোটা পাঁচেক টাকা না হলে তো আর যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বা ওকে দেবে কে? যাদের কাছ থেকে চাওয়া সম্ভব, তাদের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। মা-বাবা বা পণ্ডিত মশাই? তবে? দিনের পর দিন ভেবে চলে পোহালু।

তারপর হঠাৎই একদিন সন্ধ্যার পর নজরে পড়ল মা বাবার যে তখনও পোহালু বাড়ি ফেরেনি। সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় খোঁজ করেও পাওয়া

গেল না তাকে। ভয়ে উৎকণ্ঠায় পাগলের মত হয়ে গেল ডোমার আর নীলমণি। সমস্ত রাত ঘরবার করল। দাওয়ার ওপর হাঁটুর খাঁজে ঘাড় গুঁজে মনে মনে বলল ডোমার, হাউষটাই ছোঁয়াটাক পাগল করি দিল! —অনুতাপ হল, যদি হাউষটা মিটাতে পারত তবে হয়তো আজ এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যেত না ছেলেটা।

পরদিনও ফিরল না পোহালু। আশেপাশে সমস্ত কুটুম বাড়ি খোঁজ করে এল ডোমার। কোথাও নেই। সবই ভরসা দিল,—এত ডর করিছো ক্যানে, শহর দেখি ফিরি আসিবে .লিচ্চয়। ডোমারও ভেবেছে কথাটা তবু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারছে কই!

পড়ন্ত বেলায় বাড়ী ফিরে দেখে, মাচার ওপর ঘাড় গুঁজে বসে আছে পোহালু, আর মদনপুরের যদু মণ্ডল দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে। তার কাছেই শুনল সব ডোমাব। মদনপুরে নাকি জন খাটতে গিয়েছিল ছেলেটা। যদু মণ্ডল চিনতে পেরে ধরে নিয়ে এসেছে।

পোহালু ফিরে আসায় সহানুভূতি, স্বস্তিতে মনটা নরম হয়ে এসেছিল, ডোমারের, কিন্তু ভাগ চাষীর ছেলে হয়ে সমস্ত মান ইজ্জৎ বিসর্জন দিয়ে পোহালু জন খাটতে গিয়েছিল শুনে মাথায় তার রক্ত চড়ে গেল হঠাৎ। যদুমণ্ডলের উপস্থিতি ভুলে বাঘেব মত সে ঝাঁপিয়ে পড়ে পোহালুর ওপর,—হাউষ বলি কি ইজ্জৎ খোয়াবু? জন খাটিবা গেছিস—শালা, মান ইজ্জৎ কিছু রাখিলি না?

চীৎকার করে ছুটে আসে নীলমণি। ওকেও দু'ঘা দিয়ে সরিয়ে দেয় ডোমার। কিন্তু আশ্চর্য! একফোঁটা চীৎকার না করে নিঃশব্দে মার খেয়ে যায় ছেলেটা, যদু মণ্ডল এসে ছাড়িয়ে না নেওয়া পর্যন্ত। রাগে আক্রোশে অপমানে উঠোনের এক পাশে বসে হাপরের মত নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে ডোমার।

তবু হাল ছাড়ে না পোহালু। যে জন খাটতে যাবার আগে ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে বুঝতে পারে নি ও। গতর খাটানো পয়সা, হকের টাকা, তার জন্য যে এত ধকল পোহাতে হবে ধারণা করতে পারে নি সে। অবশ্য জানত, যে কোন ভাগচাষীর পক্ষে কাজটা ইজ্জৎ হানিকর।

এরপর দিন কয়েক একটু থিতিয়ে ছিল ছেলেটা, কারো সঙ্গে ভাল করে

কথা বলে না। অনেক সময়ই বাড়ি থাকে না, বুঝতে পারে না ভীত নীলমণি, এ পোহালুর নিজেকে শুধরে নেওয়া, না অন্য কিছুর প্রস্তুতি।

শুধরে নেওয়া নয়, শহর দেখার হাউষটা আগের মতই সজাগ ছিল, কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না পোহালু। দিনকয়েক পর সন্থ শহর ফেরতা এক বন্ধুর কাছে শহরের রূপকথা শুনে নতুন করে আবার মাথায় চাড়িয়ে উঠল হাউষটা। মরিয়া হয়ে উঠল বন্ধুর ব্যঙ্গোক্তিতে, 'শহর না দেখিলে সে মরদ না হয়। জেবনটাই বেথা তার।'

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসছিল না পোহালুর। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত। মাঝে মাঝে নিশাচর পাখীগুলো আচমকা ডেকে ডেকে থেমে যাচ্ছে। কি এক অজানা ভয়ে মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে বুকের ভেতরটা। সামনের বাঁশঝাড়টায় নিশুত রাতে কিসব নাকি দেখা যায়। মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে সে ভৌতিক ভীতিগুলো। চোখ বুজে গুণে চলে এক দুই তিন চার। কিন্তু বৃথাই। ঘুম আসে না।

এটা ওটা সেটা থেকে দৃষ্টি সরতে সরতে হঠাৎ এক সময় পোহালুর নজর এসে পড়ে মার লক্ষ্মীর ঝাঁপিটার ওপর। ক্ষয়ে যাওয়া কড়িগুলো জেল্লা হারালেও এখনও আকড়ে আছে দু'পুরুষের জীর্ণ ঝাঁপিটা। জন্মের পর থেকেই ওটা ওখানেই দেখছে পোহালু। টাকা আছে ওতে। মার খেয়ে না খেয়ে জমানো কিছু টাকা। কত হবে? পাঁচ, দশ, কুড়ি—নয় অত হবে না, সেতো অনেক টাকা!

হঠাৎ একটা চিন্তা ওর মাথায় ঝিলিক মেরে যায়। কিছুদিন আগে মেলায় ওদের গ্রামেরই একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। শহর থেকে আনা কিছু জাপানি খেলনা, পুতুল বেচছিলো সে। পোহালুকে দেখে চোখ মটকে বলেছিল, শহর থিকে আনিছি, দুনো লাভ, বুঝিলি বাহে?

পোহালু ভাবে, ঐ ঝাঁপিটা থেকে কিছু পয়সা নিয়ে ও যদি শহরে যায়, সেখান থেকে কিছু খেলনা কিনে এনে, দুনো লাভে বিক্রী করে, পয়সাটা আবায় ঝাঁপিতেই ফিরে রেখে দেয়? তাহলেও কি সেটা চুরি করা হবে? মালক্ষ্মী কী রাগ করবেন তাতে?

হ্যাঁ-নার উপর্যুপরি সংঘাত থেকে না টাই শেষ পর্যন্ত বেছে নেয় সে। চুরি তো করছে না, বলতে গেলে ধারই নিচ্ছে। আবার শোধ করে

দেবে। এর ভেতর পাপ কোথায় ? কোথায় অন্যায় ?

আস্তে বিছানায় উঠে বসে পোহালু। মাচায় মৃদু একটা শব্দ হয় হয় ক্যাঁচ করে। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকায় ঘুমন্ত মা-বাবার দিকে—অঘোরে ঘুমুচ্ছে তারা। বিছানা থেকে নেমে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় পোহালু লক্ষ্মীর ঝাঁপিটার কাছে। ঝাঁপিটা খোলে। ছাঁৎ করে ওঠে বুকটা, হাত তুলে নেয়। তারপর হঠাৎই চিলের মত ছোঁ মেরে সবটা সাপটে নিয়ে, আলগোছে দরজা খুলে বেরিয়ে যায় বাইরে।

রাতের শেষ যাম। বাইরে ফিকে অন্ধকার। দূরে শেয়াল ডাকছে। সামনে সেই বাঁশঝাড়টা। তবু চোখবুজে এক ছুট লাগায় পোহালু। চোখ মেলে একেবারে বাঁশ ঝাড়টা পেরিয়ে। তারপর ছুট লাগায় রেল ষ্টেশনের দিকে। হঠাৎ নজরে পড়ে, দূরে রেলের সিগন্যালটা নিচু হল। রেলগাড়ী আসছে। শহর যাবার রেলগাড়ী। উর্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করে এবার পোহালু। রেলগাড়ী আর সে প্রায় একই সঙ্গে স্টেশনে ঢোকে। ছুটে গিয়ে কাউণ্টারে দাঁড়ায় ও,—শহর যাবার টিকিট কত, বাবু ?

ট্রেন সিটি মারে। রেলের লোকটি বলে,—গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, আর ধরতে পারবে না, খোকা। টিকিট কেটে কি করবে ?

হাতের মুঠোয় গাড়ীভাড়া। অসহায় দৃষ্টিতে রেলগাড়ীটার দিকে তাকিয়ে থাকে পোহালু। রেলগাড়ীটা শহরে যাচ্ছে !

এতক্ষণ দূর থেকে ওকে লক্ষ্য করছিল ওদের গ্রামের এক জন লোক। ওকে একা দেখেই তার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। এগিয়ে এসে দু'চারটা কথা জিজ্ঞাসা করতেই বুঝল, ছেলেটার মতলব খারাপ। সেই ওকে ধরে এনে পৌঁছে দিল বাড়িতে।

ইতিমধ্যে বাড়িতেও সব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কোনরকম জবাবদিহির সুযোগ না দিয়েই চুলের মুঠি ধরে সামনে টেনে আনল ওকে ডোমার। শুরু হল নির্মম প্রহার। পোহালুর এত বড় একটা অধঃপতনে এতই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল নীলমণি, যে অন্যদিনের মত নিজের পিঠ পেতে ছেলেকে বাঁচাতে যাওয়া তো দূরের কথা, নিঃশব্দে থ-মেরে দাঁড়িয়ে রইল সে পোহালুর অর্ধ-চৈতন্য দেহটা উঠোনের ওপর পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত।

এবার রীতিমত জেদ চেপে যায় পোহালুর। মরিয়া হয়ে ওঠে সে মা-বাবা সবার ওপর বিতৃষ্ণায় ছেয়ে যায় ওর মনটা। ঠিক করে, এবার সেও প্রমান করে দেবে, যে সেরকম চেষ্টা করলে কারো সাধ্য নেই ঠেকায় ওকে। শহরে যাবেই সে এবার।

কিছুদিন থেকেই কেমন যেন উড়ু উড়ু দেখাচ্ছে ডোমারকে। মাঝে মাঝেই সন্ধ্যার পর দু'একজন লোক আসে, এক কোণে বসে কি সব ফিসফাস করে, তারপর হয়তো সবাই মিলেই বেরিয়ে যায়। বাড়িতে ফেরে অনেক রাতে। চোখে মুখে কেমন যেন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব তার। অনেক রাতে বাড়ি ফেরাটা অবশ্য ব্যতিক্রম নয় ওদের জীবনে, কিন্তু ব্যতিক্রম, স্বাভাবিক অবস্থায়, সংযত পায়ে ফেরা। এ ব্যতিক্রমগুলো বড় ভয় পাইয়ে দেয় নীলমণিকে। মনে করিয়ে দেয় সেবারের সেই তেভাগার মুখের দিনগুলোর কথা।

পোহালুও কেমন যেন আস্তে আস্তে বদলে যেতে শুরু করে। কারো সঙ্গে মন খুলে কথা বলে না। দিনেও বাড়িতে থাকে অল্প সময়, ফেরে দেরিতে অনেক রাত করে। উড়ো উড়ো খবর কানে আসে নীলমণির, যাদের সঙ্গে ঘেন্নায় কোনদিন মিশত না পোহালু, তাদের সাথেই নাকি ওর দহরম মহরম আজকাল। শঙ্কিত হয় নীলমণি—মা-র মন তো।

তবু ভয়ে ভয়ে একদিন রাতে ডোমারকে আবার মনে করিয়ে দেয় নীলমণি,—এবার একবার ছোঁয়াটাক লিযাও শহরে। হাউষটা যেমন চাড়াইছে দিন দিন, হামারতো ভয়ে পেটত হাত পা সিধাইছে!

তার এব চিরাচরিত সম্ভাব্য জবাব দুটোই। হয় চেষ্টাকৃত মোলায়েম কণ্ঠে ফাঁকা আশ্বাস দেওয়া, নয় বাঁধভাঙ্গা ক্রোধে খেঁকিয়ে ওঠা। কিন্তু নীলমণিকে অবাক করে দিয়ে আজ কেমন এক অদ্ভুত নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে জবাব দিল ডোমার,—হাউষ-হুস এখন তুলি রাখ্ নীলমণি, আগে জান বাঁচুক, তয় তো হাউষ!

ভয় পায় নীলমণি, বলে,—ক্যানে? জানের কথা আসে কুনখান থেকা?

ডোমার অস্ফুটে বলে,—আসে,—আসে! বুঝিবা পারিস্ না, বোকা মাইয়া-ছেলা, এক হল্লা আসিছে!

ভয়ের আভাসটা এবার আতঙ্কের চেহারা নেয় নীলমণির কণ্ঠে, —হল্লা ! হল্লা ক্যানে ?

নির্লিপ্ত স্বরেই বলে ডোমার,—সিবার তেভাগাটা মানি নিল, তো ইবার জমিদার ফের কহছে, উসব হবা পারে না। তো হামরা মানিবু ক্যান ? গত সনের মত নিজ নিজ খিলানে ধান তুলিমোই। তাই হল্লা হবা পারে।

এই প্রথম বাইরের কথা ঘরের বউকে বলল ডোমার, বন্ধুর সঙ্গে আলোচনার স্বাচ্ছন্দে।

ভয়, একটা অশরীরী ভয় পরদিন থেকেই পাক খেতে শুরু করে নীলমণির মনের গোপনে। তেভাগার সেই রক্তাক্ত দিনগুলির ভয়ার্ত স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে উঠতে শুরু করে। কিন্তু অসহায়ভাবে সব কিছু দেখে যাওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই ওর। বেশ বুঝতে পারে। কি যেন একটা করতে চলেছে গাঁয়ের মরদগুলো। বাইরে থেকেও লোকজন আসছে, সব সময় গুজ-গুজ ফুসফুস। রাতের অন্ধকারে এর উঠোনে ওর উঠোনে জমায়েত। শলাপরামর্শ।

ডোমারও আজকাল বাড়ি থাকে কম। ফেরে অনেক রাতে। সব সময় অন্যমনস্ক। এত আদরের পোহালুর দিকেও আজকাল নজর দেবার ফুরসুৎ পায় না ডোমার। সোয়ামীর দিকে তাকিয়ে ভয় করে নীলমণির। ভয় করে ছেলেটার দিকে তাকিয়েও। দিনকে দিন কেমন যেন বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। বাবার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আজকাল অনেক রাতে, দেরীতে বাড়ি ফেরে। মাঝে মাঝে বাপ-বেটা দুজনের একজনও হয়তো বাড়ি ফেরে না। ডোমার না হয় ফেরে না সমিতির কাজের জন্য, কিন্তু পোহালু ?

নীলমণি সারারাত কাঁদে শুয়ে শুয়ে। আর আকুল প্রার্থনা জানায়, —ভগবান, হল্লাটা মিটায় দাও। ছোঁয়াটাক ভাল করি দাও।

কিন্তু ভগবানের দরবারে আর্জিটা পৌঁছানোর আগেই হল্লাটা এগিয়ে আসে। অনেক দ্বন্দ্ব, ভয়, সঙ্কোচ জড়ানো শীর্ণ মেঠো পাগুলো এসে সন্ধ্যায় একজোট হয় বুড়ো বটতলায়। এই জটলা আজ সিদ্ধান্ত নেবে কি করা হবে। গাঁয়ের সব বুড়ো মদ্দ ছেলে ছোকরা জড়ো হয়েছে,

শহর থেকে এক বাবু এসেছেন, তিনিও আলোচনা করবেন।

প্রথমে শহরের বাবুটি বললেন। পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিলেন সবাইকে। তারপর শুরু হল নিজেদের মধ্যে আলোচনা, বহু মার খেয়ে বুকের ভেতর গুমরে মরা বিক্ষোভগুলো পেটের আগুনের তাপে তেতে উঠল আলোচনার মুখে। বহুবিধ সমস্যার আলোচনায় মুখর হয়ে উঠল বুড়ো বটতলা। তারপর অনেক কথার ঝড় পেরিয়ে সিদ্ধান্তে এল জটলা,—আর্জি আলোচনা অনেক হল, এবার সক্রিয় হবার পালা। কাল থেকেই শুরু হোক যাত্রা। তেভাগা জমিদারকে মেনে নিতে হবে। আরক্ষেতের সমস্ত ধান কেটে নিজের নিজের খিলানে তুলতে হবে। মেহনত যার ধান তার।

পরদিন শুকতারা চোখ বুঁজবার আগেই চোখ মেলল গ্রামের মেয়ে মরদ। গায়ে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল আবার সেই বুড়ো বটগাছ তলাতেই, মরদদের হাতে হাতে কাস্তে। গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক চাষী কল্লর হাতে ঝাণ্ডা। চোখের স্থির দৃষ্টিতে সবার দৃঢ় সংকল্প।

কিন্তু কথায় বলে দেওয়ালেরও কান আছে। সিদ্ধান্তের খবরটা নিজেদের ভেতর সব কান হবার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল জমিদারের কানে। বেল্লিক নেমকহারাম চাষাগুলোর মোকাবিলার মহড়া নিতে কোন কার্পণ্য করলেন না তিনি।

সবে-ওঠা সূর্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলল বিরাট জনতা, গাঁয়ের মেয়ে-মরদ সবাই। ভোরের রোদের লাল আভায় ব্রোঞ্জের দৃঢ়তা প্রতিটি মুখে। পতাকাটা আরো লাল। ক্ষেতের মুখে এসে একবার থামল জনতা।

হাওয়ায় কাঁপা ধান-শীষগুলোয় যেন মিতালীর হাতছানি।

ডোমার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—কিষক্ সমিতি কি !—

জবাবে ফেটে পড়ল সবাই—জয় !

—জান—দিব—তবু—ধান—দিব—না।

—না-আ-না !

উদ্যত কাস্তে হাতে হাড় জিরজিরে দেহগুলো প্রবল উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ল ধানের সমুদ্রে। আশি বছরে কাঁপা হাতে কল্লর

পতাকাটা পুঁতে দিল ক্ষেতের মাঝখানে। উৎসবের সমারোহে মুখর হয়ে উঠল ধানক্ষেত। শুরু হল ধানকাটা।

তৈরী ছিল গোপনে শহর থেকে আনা জমিদারের ভাড়া করা গুণ্ডারাও। কিছুক্ষণের ভেতরই বাঁশ বনের বাঁক ঘুরে ক্ষেতের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। আলের ওপর সার বেঁধে দাঁড়াল আক্রমণের প্রতীক্ষায়। জোতদারের শালাবাবু কিছুটা এগিয়ে এলেন চাষী মরদদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। অবশ্য গুণ্ডাগুলো জানে—ওটা অছিলা। কোন সমঝোতার সম্ভাবনা নেই এই বিপরীত দুই দাবীর ওপর দাঁড়িয়ে, তবু লোক দেখানো এই ফয়সালার চেষ্টার সময়টুকু অপেক্ষা করতেই হবে।

এসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না পোহালু। এখানে ওখানে আসন্ন বিপদে চাপা ফিসফিসানিগুলো যে ও ইচ্ছে করেই শুনত না, তা নয়। ওর মনে দাগই কাটত না ওসব। ধান, চাল, অনাহার এতো সম্বৎসরের ঘটনা। কী আর নতুনত্ব আছে এতে, কিন্তু ওর শহর-স্বপ্নে কত বৈচিত্র্য, কত উত্তেজনা!

তবু আচমকা জড়িয়ে পড়তে হোল পোহালুর সেই বৈচিত্র্যহীন ঘটনার:সঙ্গেই।

কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি পোহালু। পাশের গাঁয়ে বাদুদের সঙ্গে শহর থেকে আসা যাত্রা দেখতে গিয়েছিল। সকালে বাড়ি ফিরছে, হঠাৎ থেমে গেল দূর থেকে হল্লা শুনে। তাকিয়ে দেখে ক্ষেতে বিরাট হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। কাদের সঙ্গে কাদের দাঙ্গা দূর থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, উত্তেজনায় ছুটে গেল সে ঘটনাস্থলে।

কিন্তু এসে দাঁড়াতে পারে না একদণ্ড। প্রচণ্ড হল্লা আর হাঙ্গামার মধ্যেই হঠাৎ আবিষ্কার করে উদ্যত একটা লাঠির মুখে ডোমারকে।

চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে পোহালু সামনে,—সামাল বাপ্।

ওর ধাক্কায় ডোমার ছিটকে পরে গেল একপাশে। লাঠিটা এসে পড়ল ওর মাথায়। হাই বাপ্—, বলে দু'হাতে মাথা চেপে লুটিয়ে পড়ল পোহালু, ফিনকি দেওয়া রক্তাক্ত কপালটা নিয়ে।

ঠিক তখনই উড়ো বাজপাখির মত হঠাৎ কোত্থেকে এসে উপস্থিত হল একটা জাল ঘেরা পুলিসের গাড়ী। লাঠি আর বন্দুক হাতে পুলিশ

এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাঙ্গামার ওপর। বিদেশী সরকারের মুন খায় তারা, শান্তি রক্ষায় কার্পণ্য করলে চলবে কেন ?

সেই তোলপাড় হাঙ্গামার ভেতরেই ডোমার দু'হাতে পাঁজা কোলে করে তুলে নিল অচৈতন্য পোহালুকে। এলোপাথারি লাঠির আস্ফালন থেকে নিজের মাথা আর পিঠ দিয়ে ছেলেকে আগলিয়ে ভিড়ের বাইরে চলে আসছিল সে।

কিন্তু দু'পা এগোতেই বাধা পেল পেছন থেকে চুল টান পড়ায়। দু'পাশ থেকে 'দুটো পুলিশ এসে ওকে টেনে নিয়ে চলল দরজা খোলা কালো গাড়ীটার সামনে। আরও সব বন্দীদের ভিড়ে ভরে গিয়েছে তখন গাড়ীটা।

গাড়ীটা ছুটে চলে মহকুমা সদরের দিকে। ভেতরে অচৈতন্য রক্তাক্ত ছেলেটার ওপর প্রায় হুমরি খেয়ে পড়ে আছে ডোমার। অন্যরাও। একদৃষ্টে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

অনেকক্ষণ পর একবার এলোমেলো দৃষ্টি মেলে তাকাল পোহালু। আরো ঝুঁকে পড়ে ডোমার ছেলেব মুখের ওপর, ফিসফিস করে ডাকে —পোহালু ?

অন্ধকাব একটা ছোট্ট ঘর। কাঁপছে। চলছে। মনে হচ্ছে দরজা জানালা কিছুই নেই। এ কেমন ঘর ? কার ঘব এটা ?

অস্পষ্ট প্রশ্ন ভেসে যেতে থাকে পোহালুর দুর্বল চেতনার ওপর দিয়ে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

তারপর, একসময়ে লক্ষ্য-বদ্ধ হয়ে আসে ওর দৃষ্টি। ঘরটার ছাদের কিছুটা নিচে লম্বা মত একটা ফাঁক, যেন একটা ছোট্ট জানালা—যেটা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে ? আকাশের ছোট ছোট ফালি সরে সরে যাচ্ছে সেই ফাঁক দিয়ে। আর আকাশের সঙ্গে বড় বড় চূড়ার মত, জমিদার বাবুদের বাড়ির ছাদের মত, গাছের মাথার মত ওগুলো কি, স্বপ্নের মত সরে সরে যাচ্ছে!

উৎকণ্ঠায় আবার ডাকে ডোমার,—ও পোহালু ?

চোখ ফেরায় না পোহালু। অস্ফুটে জিজ্ঞেস করে শুধু,—কুষ্টি যাচ্ছি ? কুথায় আমি ?—মা—মাগো ?

আলতো হাতে পোহালুর কপালের ওপর থেকে রক্ত-ভেজা চুলগুলো সরিয়ে দেয় ডোমার। সান্ত্বনার সুরে বলে,—শহররে, পোহালু, ইটা শহর। কাল বিহানে শহর দেখনু। তোর হাউষ মিটায়া শহর দেখামো কাল।

শহর! বিদ্যুৎ চমকে যায় যেন যন্ত্রণাবিদ্ধ মাথাটার ভিতর দিয়ে। আচমকা গা ঝাড়া দিয়ে টান হয়ে উঠে বসতে যায় পোহালু। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একরাশ অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখের সামনে। দেহটা কাত হয়ে টলে পড়ে।

দুহাতে ধরে ফেলে ওকে ডোমার। হুমড়ি খেয়ে পড়ে সবাই গাড়ীভর্তি মানুষগুলো। বোকা বোকা চোখে উদগ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে, কপাল বেয়ে চুঁইয়ে পড়া রক্তের ধারা থকথক করছে। একপাশে হঠাৎ হেলে পড়ে ঘাড়টা।

অশুভ আশাঙ্কায় ফ্যাকাশে হয়ে যায় সবার মুখ। সবার হয়েই যেন শেষ সিদ্ধান্তটা ঘোষণা করে আশি বছরের বৃদ্ধ কল্প,—বড় দুর্ব্বল ছিল ছোঁয়াটা। উয়াক শুয়ায় দাও ডোমার।

অপলক দৃষ্টিতে পোহালুর দিকে তাকিয়ে থাকে সবাই।

চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে সবার। চোখে জলের চেয়েও জ্বালা বেশি, অক্ষম আক্রোশে দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা যেন নেয় গেঁয়ো মানুষগুলো।

শুধু ডোমার,—ডোমার পাগলের মত টান করে তুলে বসিয়ে দেয় পোহালুকে। ওর বুকের ওপর ঢলে পড়া ছেলের মৃত-মুখের থুতনিটা ওপরের দিকে ঠেলে তুলে প্রায় চীৎকার করে ওঠে,—দেখ—দেখ, শহর দেখ, পোহালু। বড় হাউষ ছিল তোর শহর দেখিবু, দেখ, হাউষ মিটায়া শহর দেখ। শহর দেখ! বলে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে ডোমার।

সবার চোখের জল শুকিয়ে ওঠে, হাতের মুষ্টি দৃঢ় হয়ে ওঠে, ওরা আর কেউই এই আলোহীন বদ্ধ বন্দী গাড়ীটার মধ্যে নিজেদের যেন আবদ্ধ রাখতে চাইছে না।

নিরাশক্ত নিষ্প্রান বন্দীগাড়ীটার চাকার তলে গড়িয়ে চলে পোহালুর স্বপ্নের শহর।

হালাল

অরুণ চৌধুরী



অকণ চৌধুরী সাংবাদিক এবং গল্পকার রূপে পবিচিত, জন্ম অধুনা বাংলাদেশে। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত,—মার্কসবাদী জীবনদর্শনে বিশ্বাসী। দেশ বিভাগের পর কলকাতায় চলে আসেন এবং তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র স্বাধীনতায় সাংবাদিক হিসাবে যোগ দেন। স্বাধীনতার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাবাব আগে পর্যন্ত পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে ঐ পত্রিকার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন প্রগতিশীল পত্র পত্রিকায তিনি বেশ কিছু গল্প লেখেন। সাধাবণ মানুষের জীবন সংগ্রাম সুখ দুঃখই তার গল্পের উপজীব্য। এই সব অতি সাধাবণ খেটে খাওয়া মানুষের চরিত্র অঙ্কনও তিনি কবেছেন জীবনেব প্রতি গভীর মমতায়, আশ্চর্য রকম স্বাভাবিক অথচ বলিষ্ঠভাবে। তাঁর একমাত্র সংকলিত গল্পগ্রন্থ 'সীমানা'।

মসজিদে ফজরের আজান তখনও পড়েনি।

পূব আকাশের ধূসর গায়ে জায়গায় জায়গায় কমলালেবুর রঙ-ছোঁয়ানো সরু সরু ফাটল ধরেছিল। আকাশের বাকি আধখানা তখনও কিছুটা আঁধারে মাখামাখি হয়ে আছে। চাচা ভাতিজায় হাল, লাঙল আর বলদ ছুজোড়া নিয়ে মাঠের উদ্দেশ্যে সড়ক ধরে অনেকটা উত্তর-পশ্চিম দিক ব'লে রওনা হল।

পশ্চিমে মাঝারি সাইজের একটা নিচু আবাদি পাঁথার আর তার পরেই দক্ষিণ প্রবাহিনী রত্না, পূবে নবীনগরের মূল বসতি, মাঝখানে এই সড়ক। সড়কটি স্বল্প পরিসর হলেও মোটেই অখ্যাত নয়। নবীন-গরের পূবে মাইল তিনেক তফাত দিয়ে যে চওড়া ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড রাস্তাটা বরাবর উত্তরে জেলার সদর অভিমুখে চলে গিয়েছে, এই সড়কটি সেই রাস্তা থেকেই সুন্দরদিঘির হাটের পাশ দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে মুখ করে বের হয়ে আরো ছ'তিনটে গ্রামের মধ্যে দিয়ে এসে এই গ্রামে ঢুকে অনেকটা ধনুকের মত একটুখানি বেঁকে গাঁয়ের প্রাইমারী স্কুলের গা ঘেঁষে পূবে গোরস্থানটা রেখে, পশ্চিমে রেখে জুম্মাঘরখানা, বলতে গেলে আপতাবের আঙিনার উপর দিয়েই পূব-দক্ষিণ মুখ করে বরাবর মাইল তিন-চার এগিয়ে আবার মিশেছে সেই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রাস্তায় রোশেনাবাদ বন্দরের কাছাকাছি গিয়ে। এ রাস্তাটা যদিও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেরই বটে, তবু পাকিস্তান হবার বহুকাল আগে ইংরেজ আমলের কোন এক আকালের সময়ে টেষ্ট রিলিফ হিসেবে বাঁধা হয়েছিল বলে এ অঞ্চলের লোকে ছ'সাত মাইল দীর্ঘ এই সড়কটিকে রিলিফ সড়ক নামেই ভাল বুঝে থাকে।

রশিখানেক রাস্তা না হাঁটতেই বলদগুলো সব লেজ উচিয়ে এক দফা পায়খানা পেসাব করল। থামতে হ'ল বলে বিরক্তই বোধ করছিল আপ্তাব। যাই-হোক, সন্তর্পণে গোবর, চোনা প্রভৃতি ডিঙিয়ে কেবলই তারা আবার হাঁটা সুরু করবে, এমন সময়ে দূরে আঙুল দেখিয়ে মাহ্‌তাব একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল—উডা কে যায় চাচা?

আপতাবও থমকে দাঁড়াল। সত্যিই তো! উলটো দিক থেকে গোরস্থানের পাশ দিয়ে সড়ক ধরে কে একটা লোক আসছিল। কুয়াশা ছিল বলে এতক্ষণে ভাল মালুম পাওয়া যায়নি। আরো রশিখানেক এগিয়ে জুম্মাঘরের পুরানো দালানটার কাছাকাছি গিয়ে ঠিক যেখানটায় তারা হাতের ডানে পুব দিকে একটা পাঁথারের মধ্যে নেমে যাবে সেই মোড়ের মাথা অবধি হন হন করে এসে বুড়ো বটগাছটা বাঁয়ে রেখে সড়ক থেকে ডানদিকে নেমে জুম্মাঘরের পেছনে আখের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম দিকে লোকটা কোথায় যেন নিমেষে মিলিয়ে গেল। খুব সম্ভব শিমুলতলা ঘাটে রস্তা পার হয়ে সে ওপারে যাবে।

—মানুষটা কে, তা তো চিনতে পারলাম না বাহে?···আপতাব তার কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে একটা ঢোক গিলে বলল—একখানা সাদা কাপড় দিয়া মুখখানা ঢাকা আছিল না?

—মুইও তো তাই দেখলাম···মাহ্‌তাব সায় দিল—কিন্তু চলনটা যেন কিসমতের মতই মনে হইল!

—কিসমত চৌকিদার!···আপতাবের ভ্রু দুটো একটু কুচঁকে উঠল—তা হইতে পারে। কিন্তু কিসমত এই ফজরে চোরের মত কোনঠে যায়?

আপতাবের মাথায় একটা দুশ্চিন্তা ঢুকে গেল।

চাচা ভাতিজায় তৎপরতার সাথে মাঠে লাঙল জুড়লো। আপতাব আলি আর মাহ্‌তাব আলী, চাচা আর ভাতিজা। আশপাশের আট-দশটা গ্রামে অবশ্য তারা আপতাব ডাক্তার আর মাহ্‌তাব মাষ্টার বলেই বেশী পরিচিত।

আপতাবের স্ত্রী যে বছর মারা গিয়েছিলেন, সেই বছরেই বড় ভাই আলতাব আলি অসহায় স্ত্রী এবং শিশুপুত্র মাহ্‌তাবকে রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। সেই থেকে নিঃসন্তান আপতাব মাহ্‌তাবকেই ছেলের মত মানুষ করেছে। ভাবীকেও একদিনের জন্যে উপেক্ষা অবহেলা করেনি। বাড়ির দুই বউ বেঁচে থাকা কালে, চাষবাস, রান্না-বান্না আলাদাই হত। পরে রান্নাবান্না একসাথেই সুরু হল। এখন তারা ষোল আনাই একান্নবর্তী পরিবার।

কাজে মন দিলেও কিসমত চৌকিদারের কথাটাই কিন্তু আপতাবের মাথার মধ্যে নানারকম ভাবে ঘুর ঘুর করছিল। থানাটা হচ্ছে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বড় রাস্তার ধারে, সুন্দরদিঘির হাট ছাড়িয়ে আরো মাইল চারেক উত্তরে। ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসও সুন্দরদিঘির হাটের উপরেই। কিসমত থানায় গেলে সাধারণত সুন্দরদিঘির হাট দিয়ে বোর্ডের অফিস হয়েই গিয়ে থাকে। তাছাড়া আজ সাপ্তাহিক হাজিরার দিনও নয়। রাস্তার এপারে নবীনগর পলিমাটির বারো মাসের তেরো ফসলের গাঁ, কিন্তু ওপারটা লাল উষর খিয়ারী মাটি। শিমুলতলার ঘাট পার হলেই ওপারে সাঁওতালদের ছোট একটি বসতি, নাম তার আঁধারকোঠা। আঁধারকোঠা পার হলেই শুরু হল শাল-পলাশ-মহুয়ার ঘন জঙ্গল। এই জঙ্গলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে একটা সরু পায়ে হাঁটা পথ একটু এঁকে বেঁকে প্রায় উত্তরমুখে চলে বরাবর গিয়ে পেছনে দিয়ে থানার কাছাকাছি বড় রাস্তায় মিশেছে। এই পথে থানায় গেলে প্রায় মাইল দুই কম হাঁটতে হয়, সময়ও লাগে কিছু কম। কিন্তু পথটা খুব চালু পথ নয়। তবে, প্রতিপক্ষের নজর এড়িয়ে থানা, আদালত, মামলা, কবালা করতে হলে ঠেকা বেঠেকায় লোকে এই পথেই যাওয়া আসা করে থাকে।

লাঙল চালাতে চালাতে জমির এক মাথায় গিয়ে মোড় ঘুরবার জন্য একটা বলদের রাশ টেনে অন্যটাকে খেদাতে খেদাতে হঠাৎ আপতাব জিজ্ঞাসা করল—কাল রাতে কার বাড়ি হইতে বাহির হইছিস, কিসমত কি তা টের পাইছে, হ’?

—কে জানে?···ঠোঁট উলটিয়ে মাহ্‌তাব বলে—বাহির হইবার সময়ে তো মানুষের নাগাল পাই নাই।

বলল বটে, কিন্তু মাহ্‌তাবও নিশ্চিন্ত ছিল না। কিসমতের অভিসন্ধিটা কি? গত কয়েক দিনে যে সব উড়ো কথা তার কানে এসেছে সেগুলোর সাথে ব্যাপারটাকে মিলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছিল মাহ্‌তাব। ভাবছিল ভোর রাতে কাপড়ে মুখ ঢেকে চোরা-পথে কিসমত গেল কোথায়! থানায় গেল কি?

কথা বলতে বলতে দুজনেরই হালের মুঠোটা একটু শিথিল হয়ে

এসেছিল। লাঙলের ফালটিকে মাটির মধ্যে তাক্ মতো ডুবিয়ে ধরে গভীরভাবে তারা আবার কাজে মন দিল।

সর্ষে বুনবার জন্য জমিটা চাষ দিয়ে এই বেলার মধ্যেই তৈরি করে ফেলতে হবে। তাই তারা বড় উদ্‌বিগ্ন। পাড়ার জুম্মাঘরে এষার নামাজ শেষ করে বাড়ি ফিরবার পথে সেবাতে আকাশে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আপতাবের মনে হয়েছিল যে চাঁদখানা আধাআধি প্রায় ভরে এসেছে। দিন চার-পাঁচেকেব মাথায় সম্ভবত ওটা পুরো হয়ে উঠে পূর্ণিমা দেখা দেবে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে। এলোমেলো বাতাসও বইছে কখনও কখনও। ভাবগতিক দেখে প্রৌঢ় আপতাবের খনার বচনের কথাটা মনে পড়ে গেল। আশঙ্কা হল, পূর্ণিমা নাগাদ অবশ্যই বেশ কিছু পানি বর্ষাবে। জমিটা তৈরি করে আজকালের মধ্যেই সর্ষেটা বুনে দিতে পারলে ভাল হয়। সর্ষে বোনা আর বৃষ্টি নামার মধ্যে চারা গজানোর জন্য যদি চারটে দিনও হাতে পাওয়া যায় তবে আবাদের খুবই উপকার হবে।

রাতেই কথাটা আপতাব তার ভাতিজাকে বলে পাঠিয়েছিল।

দিন পনেরো আগে সুন্দরদিঘির হাটে একদিন এক পুলিশ কনষ্টেবল ডালা-কুলো বিক্রি করা নিম্নবর্ণের একটি গরীব হিন্দু বিধবাকে হাত ধরে টেনে, লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল তার ডালা-কুলো যা কিছু ছিল। এই বেআদবীর জন্য হাটুরে মানুষের কাছে লোকটা বেদম মার খেয়েছিল সেদিন। পুলিশ পিটানোর এই ঘটনাটি ঘটবার পর থেকে মাহ্‌তাব আজকাল রাতে আর বাড়ি থাকে না। কারণ মাহ্‌তাবকেই এই হাঙ্গামার নেতা বলে থানা থেকে কয়েক দফায় খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে। তাই রাতে এপাড়া-ওপাড়া, এ-গ্রাম সে-গ্রাম কারো না কারো বাড়িতে সে থাকে। সকাল বেলায় এদিক-ওদিক সন্ধান নিয়ে দেখে-শুনে নিজ বাড়িতে ফেরে। ফুরসৎ মত গাঁয়ের প্রাইমারী স্কুলটাতেও প্রায়দিনই লুকিয়ে চুরিয়ে এক চক্কর মেরে সে পড়িয়ে আসে। বাড়িতে যথাসম্ভব খুব কম সময়ই থাকে। দিনভর সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সন্দেহজনক লোকের চোখ এড়িয়ে খবরের কাগজ হাতে মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা, মিটিং, মজলিশ সবই সে করে। আবার রাতে

কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

চাচার কাছ থেকে লোক মারফৎ খবর পেয়ে রাত থাকতে থাকতেই মাহ্‌তাব সেদিন বাড়ি ফিরেছে। তিনটে চাষ আগেই দেওয়া ছিল। দুপুরের আগেই যদি আর এক দফা চাষ দেওয়া যায় তবে বিকেল নাগাদ মই দিয়ে সর্ষের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। সুতরাং এত তাড়াহুড়ো।

হাল ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরতে স্বভাবতই সেদিন আপতাবদের অনেক বেলা হয়ে গেল। বাড়ি ফিরেই আপতাব দেখে, বাইরের আঙ্গিনায় কাঁঠালতলায় বাঁশের মাচার উপরে তার জন্যে একটি রুগী বসে অপেক্ষা করছে। অগত্যা, লাঙল জোয়াল কাঁধ থেকে নামিয়ে বলদগুলোকে একটা গাছের ছায়ায় বেঁধে রেখে আপতাব ডাক্তারকে আপাতত রুগীর দিকে মন দিতে হল।

স্কুলের বেলা অনেক আগেই পার হয়ে গিয়েছিল। কাজেই ঝট্‌পট্‌ স্নান-খাওয়া সেরে মাহ্‌তাবও স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

রাতের শিশিরে ভেজা রিলিফের সড়কের ধুলো ততক্ষণে রোদের তাপে শুকিয়ে এলোমেলো বাতাসে উড়তে শুরু করে দিয়েছে। পাঁথারে পাঁথারে ফুলে বের হওয়া ধানের শীষগুলো যেন সেই বাতাসের ছোঁয়ায় আহ্লাদে হেলে দুলে নাচছিল। কার্তিক মাসের ছোটবেলা, তাই এরই মধ্যে গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা বই-স্লেট-খাতা-পেনসিলের দপ্তর বগলে স্কুলের সামনে ছোট্ট মাঠে এসে ভিড় জমিয়ে ফেলেছে। স্কুল মানে অবশ্য খড় দিয়ে ছাওয়া জানালা দরজাবিহীন একখানা মাটির ঘর মাত্র।

ছেলে-মেয়েরা জটলা পাকিয়ে কি নিয়ে যেন বাকবিতণ্ডা হৈ-হল্লা করছিল। এমন সময়ে পরিচিত একটা পায়ের শব্দে সকলের মধ্যে অস্ফুট একটা সাড়া পড়ে গেল—মাষ্টার! মাষ্টার!

এই ছেলেপেলেরা! মাঠের মধ্যে বসি কিসের মিটিং করোছেন হে?···হাতের মুঠোয় ভাঁজ করা খবরের কাগজটা দিয়ে মাহ্‌তাব মাষ্টার একটা ছেলের পিঠে আস্তে করে একটা আঘাত করল।

সকলেই মাষ্টারকে খবরটা দেবার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। ছোট্ট

রোকেয়া উত্তেজিতভাবে ছুটে মাষ্টারের কাছে গিয়ে কচি গলায় চিৎকার করে বলে উঠল—মাষ্টার, তুমি জব্বর বাঁচি গেছেন!

মাহ্তাব নিচু হয়ে মাটিতে আলগোছে বসে হাসিমুখে আদর করে রোকেয়ার কচি হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে—কেন ময়না?

জটলাটা যখন চলছিল, রোকেয়া তখন একান্ত নিবিষ্ট মনে ওদের আলোচনা শুনছিল। কি সে বুঝেছিল, সে-ই জানে। এখন চোখ বড় বড় করে উত্তেজিতভাবে বললে—নুরুল আমীন তোমাকে ধরতে আইছিল।

—নাজিমুদ্দিনও সঙ্গে ছিল···আর একটি ছোট্ট ছেলে সম্ভবত তার নিজেরও কিছু একটা বলা দরকার মনে করে রোকেয়ার চোখের দিকে চোখ রেখে, সমর্থন পাবার আশায় ঘাড় বাঁকিয়ে অনেকটা আন্দাজেই বললে—কেন রোকেয়া, পিছনে সাইকেলে টোপ মাথায় দেওয়া উডা নাজিমুদ্দিন নয়? সবাই হো হো করে এক দফা হেসে উঠল।

মাহ্তাব জিজ্ঞাসুভাবে লতিফের দিকে তাকাল—কি বাহে?

আলম বলে উঠল—দারোগা তিন-চারজন সিপাই সাথে এই ঠাঁই আইছিল। তোমার কথা পুছ করলে।

—কোন্টা দারোগা তোরা চিনেন, হ'—?

—দারোগা কোন্টা, হামরা কেমন চিনি না! রোশেনাবাদে ভাষাণীর মিটিং-এ যাঁই বক্তৃতা খাতায় লিখি নিলে, তাঁই দারোগা নয়!······অনুযোগের সুরে লতিফ জবাবটা দিল।

দারোগা তাহলে সঙ্গেই ছিল বটে। মাহ্তাব জিজ্ঞাসা করল—কোন্ দিক বুলি ওরা গেল রে?

—মোর সন্দো হয়, কিসমত চৌকিদারের বাড়ি বুঝি গেছে। ক'দিন ধরি কিসমত খুব হাঁটাহাঁটি করোছে···একটি ছেলে মাহতাবের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—তোমাক ধরি দিতে পারিলে কিসমত বুলে পঁচিশ টাকা বখসিস্ পাইবে, হ'?

কথাটা মাহ্তাবের কানেও এসেছে। মাসকয়েক আগে আঁধার-কোঠা অঞ্চলের সাঁওতালদের হয়ে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের বড় কর্তাদের

কাছে একটা ডেপুটেশন নিয়ে গিয়েছিল সে। তারপর থেকে, সাঁওতাল-দের সাথে ফরেস্ট গার্ডদের অহরহ যে সব হাঙ্গামা লেগে থাকে, সেই সব হাঙ্গামার সাথে তার নামটাকে জড়ানোর চেষ্টা থানাওয়ালারা বরাবর করে আসছে। গত মাসে হাটে জবরদস্তি তোলা আদায়ের ব্যাপার নিয়ে যে হাঙ্গামা হয়ে গিয়েছিল তার সাথেও তার নামটা জড়ানো হয়েছে। তাছাড়া সম্প্রতি পুলিশ পিটানোর ঘটনায় তাকেই প্রধান আসামী করে খোঁজাখুঁজি করা হচ্ছে। এখন সব মিলিয়ে তাকে একটা বিপজ্জনক লোক আখ্যা দিয়ে, ধরবার জন্য বেপরোয়া চেষ্টা থানা থেকে অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু পঁচিশ টাকা বখশিস সম্পর্কে থানা থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণার কথা সে জানে না। তবে কথাটা ছড়িয়েছে বটে।

—কতক্ষণ হইল ওরা গেছে রে?···জিজ্ঞাসা করল মাহ্‌তাব।

—এই তো, কেবলিই গেল ওরা। পাড়ার ভিতর দিয়া আইছেন, তাই ওরা তোমার নাগাল পায় নাই। রিলিফ সড়ক ধরিয়া আসিলে ওরা আমাকে আটক করি ফেলাই তো।

দেখতে দেখতে গম্ভীর হয়ে গেল মাহ্‌তাব। কিসমতই বোধ হয় ব্যাপারটাকে তাহলে এতখানি পাকিয়ে তুলেছে। ক'দিন আগে স্কুলের সেক্রেটারী হায়াত মাহমুদ তালুকদার তাকে ডেকে কিসমত সম্পর্কে একটুখানি হুঁশিয়ারও করে দিয়েছিল। কিসমত নাকি কোথাও কোথাও বলেছে যে হাজার হলেও সে হচ্ছে গিয়ে চৌকিদার, বলতে গেলে খাস গবরমেণ্টেরই লোক। কাজেই গবরমেণ্টের দিকেই টেনে তাকে কাজ করতে হবে। চৌকিদারী করতে গিয়ে চৌকিদারী নিয়মকানুন ষোলো আনা না মানলে চলবেই বা কেন? এ-ছাড়া, কিসমত যে দু-এক জায়গায় মাহ্‌তাবের খোঁজও করেছে, সে কথাও মাহ্‌তাবের কানে এসেছে।

মাহ্‌তাবের মুখের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে অনেকেই ব্যাপারটার গভীরতা আন্দাজ করল।

—তোমার নসীবে আজ এই ঠাঁই আর থাকা নাই মাষ্টার।··· মুরুব্বীর মত আলম বললো—ওরা বোধ হয় ফের ঘুরি আসিবে।

মাহ্‌তাব ভাবছিল, কি এখন করা উচিৎ। এমন সময় স্কুলের পেছন

দিকে আখের ক্ষেতটা একটুখানি নড়ে উঠলো।

সড়ক থেকে নেমে, নির্জন গোরস্তানটা ঘুরে পায়ে-হাঁটা সরু পথটা এঁকে-বেঁকে ঠিক যেখানে গিয়ে পাড়ায় ঠেকেছে, সেখানে একটা পাতা-ঝরা কৃষ্ণচূড়া গাছ দাঁড়িয়ে আছে। সেই বিরাট অথচ নিঃস্ব গাছটার নিচে ছোট ছোট দুটি ভাঙা ঘর এমন নীরবে মুখোমুখি খাড়া হয়ে যে মনে হয় যেন কেবলই মাত্র একটা নয়া চাল চালবার পরে দাবার ছক সামনে দুটি খেলোয়াড় গভীব চিন্তায় বিভোব হয়ে রয়েছে। বাইরের দিক থেকে আঙিনাটিকে আড়াল করবার চেষ্টা করছে ততোধিক জীর্ণ একখানা কঞ্চিব বেড়া। সবটা মিলে এই শ্রীহীন প্রায় বে-আব্রু আস্তানাটাই হচ্ছে কিসমত চৌকিদারের বাড়ি।

কিসমত কিছুক্ষণ হল মাত্র বাড়ি ফিরেছে। খুব ভোরে সে আজ বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। কোন্ সময়ে অজান্তে পাশ থেকে গুট করে উঠে যে লোকটা পালিয়েছে তা ঘুমের ঘোরে বউ বহিমা টের পায়নি। যতবারই সকাল থেকে কথাটা সে ভাবছিল ততবারই দপ্ কবে রহিমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠছিল। অবশ্য বিশেষ কোনও প্রয়োজন দেখা দিলে, সময় হোক, অসময় হোক, চৌকিদারকে থানায় ছুটতে হবেই। কিন্তু একটিবার বলেও যাবেনা, এ কেমনতব কথা!

বাড়ি ফিরবার পথে, কোথায় যেন জল কাদা ঘেঁটে গোটা আষ্টেক শিঙ্গি আর চার পাঁচটা সরু সরু কৈ মাছ গামছায় করে বেঁধে এনেছিল কিসমত। ঘবের চালে লট্‌কানো খালুইটা নামিয়ে মাছগুলো তাতে রেখে সেটা যখন রহিমার সামনে সে এগিয়ে দিল তখন রহিমা আড়চোখে চেয়ে তা দেখল বটে, তবে কিছুই বলল না। কিন্তু গুন্ গুন্ করে গান করতে করতে খুব যত্নের সাথে হাত পা কাঁধ নাক মুখ থেকে কাদার দাগগুলো পরিস্কার করে মুছে গা ধুয়ে একটুখানি পরিপাটি হবার উদ্দেশ্যে মাথায় দেবার জন্যে নিতান্ত সাদা মনে রহিমার কাছে গিয়ে যেই সে হাতের তালু পেতে দিয়ে একটু তেল চাইল, অমনি রহিমা যেন তেলে-বেগুনেই জ্বলে উঠল—লজ্জা-সরম বুলি কি কিচ্ছুই মানুষের থাকা লাগে না?

—মানুষের তো লাগেই। কিন্তু চৌকিদারের তা লাগে না।··মহা

দার্শনিকের মত কথাটা বলে হাতখানা নিজ স্বল্লায়তন কালো দাড়ির গুচ্ছটুকুতে রেখে কিসমত রহিমার মুখের দিকে চোখ তুলে চাইলো—কিন্তু সে কথা কেন ?

সে কথা কেন!……অতল বিস্ময়ে এবং ভয়ঙ্কর রাগে রহিমার গোলগাল ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে উঠলো—মুইও চৌকিদারের বেটি আছিনু। কিন্তু মোর বাপ-ভাইয়ে চাষ-আবাদ ছাড়িয়া তোমার মত কেবল দারোগা-সিপাইয়ের পাছে পাছে দৌড়ায় নাই। কাল রাতেই আধপেটা খাইছেন। জানেন, চাউল ঘরে নাই। কিন্তু তার ব্যবস্থা কি করছেন শুনি ?

—ওহ্, এই কথা…কিসমত যেন কিছুটা আশ্বস্ত হল। তবু প্রসাধনের এমন মৌজটা টুটে যাওয়ায় তার যেন একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

—কথা কন না কেন ? …রহিমা আবার সাপের মত ফণা ধরে ফোঁস করে উঠলো। মনে হল, নাকের ছোট্ট রুপোর নাকফুলটা বুঝি তার ছিটকে পালিয়ে যাবে।

কার্ত্তিক মাসের দিন। পাঁথারের ধান কেবলই মাত্র ফুলে বেরুচ্ছে। সুতরাং বক্তব্য বিশেষ কিছু আর যে ছিল তা নয়। বেলা যথেষ্টই হয়েছিল, পেটে ভুখও ছিল বেশ। ভাত যে রান্না হয় নি তাও অস্পষ্ট নয়। তবু রহিমার মুখখানার দিকে তাকিয়ে ভাটি-বয়সী কিসমতের কেন যে নির্লজ্জের মত একটু রসালাপের ইচ্ছে জাগলো, তা সেই জানে। সে বলে ফেললো—মোর কি ? এমনি তো পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়। তার উপর উসকা খুসকা চুল মাথায় গাজীর বাঁশের মত নাচন দেখি মানুষে তোর ভাতারকেই পাগলা বাউড়া বুলি ক্ষেপাইবে।

ঢোলকের বাজনার সাথে সাথে গাজীর বাঁশের সেই ধিনিকি-ধিনিকি নাচনের ছবিটা চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠায় রহিমা প্রথমটায় ফিক্ করে হেসে ফেললো বটে কিন্তু পরমুহূর্তেই তার চেহারাটা অন্য রকম হয়ে গেল—ভাত দিতে পার না, তাঁই ভাতার! একটা বেটা-পুত থাকিলে, বোধ করি মোর এতখানি অবহেলা হইত না হায়…পুঞ্জীভূত অসন্তোষের ঝাঁঝ রহিমার চোখেমুখে ফুটে বের হল।

এক্ষুণি যে প্রচণ্ড বেগে ঝড় উঠবে সেটা স্থির বুঝে পালানোর জন্য

ছটফট করছিল কিসমত, এমন সময়ে মুস্কিলটার আসান এল সম্পূর্ণ অন্য একটা পথ বেয়ে।

কিসমতের ভাঙা ঘর দুখানার মধ্যে ঢেঁকি ঘরের বেড়াটা এখনও তবু কিছুটা ভাল আছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ বিদ্যুতের মত চকিতে রহিমা ছুটে গিয়ে সেই ঘরের ভেতরেই ঢুকে পড়লো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের পথের উপর থেকে সাইকেলের কিট কিট শব্দের সাথে অনেকগুলো জুতোর ভারি মস্ মস্ আওয়াজ কানে ভেসে এল, কারা যেন কিসমতের নাম ধরেই হাঁক দিল।

আব্রু রক্ষার জন্য মোতায়েন আঙিনার এই কঞ্চিসার বৃদ্ধ বেড়াটা সুযোগ পেলেই রহিমার সাথে এরকম মর্মান্তিক রসিকতা না করে ছাড়ে না। সে তার খাটো এবং জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া পরনের শাড়িখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে ঢেঁকি ঘরের মধ্যে অগত্যা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটুখানি পান-সুপারীর আয়োজন কিসমত এ পর্যন্ত করেই উঠতে পারে নি, তাই উপরওয়ালার উপস্থিতিতে সম্বর্ধনার জন্য সে যেন হঠাৎ যাদুমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে উঠল।

ঘরে একখানা বসবার মোড়া ও চলনসই মাদুর আছে। কিন্তু সেগুলো তার মনে ধরল না। হন্তদন্ত হয়ে গায়ে নীলপোষাকটা চাপিয়ে বেল্ট কষতে কষতে মেহ্মানদের বসবার জন্য পাড়াপ্রতিবেশীর বাড়ি দৌড়া-দৌড়ি করে খান দুই ভাঙা চেয়ার ও একখানা বেঞ্চ টানাটানি করে এনে বাড়ির সম্মুখে পথের উপর মহা এক হুলস্থুল সে বাধিয়ে দিল। দারোগা সাহেবের সেখানে বসবার কারণ বা রুচি কোনটাই ছিল না। সুতরাং তিনি ধমক দিয়ে শিগগির বের হবার জন্য কিসমতকে প্রচণ্ড এক তাড়া লাগালেন। কিন্তু কিসমত চৌকিদারের সৌজন্যবোধও যেমন তুখাড় হয়ে উঠল, সাহেবকে খেদমত করবার সঙ্কল্পও যেন তেমনই অটল হয়ে দেখা দিল। ধমক খেয়েও কুকুর যেমন লেজ নাড়ায় অনেকটা সেই রকমই, হাত কচলাতে কচলাতে সে হি হি করে হাসতে লাগল—সামান্য একটু গুয়া-পানের আয়োজন, উডার অনুমতি না দিলে স্যার, সেডা কেমন হয়! ···তার চোখ দুটো কুকুরের মতই মিনতি প্রার্থনায় করুণ হয়ে উঠলো।

দারোগা সাহেবের পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল, তবু সংযতভাবে তিনি যেন

কি বলতে যাচ্ছিলেন। পাড়াপ্রতিবেশীর চার-পাঁচ বছরের একটি ছেলের মাথায় অযথাই একটা চাঁটি মেরে কিসমত তাকে বললো—যান্ তো বাপ আলাবক্সো, বাড়ি হইতে পানবাটা ধরি আন দেখি···মুখের কথা মুখেই শেষ না হতে অবশ্য সে নিজেই বিঘে খানেক তফাতে আলবক্সের বাড়ির দিকে ছুটলো পান-সুপারী সংগ্রহের জন্যে।

অনুরোধে ঢেঁকি সবাইকেই গিলতে হয়, দারোগা সাহেবও রেহাই পেলেন না।

পানটা মুখে দিয়ে ম্যাচের কাঠি ঠুকে দারোগা সাহেব সিগারেটটা ধরাতে না ধরাতেই অবশ্য, বাড়ির ভেতরের উদ্দেশ্যে চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতি যথাস্থানে ফেরৎ দেবার নির্দেশ দিতে দিতে পাগড়ী মাথায় বল্লম হাতে বিদ্যুৎগতিতে এসে সম্মুখে খাড়া হল কিসমত। কিন্তু দারোগা সাহেব তখন মনে মনে এত অস্থির বোধ করছিলেন যে তার এই তৎপরতার প্রতি কোনও তারিফসূচক মন্তব্য করা তো দূরের কথা, অধৈর্যের সাথে তিনি প্রায় মুখ ভেংচিয়ে উঠলেন—চলো, চলো! বড্ড লেট করিয়ে দিলে হে!

কিসমতই সকলের আগে কদম বাড়াল।

—কোন দিক যাচ্ছো!······বিরক্ত হলেন দারোগা।

—স্যার ··মুখ কাঁচুমাচু করে কিসমত বল্লে—স্কুলের সেক্রেটারির বাড়ি স্যার।

ফেরার লোককে বাড়িতে খোঁজাখুজি করে বিশেষ কোনও ফয়দা হবে না। দারোগা সাহেব মনে মনে সায় দিলেন, লোকটার বুদ্ধি আছে বটে। সেক্রেটারিটাকে একটা জোর ধাঁতানি দিতে হবে, বেটা কমিউনিষ্ট পুষছেন! মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি নাম হে লোকটার?

—হেত মামুন স্যার।

—হেত মামুন! ব্যঙ্গ করে বল্লেন দারোগা—সে আবার কোন বামুনের বেটা হে?

কবিরাজ স্যার···বল্লমখানা দুই পায়ের ফাঁকের মাঝখানে কায়দা মাফিক চেপে ধরে অকারণেই মাথার পাগড়ীটা একবার খুলে ফেলে আবার সেটা যুতসইভাবে মাথায় বাঁধতে বাঁধতে অনেকটা চৌকিদারি

ভাষাতেই কিসমত বললে—হামার গাঁয়েরই স্যার। সাত নম্বর সুন্দরদিঘির বোর্ডের অধীন মৃত জান মাহমুদ তালুকদারের বেটা।

টুপি, সাইকেল, বুট, বল্লম সমেত সমস্ত দলটা নড়েচড়ে উঠল মৃত জান মাহমুদ তালুকদারের ছেলে কবিরাজ হায়াত মাহ্‌মুদ তালুকদারের বাড়ির উদ্দেশ্যে। কিন্তু ততক্ষণে সাদা, কালো, লাল, খয়েরী প্রায় আধ ডজন কুকুরও ঘেউ ঘেউ করতে করতে এসে জুটে গিয়েছে। কিসমত একলাই এতক্ষণ যা কিছু হাঁক-ডাক করছিল। ভাবে মনে হচ্ছিল, গাঁয়ের লোকের নিস্পৃহতার ফলে তার উপরওয়ালার যথেষ্ট সমাদর হচ্ছিল না বলে কিছুটা সে অতৃপ্তি বোধ করছিল। এখন কুকুরের চিৎকারে দ্বিগুণ উৎসাহে কখনও বল্লমের ভয় দেখিয়ে কখনও বা মাটি থেকে ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে তাই ছুঁড়ে হৈ-হৈ করে কুকুর তাড়াতে তাড়াতে সত্যিই গাজীর বাঁশের নাচনের মতই পাড়াময় সোরগোল তুলে সমস্ত দলটিকে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

হোমিওপ্যাথি ঔষধের হাতবাক্সটা ঘাঁটাঘাঁটি করে কয়েক পুরিয়া ব্রাইয়োনিয়া দিয়ে রুগীকে বিদায় করে গোয়াল ঘরের সামনে সবেমাত্র চাড়িতে ঘাসের সাথে খইল মেখে দিয়ে গরুর খাবার ব্যবস্থা করেছিল আপতাব। এমন সময় চাপা গলায় মাহ্‌তাবের মা দেওরকে ডাকলেন—মিয়া! শুনি যান জলদি!

যেতে অবশ্য হল না। বুড়ি নিজেই খড়ম ঠক্‌ঠক্ করতে করতে গোয়াল ঘরের দিকে এগিয়ে এলেন। পর মুহূর্তেই কাঁধে গামছা ফেলে আপতাব বাড়ির পেছনে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চোরা পথে বাইরে বের হয়ে গেলেন।

মিনিট দশেক বাদে আপতাব যখন কতকটা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরছিল তখন বাড়ির সামনে রিলিফ সড়কের ধারে কদম গাছের তলায় দারোগা পুলিশের দলটার সাথে তার দেখা হয়ে গেল।

—মাহ্‌তাব বাড়ি আছে, হ'? ···চক্ষুলজ্জাহীন কিসমতই প্রথম কথাটা জিজ্ঞেস করল।

দালাল কিসমতের মুণ্ডুটা চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল আপতাবের! কিন্তু, সেও যেন তাকে বৃথাই খুঁজে হয়রান হয়েছে এমনই অসহায়ের ভঙ্গীতে অনায়াসে সে বলে ফেলল—বাড়িতেই তো আছিল মাতাব। কোন্ দিক বুলি বা গেছে তা আল্লাই জানে।

—আল্লা জানে! তুমি জান না?…কটমট করে তাকাল কালো চাপ-দাড়িওয়ালা কনস্টেবলটি।

আপতাবের কান দুটো লাল হয়ে উঠল।

—ইস্কুল যায় না সে?…বেশ ডাঁটের সাথেই জিজ্ঞাসা করলেন দারোগা সাহেব। দারোগা সাহেব মোটামুটি একটা খবর ঠিকই পেয়েছিলেন যে মাহ্‌তাব মাষ্টার স্কুলে প্রায় নিয়মিতই এসে থাকে।

—যায় তো। কিন্তু ইস্কুল বুঝি আজ ছুটি নাকি…আম্‌তা আম্‌তা করে বলল আপতাব।

—কেন, তোমার বাপের আজ ফতেয়ার তারিখ নাকি…বিদ্রুপের সাথে ভ্রুকুটি করলেন দারোগা।

—তবে বুঝি ইস্কুল খোলাই আছে!

একে তো মেয়ে-মরদ, বুড়ো-বাচ্চা সমস্ত গ্রামবাসীর নিষ্ক্রিয় অথচ কৌতুহলী চাহনি পরিবেষ্টিত হয়ে একপাল অসভ্য কুকুর পেছনে নিয়ে গোটা গ্রামখানা এভাবে সঙ সেজে ঘুরে বেড়াতে বেজায় অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তাতে অল্পের জন্যই মাহ্‌তাবকে বাড়িতে পাওয়া গেল না স্থির বুঝতে পেরে দারোগা সাহেব এবারে রেগে একেবারে গুম হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটু ইন্ধন যোগানোর উদ্দেশ্যে ফর্সাপানা বেঁটে পশ্চিমা পুলিসটি কিসমতকে বকাবকি করে বলল—তুমি একটা বুড়বক্ আছো কিসমত। সমুচা মাটি করে দিলে তুমি।

কাজের মধ্যে কোন গোলমাল হয়ে গেল উপরওয়ালারা যে অধস্তনকেই দায়ী করে থাকে এটা সমস্ত স্তরের অধস্তনদেরই জানা কথা। সুতরাং কিসমত তাতে কিছুমাত্র দমল না। উৎসাহের সাথে চোখ টিপে অবলীলাক্রমে বলল—না সিপাইজী, এইডা ভাল হইছে। চাইর-চাইরডা সাইকেল আছে আমাদের, ইস্কুল ছাঁদিয়া ধরা যাইবে… স্কুলের চারিদিক থেকে ঘেরাও করে ছেঁদে, সাইকেল দাবড়িয়ে হুইসেল

বাজিয়ে মাহ্‌তাব মাষ্টারকে ধরে বেঁধে আনবার চৌকিদারী রোমাঞ্চে সে তখন বেশ মশগুল হয়ে উঠেছে। বাড়ি থেকে মামুলিভাবে ধরা পড়ে গ্রেপ্তার হয়ে গেলে মাহ্‌তাব তার মানুষ শিকারের এমন মজাটা অনায়াসেই মাটি করে দিতে পারতো।

কিন্তু দারোগা সাহেবের মেজাজ এর আগে স্কুলের সেক্রেটারী হায়াত মাহমুদ কবিরাজের বাড়িতেই বিগড়ে গিয়েছিল, তিনি চাপা বিরক্তিতে কিসমতের দিকে চেয়ে বললেন—বড্ড বক্‌বক্‌ কর হে তুমি!

তবে বেশ বুঝা গেল, দারোগা সাহেবও উপস্থিত কর্তব্য ঠিক কি হবে তা স্থির করতে পারছিলেন না। তিনি ভেবে এসেছিলেন আচমকা স্কুলটায় হানা দিয়ে অতি স্বচ্ছন্দে টুক করে মাহ্‌তাব মাষ্টারকে তুলে নিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু ব্যাপারটা তার ধারপাশ দিয়েও গেলনা দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

—বাড়ি তল্লাসী করা হইবে কি? অতি বিনীতভাবে নিবেদন করল কিসমত—যদি ঘরে লুকায়ে থাকে!

কিসমতের চোখ দুটি আবিষ্কারের সম্ভাবনায় বেড়ালের চোখের মত জ্বল জ্বল করে উঠল।

কিন্তু না। এখানে আর দেরি না করে সমস্ত দলটা আবার স্কুলের দিকে ফিরে যাওয়াই স্থির করল।

স্কুলে যখন আবার তারা গিয়ে পৌঁছল তখন স্কুলটা একেবারেই ফাঁকা। একমাত্র কালজামের গাছটা তাদের ব্যঙ্গ করবার জন্য সেখানে একা একা দাঁড়িয়েছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারটা তখন কেবলই বেশ জমে উঠেচে। আঁধার-কোঠার জঙ্গলের মধ্যে একটি মেটে কুটিরের আঙিনায় মহুয়া গাছের তলায় একখানা দড়ি দিয়ে বোনা বাঁশের নিচু খাটিয়ায় বসে তিন-চার জন লোক পরিবেষ্টিত হয়ে গল্প শুনতে শুনতে আখ চিবোচ্ছিল মাহ্‌তাব। বছর বিশেকের একটি তরুণী হাত পা নেড়ে কি যেন বলছিল। তার কালো মিষ্টি চেহারাখানা তখন সন্ধ্যার আঁধারে মহুয়া গাছের ছায়ায়

একেবারেই প্রায় মিলিয়ে গিয়েছিল। শুধু তার খোঁপার বুনো ফুলের ধবধবে সেই গুচ্ছটি তখনও মুগ্ধ মাহ্‌তাবের চোখ দুটোকে ফাঁকি দিতে পারেনি। আকাশে চাঁদটা উঠবার অপেক্ষায় সে রয়েছে। চাঁদটা উঠলেই, শিমুলতলার ঘাটে রত্না পার হয়ে মাহ্‌তাব আবার নবীনগরেই ফিরে যাবে।

দুপুরবেলায় স্কুল ছুটি দিয়ে আখের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে পথ খুঁজে খুঁজে রত্না পার হয়ে মাহ্‌তাব পালিয়ে এসেছিল এখানে। এপারে আশ্রয় অবশ্য সুলভ কিন্তু খাদ্য বড়ই দুর্লভ। সাঁওতাল বাড়িতে খাওয়া দাওয়া মুসলমান সমাজে নিষেধ। কিন্তু সেটাও মাহ্‌তাবের কাছে বড় কথা নয়। প্রয়োজনবোধে সমাজের পাঁচজনে জানতে না পারে এমনভাবে লুকোচুরি করে সাঁওতাল বাড়িতে খেতে তার আপত্তি নাই। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, খাবে যে সে খাদ্য কোথায়? নবীনগরে এ সময়টা যদি সিকি ভাগ লোকের অর্ধাহার অনাহার শুরু হয়ে থাকে, এপারে প্রায় ষোল আনা লোকেরই সেই অবস্থা। বেশীর ভাগ লোক এখন খাবার জন্য মাটি খুঁড়ে বুনো আলু সংগ্রহ করছে। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে এই যে, সবচেয়ে বেয়াড়া ধরনের ওলের চেয়েও এ আলু বহুগুণে হিংস্র। তবে পেটের ভুখা কত অপাঙ্‌ক্তেয় জিনিসকে তার প্যাঁচে প্যাঁচে জড়িয়ে দিনে দিনে যে মানুষের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে তুলেছে, সভ্যতার ইতিহাসই তার সাক্ষী হয়ে আছে। এখানকার সাঁওতালেরা বন-জঙ্গলের মধ্যে থেকে খুঁজে খুঁজে মাটি খুঁড়ে বুনো আলু তুলে, পারলে দু-এক দিন তা ঘরে রাখে। তারপর সেগুলো ফালি ফালি করে কেটে একটা ঝাঁকায় করে রত্নার স্রোতে ডুবিয়ে রেখে আসে। দু-এক দিন বাদে আলুর বিষাক্ত কষগুলো যখন সব ঝরে গিয়ে স্রোতে ধুয়ে চলে যায় তখন সেগুলো রোদে শুকিয়ে ঘরে তুলে নেয়। এর পর তা সিদ্ধ করে যেমন খুশি খাওয়া চলে।

আঁধারকোঠার সাঁওতালেরা তো তবু যা হোক একটা বিকল্প ব্যবস্থা বের করেছে। কিন্তু নবীনগরে আবার তা চলে না। এক সময়ে সাঁওতালেরাও যখন বুনো আলু খেত না তখন এগুলো ছিল শূয়োরের খোরাক। শাস্ত্রীয় বিধির চুলচেরা বিচারে এই বুনো আলুকে 'হারাম'

অর্থাৎ অবৈধ খাদ্য হিসাবে গণ্য করা চলে কি চলে না তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। তবে একটা অবাঞ্ছিত স্মৃতি এর সাথে জড়িত থাকায় আজো তা 'শূয়োরে আলু' নামে অভিহিত হয়ে নিছক সংস্কারবশেই 'হারাম' হয়ে আছে। আজো ঐ নবীনগরের মুসলমান সমাজে বৈধ পবিত্র খাদ্য হিসাবে পাঙ্‌তেয় হয়ে উঠতে পারেনি।

যাই হোক, টুঁইলা সর্দারের মেয়ে সুখ্‌মীকেই রত্নার ওপারে পাঠানো হয়েছিল সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে আনতে। সেই সুখ্‌মীই তার সংগৃহীত বিবরণ এতক্ষণ ধরে মহুয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাখিল করছিল। সুখ্‌মী যেমন সাহসী তেমনই বুদ্ধিমতী। সে এক বোঝা জ্বালানী কাঠ মাথায় করে বিক্রির ছলে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে সুন্দর-দিঘির হাট পর্যন্ত বেড়িয়ে দেখে এসেছে। দারোগা-পুলিশ কেউ কোথাও নেই। শুধু সুন্দরদিঘির হাটখোলার কাছে বোর্ডের অফিসের বারান্দায় কিসমত চৌকিদারকে শুকনো মুখে বসে থাকতে দেখেছে সুখ্‌মী। থানা পর্যন্তও যেতে পারতো সে। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সন্ধ্যার মুখে ফিরবার সময়ে পথের পাশে ক্ষেতভরা আখ দেখে সুখ্‌মীর মনে পড়ে গেল মাষ্টারের ক্ষুধার্ত মুখখানার কথা। তাই সে দুটো ভাল দেখে আখও ভেঙে নিয়ে এসেছে।

আখ চিবোতে চিবোতে মুগ্ধ হয়ে কাহিনীটা শুনছিল মাহ্‌তাব। ছেলেমানুষী ঢঙ-এর কথাগুলো বেশ লাগছিল তার। সুখ্‌মী অবশেষে বললো—তুমার কুছু ডর নেই মাষ্টার। পুলিশ-ফুলিস তল্লাটের মধ্যে কই নেই। বাপ-মায়ের বেটা বাপ-মায়ের কাছে যাও। ঘরে যাইয়ে কুছু খাও। জবর ভুখ লাগছে তুমার।

বুকখানা ভরে উঠলো মাহ্‌তাবের। সুখ্‌মীর দরদ মাখানো কথাগুলোয় কি রকম যেন একটা জাদু আছে।

টুঁইলা সর্দার উপস্থিত ছিল সেখানে। সেও সুখ্‌মীর কথাতেই সায় দিল।

আজই যখন একটা হামলা হয়ে গেল, তখন দু-একদিন যে আপাতত ওঁরা হানা দেবে না তা মাহ্‌তাবও আন্দাজ করতে পারে। কিন্তু সে ভাবছিল অন্য কথা। ভোর রাতে রত্না পার হয়ে চোরাপথে

কিসমতই যে থানায় গিয়ে সংবাদ দিয়ে দারোগা-পুলিশ ডেকে নিয়ে এসেছে এ বিষয়ে মাহ্‌তাবের মনে আর কোনও সন্দেহ নাই। এখন কথা হচ্ছে, গাঁয়ের ভেতরে থেকে লোকটা যদি এরকম শয়তানি শুরু করে তবে কয়দিনই বা এভাবে পালিয়ে পালিয়ে টিকে থাকা সম্ভব হবে!

আকাশে চাঁদ দেখা দিয়েছিল। আখ চিবোতে চিবোতেই মাহ্‌তাব রওনা দিল। মনে মনে ঠিক করল সে যে তুই-একদিনের মধ্যেই রোশে-নাবাদের সহকর্মীদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করে একটা শলাপরামর্শ করবে।

টুঁইলা সর্দার আর তার সম্বন্ধী ঝলুক মাঝি মাহ্‌তাবকে খানিকদূর এগিয়ে দিল। সুখ্‌মীও প্রায় রত্নার ধার পর্যন্তই নিঃশব্দে তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল।

শিমুলতলা ঘাটের কাছাকাছি এসে ওকে বিদায় দিয়ে মাহ্‌তাব আস্তে আস্তে জলের ধারে নেমে এল। একটা বুনো ফুলের সৌরভে নদীর ধারটা মৌ মৌ করছিল। কেন যেন বড় ভাল লাগছিল মাহ্‌তাবের।

রত্না ছোট হলেও তেজী। বনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত এ নদীর বুকে লুকিয়ে আছে অজস্র ছোট ছোট ঝরা। পাতাল ফুঁড়ে সেই ঝরাগুলোর মুখ দিয়ে অনবরত ঝির ঝির করে বের হয়ে আসছে জলের ধারা। তাই অগভীর হলেও কোন সময়েই এ শুকিয়ে যায় না। এখন তো কার্তিক মাস। চৈত-বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মেও এক হাঁটু জলে টের পাওয়া যায় তার তীব্র পাহাড়ী স্রোতের মেজাজ। রত্নার বুকে চাঁদখানা গলে গলে ছলকে ছলকে ভেসে যাচ্ছিল। মাহ্‌তাব সেই চাঁদনী-মাখা জলে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে নেমে পড়ল।

ওপারে গিয়ে জল ছেড়ে তীরে উঠতে যাবে মাহ্‌তাব এমন সময়ে তার নজরে পড়ল সামান্য একটু উজানে জলের একেবারে ধারে কে একটা লোক চুপচাপ বসে রয়েছে। হঠাৎ এমন মিঠে মেজাজটা তার ভয়ঙ্কর রকম বিগড়ে গেল। কতখানি স্পর্ধা! এ রাতে কে এখানে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে রে!

হাঁক ছাড়ল মাহ্‌তাব—কে রে মানুষ উডা!

জবাব দেওয়া তো দূরের কথা, লোকটা পড়ি মরি করে ছুট দিল। কিন্তু জোয়ান মাহ্‌তাবের তখন জেদ চেপে গিয়েছে। দৌড়ে গিয়ে

লোকটাকে সে পেছন থেকে জাপ্‌টে ধরে ফেললো।

—মাতাব!

কিসমতের গলা নয়? উত্তেজিত মাহ্‌তাব আগে খেয়াল করেনি। এখন ভাল করে চেয়ে দেখে, তার ছ'বাহুর কবলের মধ্যে অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে কিসমত দুই হাতে শক্ত করে একখানা ঝাঁকা ধরে রয়েছে আর তাতে ফালি ফালি করে কাটা এক রাশ 'শূয়োরে আলু'।

মাহ্‌তাব হকচকিয়ে গেল।

কিসমতের গলাটা শুকিয়ে উঠেছিল। একটা ঢোক গিলে বললো —সব মানুষকে তো কওয়া যায়না মাতাব! তবে তোমাক্ কওয়া চলে। ফজরে আসিয়া মানুষজন ওঠাব আগেই মাটি খুঁড়ি চুপি চুপি এই আলু তুলিয়া কাটিয়া পানির সোঁতায় আজ ডুবায়ে রাখছিলাম।

ভোরবেলায় কথাটা মাহ্‌তাবের মনে পড়ে গেল। কিন্তু, কি বলবে মাহ্‌তাব ঠাহর করতে পারছিল না। কিছুই অবশ্য বলতে হল না। দেখতে দেখতে কিসমতের স্বাভাবিক মেজাজ ফিরে এল। বললো— মাতাব, দিন কয়েক ইস্কুল করা তুমি বাদ দেন। এই খবরটা তোমাক্ দিবার জন্য মুই কত মানুষকে তোমার কথা পুছ কবছি! আজ হঠাৎ ওরা আসিয়া পড়িলে, আলাবক্সের বাপেক দিয়া তোমার মাকে খবরটা পাঠায়ে, কত রঙ্‌ঢঙ্‌ ছল বাহানা কবি শয়তানদের যে মুই ঠেকাইছি তা খোদাই জানে।

কোমরের কাছ থেকে ভাঁজ করা ছোট একটা বস্তা বের কবে তাতে ভিজে ঝাঁকা থেকে আলুগুলো তুলে তুলে ভরছিল কিসমত। একটু থেমে বললো—হাটের ইজারাদার তমিজ হাজী কইলে, তোমাক্ থানায় ধরি দিতে পারিলে উঁই আমাকে নগদ পঁচিশ টাকা বখশিস্ দিবে। পঁচিশ টাকায় দেড মণ ধান পাওয়া যায় ঠিকই। কিন্তু মাতাব, তোমরা দশের খেদমত করেন। সেই ভাত কি মোর হারাম হইত না?

বিমুগ্ধ মাহ্‌তাব তখনও কিছু বলতে পারল না। চাঁদের আলোয় ঝাঁকা ভর্তি ফালি ফালি করে কাটা 'শূয়োরে আলু'গুলো দেখে শুধু তার মনে হল যে কিসমতের পবিত্র স্পর্শে ওগুলো আজ 'হালাল' হয়ে উঠেছে।

জোঁক

আবু ইসহাক



আবু ইসহাকের জন্ম (১৯২৬) অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার শিরঙ্গল গ্রামে। উপন্যাসিক এবং গল্পকার রূপে বিশেষ পরিচিত। পেশায় সরকারী চাকুরিয়া, প্রথম জীবনে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ইন্সপেকটর রূপে কাজ করেন (১৯৪৪-৪৮) এবং পরে পুলিস বিভাগে কর্মগ্রহণ করেন। বাংলার সাধারণ মানুষই তাঁর গল্প উপন্যাসের নায়ক, তাদের দুঃখ-কষ্ট, প্রেম-ভালোবাসা, বাঁচবার সংগ্রামই তাঁর গল্প উপন্যাসের উপজীব্য। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'সূর্যদীঘল বাড়ী' প্রকাশিত হলে (১৯৫৫) পাঠক মহলে সাড়া জাগে এবং উভয় বাংলাতেই তিনি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। এই উপন্যাসের জন্য তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৫৩) লাভ করেন। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : হারেম (১৯৫৩) এবং মহাপতঙ্গ (১৯৫৩)।

সেদ্ধ মিষ্টি আলুর কয়েক টুকরো দিয়ে পেটে জামিন দেয় ওসমান। ভাতের অভাবে অন্য কিছু দিয়ে উদরপূর্তির নাম চাষী-মজুরের ভাষায় পেটে জামিন দেয়া। চাল যখন দুর্মূল্য তখন এ ছাড়া উপায় কি?

ওসমান হুকা নিয়ে বসে। মাজু বিবি নিয়ে আসে রয়নার তেলের বোতল। হাতের তেলোয় ঢেলে সে স্বামীর পিঠে মালিশ করতে শুরু করে।

ছ'বছরের মেয়ে টুনি জিজ্ঞেস করে—এই তেল মালিশ করলে কি অয় মা?

—পানিতে কামড়াইতে পারে না। উত্তর দেয় মাজু বিবি।

—পানিতে কামড়ায়! পানির কি দাঁত আছে নি?

—আছে না আবার। ওসমান হাসে,—দাঁত না থাকলে কামড়ায় ক্যামনে?

টুনি হয়ত বিশ্বাস করত। কিন্তু মাজু বিবি বুঝিয়ে দেয় মেয়েকে—ঘাস-লতা-পাতা, কচু-ঘেচু পইচ্যা বিলের পানি খারাপ অইয়া৹ যায়। অই পানি গতরে লাগলে কুটকুট করে। ওরেই কয় পানিতে কামড়ায়।

ওসমান হুকা রেখে হাঁক দেয়—কই গেলি তোতা? তামুকের ডিব্বা আর আগুনের মালশা লইয়া নায় যা। আমি আইতে আছি।

তেল নিয়ে এবার ওসমান নিজেই শুরু করে। পা থেকে গলা পর্যন্ত ভাল করে মালিশ করে। মাথা আর মুখে মাখে সর্ষের তেল। তারপর কাস্তে আর হুকা নিয়ে সে নৌকায় ওঠে।

তেরোহাতি ডিঙিটাকে বেয়ে চলে দশ বছরের ছেলে তোতা। ওসমান পায়ের চটচটে তেল মালিশ করতে করতে চারিদিকে চোখ বুলায়।

শ্রাবন মাসের শেষ। বর্ষার ভরা যৌবন এখন। খামখেয়ালী বর্ষণ বৃষ্টির। আউশ ধান উঠে যাওয়ায় আমন ধানের গাছগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের সতেজ ডগা চিকচিক করছে ভোরের রোদে।

দেখতে দেখতে পাটক্ষেতে এসে যায় নৌকা। পাটগাছগুলোর দিকে

তাকিয়ে ওসমানের চোখ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। যেমন মোটা হয়েছে, লম্বাও হয়েছে প্রায় ছুই মানুষ সমান। তার খাটুনি সার্থক হয়েছে। সে কি যেমন তেমন খাটুনি। রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে ক্ষেত চষোরে—ঢেলা ভাঙ্গোরে—'উড়া' বাছোরে—তারপর বৃষ্টি হলে আর এক চাষ দিয়ে বীজ বোন। পাটের চারা বড় হয়ে উঠলে আবার ঘাস বাছো, 'বাছট' করো। 'বাছট' করে খাটো চিকন গাছগুলোকে তুলে না ফেললে সবগুলোই টিঙটিঙে থেকে যায়। কোষ্টাই আর পাওয়া যায় না মোটেই।

এত পরিশ্রমের ফসল কিন্তু তার একার নয়। সে-ত শুধু ভাগচাষী। জমির মালিক ওয়াজেদ চৌধুরী ঢাকায় বড় চাকরী করেন। দেশে গোমস্তা রেখেছেন। সে কড়ায় গণ্ডায় অর্ধেক ভাগ আদায় করে নেয়। মরশুমের সময় তাঁর ছেলে ইউস্থফ ঢাকা থেকে আসে। ধান পাট বিক্রি করে টাকা নিয়ে আবার ঢাকা চলে যায়। গত বছর বাইনের সময় ও একবার এসেছিল। এসে কাগজে কাগজে টিপসই নিয়ে গেছে ভাগচাষী-দের। এর আগে জমির বিলি-ব্যবস্থা মুখেমুখেই চলত।

দীর্ঘ স্থপুষ্ট পাটগাছ দেখে যে আনন্দ হয়েছিল ওসমানের, তার অনেকটা নিভে যায় এসব চিন্তায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে ভাবে—আহা, তার মেহনতের ফসলে যদি আর কেউ ভাগ না বসাত!

ওসমান লুঙ্গিটাকে কাছা মেরে নেয়। জোঁকের ভয়ে শক্ত করেই কাছা মারতে হয়। ফাঁক পেলে জোঁক নাকি মলদ্বার দিয়ে পেটের মধ্যে গিয়ে নাড়ী কেটে দেয়।

ওসমান পানিতে নামে। পচাপানি কবরেজি পাচনের মত দেখতে। গত ছু'বছরের মত বন্যা হয়নি এবার। তবু বুক সমান পানি পাটক্ষেতে। এ পাট না ডুবিয়ে কাটবার উপায় নেই।

কতকগুলো পাটগাছ একত্র করে দড়ি দিয়ে বাঁধে ওসমান। ছাতার মত যে ছাউনিটা হয় তার নিচে হুক্কা, তামাকের ডিবা, আগুনের মালশা ঝুলিয়ে রাখে সে 'টাঙনা' দিয়ে।

নৌকা থেকে কাস্তেটা তুলে নিয়ে একবার সে বলে,—তুই নাও লইয়া যা গা। ইস্কুলতন তাড়াতাড়ি আইসা পড়বি।

—ইস্কুল তো চাইট্টার সময় ছুট্টি অইব।

—তুই ছুট্টি লইয়া আগে চইলা আইস্।

—ছুট্টি দিতে চায় না যে মাষ্টার সাব।

—কামের সময় ছুট্টি দিতে পারব না, কেমুন কথা। ছুট্টি না দিলে জিগাইস্, আমার পাটগুলা জাগ দিয়া দিতে পারবনি তোর মাষ্টার।

তোতা নৌকা বেয়ে চলে যায়।

ওসমান ডুবের পর ডুব দিয়ে চলে। লোহারুর দোকান থেকে সন্ত আল কাটিয়ে আনা ধারাল কাস্তে দিয়ে সে পাটের গোড়া কাটে। কিন্তু চার-পাঁচটার বেশী পাট কাটতে পারে না একডুবে। এক হাতা পাট কাটতে তিন-চার ডুব লেগে যায়। একের পর এক দশ-বারো ডুব দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠা দমটাকে তাজা করবার জন্যে জিরোবার দরকার হয়। কিন্তু এই জিরোবার সময়টুকুও বৃথা নষ্ট করবার উপায় নেই। কাস্তেটা মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে হাতা বাঁধতে হয় এ সময়। প্রথম দিকে দশ ডুবে তিন হাতা কেটে জিরানো দরকার হয়। কিন্তু ডুবের এই হার বেশীক্ষণ থাকে না। ক্রমে আট ডুব, ছয় ডুব, চার ডুব, দুই ডুব এমন কি এক ডুবের পরেও জিরানো দরকার হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ডুবপ্রতি কাটা পাটের পরিমাণও কমতে থাকে। শুরুতে যে এক হাতা পাট কাটতে তিন-চার ডুব লাগে, তা কাটতে শেষের দিকে লেগে যায় সাত-আট ডুব।

পেটের জামিনের মেয়াদ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কাজ ভালই হয়। মাঝে মাঝে তামাক টেনে একটু গরম করে নিতে হয় শরীরটাকে, এই যা। বেলা ঠিকের ওপর উঠবার আগেই পেটের মধ্যে ক্ষুধা-রাক্ষস খাম খাম শুরু করে দেয়। ওসমান আমল দেয় না প্রথম দিকে। পাট কেটেই চলে ডুব দিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমল দিতে হয় যখন মোচড়ানি শুরু হয় নাড়ী-ভুঁড়ির মধ্যে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, মাথা ঝিমঝিম

করে, হাত-পাগুলো নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে।

ওসমান একবার ভাবে ঘরে যাওয়ার কথা। ডাকবে নাকি সে ছেলেকে নৌকা নিয়ে আসবার জন্যে? কিন্তু কাজ যে অর্ধেকও হয়নি এখনো। আশি হাতা পাট কাটার সঙ্কল্প নিয়ে সে জমিতে এসেছে।

পরক্ষণেই আবার সে ভাবে—তোতা তো এখনো ইস্কুল থেকেই ফেরেনি। আর ঘরে এত সকালে রান্না হওয়ার কথাও তো নয়।

পাশেই কিছুদূরে একটা শালুক ফুল দেখতে পায় ওসমান। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পেটে জামিন দেয়ার এত সহজ উপায়টা মনে না থাকার জন্য নিজের ওপর বিরক্ত হয় সে। এদিক ওদিক থেকে ডুব দিয়ে সে শালুক তোলে গোটা দশ-বারো। ক্ষুধার জ্বালায় বিকট গন্ধ উপেক্ষা করে কাঁচাই খেয়ে ফেলে তার কয়েকটা। বাকীগুলো মালশার আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে নেয়।

ওসমান আবার শুরু করে—সেই ডুব দেয়া, পাটের গোড়া কাটা, হাতা বাঁধা।

বেলা গড়িয়ে গেছে অনেকটা। প্রত্যেক ডুবের পর জিরোতে হয় এখন। পাটও একটা দু'টোর বেশী কাটা যায় না এক ডুবে। অনেকক্ষণ পানিতে থাকার দরুন শরীরে মালিশ করা তেল ধুয়ে গেছে। পানির কামড়ানি শুরু হয়ে গেছে এখন। ওসমানের মেজাজ বিগড়ে যায়। সে গালাগাল দিয়ে ওঠে,—আমরা না খাইয়া শুকাইয়া মরি, আর এই শালার পাটগুলা মোট্টা অইছে কত। কাচিতে ধরে না। ক্যান্, চিক্কন চিক্কন অইতে দোষ আছিল কি? হে অইলে এক পোচে দিতাম সাবাড় কইরা।

ওসমান তামাক খেতে গিয়ে দেখে মালশার আগুন নিভে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়েছিল এক পশলা। পাটগাছের ছাউনি বৃষ্টি ঠেকাতে পারেনি।

ওসমান এবার ক্ষেপে যায়। গা চুলকাতে চুলকাতে সে একচোট গালাগাল ছাড়ে বৃষ্টি আর পচা পানির উদ্দেশে। তারপর হঠাৎ জমির

মালিকের ওপর গিয়ে পড়ে তার রাগ। সে বিড়বিড় করে বলে, ব্যাডা তো ঢাকার শহরে ফটো বাবু অইয়া বইসা আছে। থাবাডা দিয়া আধাডা ভাগ লইয়া যাইব। ব্যাডারে একদিন পচা পানির কামড় খাওয়াইতে পারতাম।

ওসমান আজ আর কাজ করবে না। সিদ্ধান্ত করবার সাথে সাথে সে জোরে ডাক দেয়, তোতারে—উ—

দুই ডাকের পর ওদিক থেকে সাড়া আসে, আহি—অ—

—আয়, তোর আহিডা বাইর করমু হনে।

পাটের হাতাগুলো এক জায়গায় জড় করতে করতে গজগজ করে ওসমান,—আমি বুইড়্যা খাইট্যা মরি আর ওরা একপাল আছে বইসা গিলবার।

তোতা নৌকা নিয়ে আসে। এত সকালে তার আসার কথা নয়। তবুও ওসমান ফেটে পড়ে,—এতক্ষণ কি করতাছিলি, অ্যাঁ? তোরে না কইছিলাম ছুট্টি লইয়া আগে আইতে? ছুট্টি না দিলে পলাইয়া আইতে পারস্ নাই—?

—আগেই আইছিলাম। মাই করছিল—আর একটু দেরী কর। ভাত অইলে ফ্যানডা লইয়া যাইস।

তোতা মাটির খোরাটা এগিয়ে দেয়।

লবন মেশানো এক খোরা ফেন।

ওসমান পানির মধ্যে দাঁড়িয়েই চুমুক দেয়। সবটা শেষ করে অস্ফুট স্বরে বলে,—শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

ফেনটুকু পাঠিয়েছে এজন্যে স্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানায় তার অন্তরের ভাষা। এ রকম খাটুনির পর এ ফেনটুকু পেটে না দিলে সে পানি থেকে যেন উঠতেই পারে না নৌকার ওপর। এবার আউশ ধান কাটার সময় থেকেই তার এ দশা হয়েছে। অথচ কতই-বা আর বয়স তার! চল্লিশ হয়েছে কি হয়নি।

ওসমান পাটের হাতাগুলো তুলে ধরে। তোতা সেগুলো টেনে তোলে নৌকায়। গুণে গুণে সাজিয়ে রাখে। পাট তুলতে তুলতে ওসমান জিজ্ঞেস করে ছেলেকে,—কি রান্ছে রে তোর মা?

—ট্যাংরা মাছ আর কলমী শাক।

—মাছ পাইল কই ?

—বড়শী দিয়া ধরছিল মায়।

ওসমান খুশী হয়।

পাট সব তোলা হয়ে গেলে ওসমান নৌকায় ওঠে। নৌকার কাণিতে দুই হাতের ভর রেখে অতি কষ্টে তাকে উঠতে হয়।

—তোমার পায়ে কালা উইডা কী, বাজান ? তোতা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে।

—কই ?

—উই যে। জোঁক না জানি কী! আঙ্গুল দিয়ে দেখায় তোতা।

—হ, জোঁকই তো রে! এইডা আবার কোনসুম লাগল ? শিগগীর কাচিঁটা দে।

তোতা কাস্তেটা এগিয়ে দেয়। ভয়ে তাব শরীরের সমস্ত রোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

ডান পায়ের হাঁটুর একটু ওপরেই ধরেছে জোঁকটা। প্রায় বিঘতখানেক লম্বা। করাতে জোঁক। রক্ত খেয়ে ধুমসে উঠেছে।

ওসমান কাস্তেটা জোঁকের বুকের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। এবার একটা শক্ত কাঠি দিয়ে জোঁকটা কাস্তেব সাথে চেপে ধরে পোচ মারে সে। জোঁকটা দু'টুকবো হয়ে যায়। রক্ত ঝরাতে ঝরাতে খসে পড়ে পা থেকে।

—আঃ, বাঁচলাম রে! ওসমান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

—ইস্, কত রক্ত! তোতা শিউরে ওঠে।

ছেলের দিকে তাকিয়ে ওসমান তাড়া দেয়,—নে এইবার লগি মার তাড়াতাড়ি।

তোতা পাট বোঝাই নৌকাটা বেয়ে নিয়ে চলে।

জোঁক হাঁটুর যেখানটায় চুমুক লাগিয়েছিল সেখান থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। সে দিকে তাকিয়ে তোতা জিজ্ঞেস করে,—বাজান কেমুন কইর‍্যা জোঁকে ধরল তোমারে, টের পাও নাই ?

—না রে বাজান, এগুলো কেমুন কইর‍্যা যে চুমুক লাগায় কিছুই

টের পাওয়া যায় না। টের পাইলে কি আর রক্ত খাইতে পারে।

—জোঁকটা কত বড়, বাপপুসরে—

—হুও বোকা। এইডা আর এমুন কী জোঁক। এরচে' বড় জোঁকও আছে।

জমি থেকে পাট কেটে ফেলার পরেও ঝামেলা পোয়াতে হয় অনেক। জাগ দেয়া, কোষ্ঠা ছাড়ান, কোষ্ঠা ধুয়ে পরিস্কার করা, রোদে শুকানো—এ কাজগুলোও কম মেহনতের নয়।

পাট শুকাতে না শুকাতেই চৌধুরীদের গোমস্তা আসে। একজন কয়াল ও দাড়ি-পাল্লা নিয়ে সে নৌকা ভিড়ায় ওসমানের বাড়ির ঘাটে।

বাপ-বেটায় শুকনো পাট এনে রাখে উঠানে। মেপে মেপে তিন ভাগ করে কয়াল।

ওসমান ভাবে, তবে কি তে-ভাগা আইন পাশ হয়ে গেছে? তার মনে খুশী ঝলক দিয়ে ওঠে।

গোমস্তা হাঁক দেয়,—কই ওসমান, দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দ্যাও।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—আরে মিয়া, চাইয়া রইছ ক্যান? যাও!

—আমারে কি এক ভাগ দিলেন নি?

—হ।

—ক্যান?

—ক্যান আবার! নতুন আইন অইছে জান না? তে-ভাগা আইন।

—তে-ভাগা আইন! আমি তো হে অইলে দুই ভাগ পাইমু।

—হ, দিব হনে তোমারে দুই ভাগ। যাও ছোড হুজুরের কাছে।

—হ এহনই যাইমু।

—আইচ্ছা যাইও যহন ইচ্ছা। এহন পাট দুই ভাগ আমার নায় তুইলা দিয়া কথা কও।

—না, দিমুনা পাট। জিগাইয়া আহি।

—আরে আমার লগে রাগ করলে কি অইব? যদি হুজুর ফিরাইয়া দিতে কন তহন না হয় কানে আইট্যা ফিরত দিয়া যাইমু।

ওয়াজেদ চৌধুরীর ছেলে ইউসুফ বৈঠকখানায় বারান্দায় বসে সিগারেট ফুঁকছে। ওসমান তার কাছে এগিয়ে যায় ভয়ে ভয়ে। তার পেছনে তোতা।

—হুজুর, ব্যাপারডা কিছু বুঝতে পারলাম না। ওসমান বলে।

—কী ব্যাপার ? সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে ইউসুফ।

—হুজুব, তিন ভাগ কইর‍্যা এক ভাগ দিছে আমারে।

—হ্যাঁ, ঠিকই তো দিয়েছে।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—বুঝতে পারলে না ? লাঙ্গল-গরু কেনার জন্যে টাকা নিয়েছিলে যে পাঁচশ'।

ওসমান যেন আকাশ থেকে পড়ে।

—আমি টাকা নিছি ? কবে নিলাম হুজুর ?

—হ্যাঁ, এখন তো মনে থাকবেই না। গত বছরে কাগজে টিপসই দিয়ে টাকা নিয়েছিলে, মনে পড়ে ? গরু-লাঙ্গল কেনার জন্যে টাকা দিয়েছি। তাই আমরা পাব দু'ভাগ, তোমরা পাবে একভাগ। তে-ভাগা আইন পাশ হয়ে গেলে আধা-আধা সেই আগের মত পাবে।

—আমি টাকা নেই নাই ! এই রকম জুলুম খোদাও সহ্য করব না।

—যা-যা ব্যাটা. বেরো। বেশী তেড়িবেড়ি করলে এক কড়া জমিও দেব না কোন ব্যাটারে।

ওসমান টলতে টলতে বেরিয়ে যায় ছেলের হাত ধরে।

ইউসুফ শয়তানের হাসি হেসে বলে,—তে-ভাগা। তে-ভাগা আইন পাশ হওয়ার আগে থেকেই রিহার্সাল দিয়ে রাখছি !

সিগারেটে একটা টান দিয়ে আবার সে বলে,—আইন। আইন করে কি আর আমাদের আটকাতে পারে। আমরা সূচের ফুটো দিয়ে আসি আর যাই। হোক না আইন, কিন্তু আমরা জানি, কেমন করে আইনকে 'বাইপাস' করতে হয়। হুঁ-হু-হুঁ।

শেষের কথাগুলো ইউসুফের নিজের নয়। পিতার কথাগুলোই

ছেলে বলে পিতার অনুকরণে।

গত বছরের কথা। প্রস্তাবিত তে-ভাগা আইনের খবর কাগজে পড়ে ওয়াজেদ চৌধুরী এমনি করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন কথাগুলো।

আইনে একটা ধারায় ছিল—"জমির মালিক লাঙ্গল-গরু সরবরাহ করিলে বা ঐ উদ্দেশ্যে টাকা দিলে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ পাইবেন।" এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহারের জন্যে তিনি ছেলেকে পাঠিয়ে কাগজে কাগজে টিপসই আনিয়েছিলেন ভাগ-চাষীদের।

ফেরবার পথে তোতা জিজ্ঞেস করে,—বাজান কেমুন কইর‍্যা লেইখ্যা রাখছিল? টিপ দেওনের সময় টের পাও নাই?

ছেলের প্রশ্নের উত্তর দেয় না ওসমান। একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে তার মুখ থেকে শুধু উচ্চারিত হয়—আহ-হা-রে!

তোতা চমকে তাকায় পিতার মুখের দিকে। পিতার এমন চেহারা সে আর কখনো দেখেনি।

চৌধুরী বাড়ির সীমানা পার হতেই ওসমান দেখে—করিম গাজী, নবু খাঁ ও আরো দশ-বারোজন ভাগ-চাষী এদিকেই আসছে।

করিম গাজী ডাক দেয়,—কি মিয়া, শেখের পো? যাও কই?

—গেছিলাম এই বড় বাড়ি। ওসমান উত্তর দেয়। আমারে মিয়া মাইর‍্যা ফালাইছে একেরে। আমি বোলে টাকা নিছিলাম পাঁচশ'।

কথা শেষ না হতেই নবু খাঁ বলে,—ও, তুমিও টিপ দিছিলা কাগজে?

—হ ভাই, কেমুন কইর‍্যা যে কলমের খোঁচায় কি লেইখ্যা থুইছিল কিছুই টের পাই নাই। টের পাইলে কি আর এমুনডা অয়। টিপ নেওনের সময় গোমস্তা কইছিল,—"জমি বর্গা নিবা তার একটা দলিল থাকা তো দরকার।"

—হ, বেবাক মাইনষেরেই এমবায় ঠকাইছে।

করিম গাজী বলে,—আরে মিয়া, এমুন কারবারডা অইল আর

তুমি ফিইর‍্যা চলছো ?

—কি করমু তয় ?

—কি করবা ! খেঁকিয়ে ওঠে করিম গাজী,—চল আমাগ লগে দেখি, কি করতে পারি।

করিম গাজী তাড়া দেয়,—কি মিয়া, চাইয়া রইছ ক্যান ? আরে আরে এমনেও মরছি অমনেও মরছি। একটা কিছু না কইব্যা ছাইড়্যা দিমু ?

ওসমান তোতাকে ঠেলে দিয়ে বলে,—তুই বাড়ি যা গা।

তার ঝিমিয়ে পড়া রক্ত জেগে ওঠে।

গা ঝাড়া দিয়ে সে বলে—হ, চল। রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।

সামনে চড়াই

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়



ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় গল্পকার রূপেই বিশেষ পরিচিত। পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রগতিশীল পত্র পত্রিকায় প্রচুর গল্প লিখেছেন। মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী লেখক ও সংগঠক। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত গণসংগ্রামগুলি তাঁর অনেক গল্পের পটভূমিরূপে অঙ্কিত হয়েছে। জীবনের প্রতি অসাধারণ মমত্ব তাঁর। গ্রামবাংলা ও শহরগঞ্জের সর্বস্তরের সাধারণ মেহনতী মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, তাদের জীবন অতিক্রমণের সমস্যা এবং সমস্যা থেকে উত্তরণ, প্রেম-ঘৃণা, দুঃখ-ভালবাসা অতি অন্তরঙ্গভাবে তাঁর গল্পে রূপায়িত হয়েছে।

সূর্যকে আর দেখা যায় না। অনেকক্ষণ আগেই পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। কেবল তার লাল আভা তখনও ছড়িয়ে রয়েছে পশ্চিম দিগন্তে।

মালা আর তার সঙ্গী পাড়ার বৌ-ঝিরা গঙ্গা থেকে জল নিয়ে বাড়ি ফিরছে। রোদ নেই কিন্তু তাপ আছে বালির, গঙ্গার ধারের কিচকিচে বালি। পায়ে ছাঁক ছাঁক লাগে।

মালার ইচ্ছা করছিল আরও ঝাঁপাই জোরে খানিকক্ষণ। জল নয় ত যেন ঠাণ্ডা বরফ। কতটুকুই বা জল। মনে হয় সাঁতার দেয় এপার ওপার।

ওরা দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি ফিরবে বাড়ি। তবু ওর দেরি দেখে বলে—আয় লো আয়! ছেলেমানুষের মত আর জলে থাকিস্‌নে। কত কাজ যে পড়ে এখনও!

উঠতে হোলো। সন্ধ্যা হয়ে আসবে এবার। ঝির ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে। সারা শরীর মন জুড়িয়ে যায়। মনে হয় বসে থাকে মালা এখানে অনেক রাত্রি পর্যন্ত।

বড় বড় কলসী কাঁখে নিয়ে ডান হাত দোলাতে দোলাতে বাড়ি ফিরে চলে ওরা। ভরা কলসীর জল পড়ে চলকে। লোক আসছে। পাশ দিতে হবে। চওড়া রাস্তা ছিল গঙ্গার ঘাটের। দুধারের চষা জমি চষতে চষতে উঠে এসেছে রাস্তার ওপর। তারপর দুদিক থেকে গ্রাস করেছে রাস্তাকে। একজন মানুষ গেলে অন্য জনকে মাঠের চষা জমিতে নামতে হয়।

মালা সরল না। দাঁড়িয়েই রইল রাস্তায়। বৌরাও বোকা বনে গেল। ওমা! এ যে আমাদের সনৎ—জাল নিয়ে চলেছে নৌকোয়।

মুখোমুখি দুজনে। মালা মুখ টিপে হাসলো একটু। তারপর পা চালালো।

—ওলো মালা! আয়! আর পেছন ফিরে দেখতে হবে না! চৌধুরীদের মেজবৌ ফোড়ন কাটল।

—বারে আমি দেকচি নাকি? পায়ে কাঁটা ফুটেছে যে—

—পায়ে না বুকে! দেকিস্ লো দেকিস্—লাগে না যেন—

অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল মালা। ও যদি পিছন ফিরে না চাইতো তবে মালা চলেই আসছিল। সনৎই তো লজ্জায় ফেললো।

জল নেই। তবু জেলেরা যায় জাল নিয়ে। সন্ধ্যা নামবার আগেই নৌকা ছেড়ে দেয়। তেমোহনীতে কোণা দিয়েছে বাণপুরের জেলেরা। যা দু-চারটে মাছ ওরাই ছেঁকে নেয়। বিপদ হয় উত্তরের লোকদের। জাল বেয়ে বেয়ে হাতে ঘাঁটা পড়ে। মাছ পায়না একটিও।

এক একদিন সনৎই বসে গলুইয়ে। মাছ নেই তা মানুষ চিনবে কি করে। অন্ধকারেও ঐটুকু জলে মাছ দেখা যায়। জোয়ান মদ্দ সনতের চোখ দুটো অন্ধকারেও জ্বল জ্বল করে! বুড়ো-জাল নামিয়ে বসে থাকে হাঁ করে। বুড়ো জনার্দন চোখ বুঁজে হালে বসে। ভাবে এই বুঝি উঠলো।

—কিরে! ঠেকচে না?

বিড় বিড় করে সনৎ!

—কি যে হল? . শালার মাছ ঘাই দেয় না।

—কি ফ্যাচ ফ্যাচ কচ্চো! জল আচে নাকি তাই মাচ হবে! সমুদ্দুরের মুখে চড়তা পড়েছে তা খবর রাখ।

সেদিনের ছেলে সনতের কাছে জনার্দনের খবর নিতে হবে সমুদ্দুরের মুখে গঙ্গায় চড়তা পরেছে। সে যে নিজে চোকে দেকে এসেছে! সেবারে বানবরণ, শিবু আর পাগল তিনজনা গিয়েছিল। যে আথালি পাথালি ঢেউ! তবে চড়তায় ঢেউ কম।

রাত্রি গভীর হলে বাড়ী ফেরে ওরা। জনার্দন চীৎকার করে—ঘাই কোন দিকে গো?

এপার ওপার ঘেরা বড় জালে। এক ধারে নৌকা যাতায়াতের পথ। বাঁশ পুঁতে পুঁতে সারা গঙ্গাটার বুকে শরশয্যা বিছিয়েছে। রাজার কাছ থেকে বন্দোবস্ত। সরকারী কর্মচারীদেরও মুখ বন্ধ। ম্যাজিস্ট্রেট, হাকিম কার যে এলাকা কেউ জানে না।

সনত নাকি! মাছ পেলি? মালার বাবা রসরাজ তামুক খাবার জন্যে নৌকোটাকে ভিড়িয়ে দিল ওদের নৌকোর গায়ে। জানে মাছ পায়নি তবু শুধোয় একবার।

জবাবটা দিল জনার্দন। না বেয়াই! পাইনি। মাছ নেই জলে গো? মাছ নেই।

সনতের কাছে হুঁকো। সবে দুটান দিয়েছে। বুড়ো একেবারে হাত বাড়িয়ে।

বিড় বিড় করে বকতে বকতে হুঁকোটা এগিয়ে দিল বুড়োকে।

বারোয়ারী তলায় দুপুর বেলায় বসে ছেলে-ছোকরার দল। গল্প করে কেউ গামছা বিছিয়ে ঘুমোয়। মাথার ওপরে তিন কালের বিরাট অশ্বত্থগাছটা তার অজস্র ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঘন পাতার আড়ালে ঢাকা পড়ে দুপুরের খাড়া রোদ। কেউ কেউ সুতো পাকায় টাকুতে। বাঁ হাতের আঙুলের মাথায় থোপনা করে এলো সুতোর গোছা। ডান হাতে টাকু। হাঁটুর ওপরের কাপড়টাকে আরো তুলে নিয়ে দাবনার ওপরে টাকুটাকে পাক দিয়ে ছেড়ে দেয়। তারপর টাকুটা ঘুরতে থাকে আর আস্তে আস্তে বাঁ হাতের সুতোর গোছা থেকে আরও সুতো আলগা করে দিয়ে সুতো পাকায়।

খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুম আসে না মালার। কি করে। পাড়ায় ঘুরতে বেরোয়।

মালা যেতে চায়না বারোয়ারীতলা দিয়ে। ছোঁড়াগুলো হাঁ করে চেয়ে থাকে ওর দিকে। যেন গিলে খেতে চায়। পাড়ার মেয়ে তবু লজ্জা নেই। যেন দেখেনি কোনদিন। তবু যেতে হয় শুধু একজনের জন্যেই। কোথায় আর যাবে, সনতদের বাড়িতেই যায়। কেউ নেই বাড়িতে। শুধু সইমা।

—কিরে মালা, তোর মায়ের খাওয়া হয়েচে?

—না, সইমা। এই তো বসলো! চারদণ্ড বসে বসে খাবে। আমি পারিনে বসে থাকতে। চার টপকায় খাওয়া হবে তা নয় ভেবে ভেবে—

মালার কথায় হেসে ফেলে সনতের মা, বলে—বস মা! বস!

—না, বসব না সইমা! মা আবার খুঁজবে। যাই!'

কি হবে বসে। সে ভ্যাবাকান্ত ওইখেনেই ঘাসের ওপরে শুয়ে ঘুম দিচ্ছে হয়ত। বাড়িতে ত মন বসে না বাবুর?

সনতের সঙ্গে পথেই দেখা।

দাঁত বার করে হাসে সনৎ। রাগে গায়ে জ্বালা ধরে মালার।

—কোথায় গেইলি?

মালা জবাব দেয় না। যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

—আমাদের বাড়ি? তোকে তো দেকাই যায় না।

মনে মনে বলে মালা,—বাড়ি নিয়ে যাও! নিয়ে দেক। সে মুরোদ নেই।

—শোন্ মালা! এখানে আর থাকব না। চাকরি করব ফ্যাক্টারীতে!

মালা এবারে থমকে দাঁড়াল। ভয় পাওয়া দু চোখ তুলে তাকায় ওর দিকে।

—নিতাইকে বলিচি! ও খপর নিয়ে আসবে! কি হবে এখানে থেকে? সারাদিনে ত একবার দেকতেও পাইনা!

পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছিল মালা এতক্ষণ মাথা নিচু করে। একবার মুখ তুলেই ফিক করে হেসে ছুট দেয়।

বেজায় লজ্জা পেয়েছে। রাঙা মুখটা আঁচল দিয়ে ঢেকে পালাল এক ছুটে। কোন দিন তো কথা বলে নি। যদি কেউ দেখে ফেলে। ভয় করে চৌধুরীদের বউদের। কেবল রাগায় মেজবৌটা।

বাড়ি যেতে যেতে ভাবে।

ভয়ই করে তার। নিতাই তো অমনি করেই গেল। মাছ নেই, কি করবে। দেনায় দেনায় বাড়িটা পর্যন্ত বাঁধা দিয়েছিল নতির বাবাকে। শিক্ষিত লোকের ছেলেদের সঙ্গে ওঠাবসা। তাদের সঙ্গে গিয়ে চায়ের দোকানে তিন মাস ছিল। তারপর কলে কাজ পেয়েচে। নিতাইও ওর মত ইস্কুলে পড়েছিল যে ক'বছর। পড়া করা ছেলে কখনও জলে জলে মাছ ধরে বেড়াতে পারে? সনৎ আছে দায়ে পড়ে। পাঠশালায়

বৃত্তি পেয়েছিল দু'টাকার। ওর অনেক বন্ধু এখন চাকরি করে কলকাতায়। দু-তিনটে পাশ। তাদের সঙ্গে কিছুদিন মিশেছিল ও। পারল না থাকতে। বাবা টেনে নামিয়ে আনল জলে। জেলের ছেলে জাল হাতে নাও। মাছ ধর। বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে তো পেট ভরবে না। সাহায্য কর বুড়ো বাপকে—

প্রথম প্রথম পারে নি। এখন সনৎ পুরোদস্তুর জেলে। সে সব বোঝে। কোন্ জলে মাছ আছে কি নেই। কোন্ জালে মাছ উঠবে কোন্সময়, সব শিখে নিয়েছে বাপের কাছে। শুধু মাছ ধরাই শেখেনি —পাড়ার ছেলেদের চালচলন, কথাবার্তা, গালাগালি, ঝগড়া সবই রপ্ত করেছে সনৎ।

তবু ভয় হয় মালার। সনৎ যেন কেমন বারমুখো। মনে হয় কোন্ সময় ও চলে যাবে। সত্যিই নিতাইয়ের মতো চাকরি নিয়ে চলে যাবে বিদেশে! সেখানে গিয়ে কাজ করবে কলে। ফিরবে মাঝে মাঝে বাবু সেজে। কাছের মানুষ কত দূরে চলে যাবে গ্রাম থেকে, মন থেকে, এই পরিবেশ আর সমাজ থেকেও সে চলে যাবে।

—কি রে মালা—এমন অসময়ে যে!

ধরা পড়ে যায় মালা। বলে—না, মা বলছিল—একাদশী কবে—মায়ের শরীরটা ভাল নয় কিনা?

—ওমা! একাদশী তো পরশু দিন গেল!

চুপ করে থাকে একটুক্ষণ মুখ নিচু করে। তারপর বলে—এখনই নয় জলে মাছ নেই—তা বলে চিরকাল কি থাকবে না?

—কেন রে? কে বলেচে, কে?

—না, আমাদের তো মাছ ধরাই ব্যবসা! আমাদের জাতব্যবসা! দুদিন মাছ নেই জলে তাই বলে—

—কি বলচিস! কথা বুঝতে না পেরে সইমা চেয়ে থাকে মালার দিকে।

—ঐ নিতাইয়ের কথা বলচি! বাবু গেলেন চাকরি করতে শহরে।

এদিকে বাপ-মা যে খেতে পায় না তা দেখবে কে ?

ঘরে ছিল সনৎ। বেরিয়ে এল। বললে,—যে দেকবার সেই দেকবে ! নিতাই তো টাকা পাঠায় ! ধার শোধ দিয়েছে ! আবার কত করবে এই ছ'মাস চাকরিতে।

—খুব ভাল ছেলেরে নিতাই। অমন আর হয় না ! আমাদের যেমন পোড়া কপাল ! লেখাপড়া শেখাতে পারলাম না—দিলাম জাত-ব্যবসায়—তাও কপালগুণে মাছ নেই। জলে যায় আর অমনি হাতে আসে ফিরে ফিরে—

মায়েরও আপসোস। যোয়ান ছেলে উপায় করতে পারল না সংসারে ! কি হবে !

মালা বাড়ি যেতেই মায়ের বকুনি।

—ধিঙ্গি মেয়ে—পাড়ায় পাড়ায় নেচে বেড়াচ্ছে—সংসারের কথা ভাবা যায় না। কোতা থেকে পিণ্ডির যোগাড় হবে সে খেয়াল আচে ! জ্বলে মলাম পেটের শত্তুরদের নিয়ে—যাও—কণ্ট্রোলে চাল নিয়ে এস।

মুখ ভার করে মালা ধামা নিয়ে দাঁড়াল।

—টাকা দাও।

—টাকা থাকলে আর তোমায় খোসামোদ করতাম। ততক্ষণ খেঁদাকে দিয়েই আনাতাম। যাও তাড়াতাড়ি লাইন দাওগা !

মায়ের বকুনি খেয়ে রেশনের দোকানে গিয়ে লাইন দিল মালা। বিকালে চাল দেবে লাইন শুরু দুপুর থেকে। ধামা বা থলি রেখে চলে গিয়েছে নিজের কাজে। এক সের চাল ও এক সের গম মাথাপিছু। গম নেই—চালও কম। পাঁচ জনের সংসারে পাঁচ সেরের জায়গায় তিন সের। দর কম রেশনে, অখাদ্য চাল, কাঁকরে ভরা আর দুর্গন্ধময়, তবু ভাল। বাজারের দশ আনার চেয়ে কম। বাজারের এক সের চালের দামে দেড় সের রেশনে। পেট ভরে না হোক আধপেটাও তো হবে।

—কইরে মালা তোর হল গিয়ে একটাকা পাঁচআনা ! টাকা দে !

মালা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।

—কি হল ? তিন সের চাল দাও একে—

মালা ধামা কাঁধে দাঁড়িয়ে।

—কি টাকা নেই! ধারে তো হবে না! এত ধার দেব কোত্থেকে? যা বলগা বাবাকে—আগের পাঁচ টাকা ন' আনা বাকি। রোজ রোজ ধারে হয়?

বেরিয়ে আসবে সুমুখেই দাঁড়িয়ে সনৎ। লজ্জায় মাথা কাটা গেল মালার। ঘরশুদ্ধ লোকের সুমুখে লজ্জা নেই, লজ্জা তার সনৎকে। শুধু লজ্জা নয় রাগে দুঃখে ফেটে পড়তে চায় মালা। মা জেনেশুনেও পাঠিয়েছে তাকে। আগের ধার শোধ দেবার নাম নেই।

কান্নায় ভেঙে পড়তে চায় মালা। সনৎ জানে সব। তবু এই লজ্জা তাকে ধূলার সঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চায়। খালি হাতে ফিরে যেতে হবে। তারপর কোথায় পাবে টাকা, কে দেবে?

সেদিনে কান্না বাঁধ মানলে তো পরের দিনে আর বাধা মানল না। টস টস করে চোখ দিয়ে জলের ধারা নামল। চুপি চুপি সে এসেছিল বাবার ভাত খাওয়ার কাঁসার থালাখানা বাঁধা দিয়ে টাকা নিতে। পাড়ার লোক মহাজন। বাইরে গিয়ে মান ইজ্জত খোয়াতে হয় না। রেশনের ধার, থালা, ঘড়া, ঘটি বাঁধা রেখে ধার সবই তো হরিদাস কাকা দেয়। স্বজাতির কাছে লজ্জা নেই। কিন্তু যখন সনৎও কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে তারই মত ভাত খাবার থালাটা বার করল তখন মালা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। কাল রেশনে ধার না পেয়ে তার লজ্জা করছিল হরিদাস কাকা ফেরৎ দেওয়ায়, আর আজকের লজ্জা সনৎকে ঐ অবস্থায় দেখে। সনৎ তার সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত ভবিষ্যৎকে বিদ্রুপ করে সুমুখে এসে হাজির হল। মনে হল একে অবলম্বন করেই তার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার যে স্বপ্নমুকুল ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলতে চাইছিল আজ যেন তা কেউ নিষ্ঠুর হাতে কুঁড়িতেই ভেঙে দিয়ে গেল।

—কি সনতের কি? তোমারও থালা? কি যে হল আমাদের সব।

কালকের মত মালা আজ আর দ্রুতপায়ে গেল না। আজকের চলা তার ধীরে মনে হয় হবে না। কথা বলবে সনৎকে। বলবে, তুমি যাও। এখানে এমনি করে নিজেকে আর ক্ষয় কোর না। তুমি নিতাইয়ের

মত বাইরেই যাও। চাকরি কর। এমন করে থালা, ঘটি বাঁধা দিয়ে বাঁচবেনা কেউ। বাইরে গিয়ে নিতাইয়ের মত মানুষ হয়ে এস। ভুলে যেও মালাকে—চাকুরেবাবু হয়ে এস, ছেঁড়া আর ময়লা কাপড় পরে ঘুরে বেড়ানো পাড়ার মেয়ে মালাকে দেখেও দেখো না।

সেও ভাল, তবু যাকে ঘিরে তার আশা, কত কল্পনা, আর স্বপ্ন তাকে চোখের সুমুখে এমন করে তিলে তিলে মরতে দেখতে পারবে না মালা।

যার জন্য মালার এত দরদ তার মনে নেই কিছুই। আবার সেই বারোয়ারীতলায় আড্ডা। নিতাই এসেছে তার সঙ্গে একটু দেখাও বোধ হয় করে না। যদি দেখা করে বলত তাহলে হয়ত বেঁচে যেত নিজেরা। সঙ্গে সঙ্গে মালাও।

অনেক দিন পর নিতাই এল। মালার মা তো অবাক। বলে—কি বড়মানুষের জামাই! কি মনে করে!

—তুমি বলতে পার মাসী। সত্যি তোমাদের বাড়ি আসা আর হয় না।

মালা যেন মুকিয়ে·ছিল—বলল, হবে কোত্থেকে দাদা এখন বাবু হয়েচে!

—যাঃ! বাজে বকিসনে! আমি যে নিতাই তাই আছি! দুদিন চাকরি করছি বলে বাবু! চাকরির তো মরণ, এই কবে আচি কবে নেই!

—কেন?

—ছাঁটাই হচ্ছে। কোনদিন দেবে হয়ত তাড়িয়ে।

কথা এগোল না আর। মালা মুষড়ে পড়ে। এইখানেই জল ঘেঁটে জীবন যাবে ওদের। মাছ নেই জলে। ফলে বিলেরও সেই অবস্থা। জল নেই—যা আছে তাও বাবুরা মালিক। তবু আশা ছিল সনৎ যদি চাকরি পায় তবে হয়ত দুঃখ ঘুচবে, হয়ত সে ও বাড়ির বৌ হবে।

ঢল নেমেছে গঙ্গায়। ঘোলা জল দু কুল ভরিয়ে দিয়ে গেল।

মালা খুশি হল সবচেয়ে বেশি। একটু বোঝা কমবে এবার। সবাই একটু হাসবে। সারা জেলেপাড়া মেতে উঠল। যার যা জাল-সুতো দিনরাত সেগুলোকে ঝেড়ে মুছে গাব দিয়ে আগেই ঠিক করে রেখেছিল। নেমে পড়ল ইলিশ মাছ ধরায়। বিকালবেলায় সন্ধ্যার মুখেই সারি সারি নৌকা বার হয় মোচার খোলার মত ডেরা থেকে। হালে বসে থাকে বুড়ো জনার্দন চুপটি করে। নড়ে না পর্যন্ত। ভারি চালাক ইলিশ মাছের দল। একটু শব্দ পেলে হবে না। সনৎ জালটাকে ফেলে বসে থাকে বক-ধার্মিকের মতো। নৌকা ভাঁটার টানে তার আপন গতিতে ভেসে যায়। স্রোতের বিপরীতে উজিয়ে আসে রুপালি মাছের দল। গভীর জলে তাদের আনাগোনা। বাকারির নিচে বেশ গভীরে জালকে ছেড়ে দিয়ে সতর্ক প্রহরীর মত বসে সনৎ খেলা করতে করতে যেই টোকা দেবে জালে অমনি জালের অন্য যে মুখটা ধরে বসে আছে জনার্দন ছেড়ে দেবে সে মুখের সুতো। দিয়েই গুটিয়ে তুলে ফেলতে হবে।

পঁচিশখানা নৌকার মুখোমুখি দেখা।

—অ বেয়াই হলো? রসরাজও ফিরছে উজিয়ে।

—না বেয়াই! হোলো না! শালার মাছ গেল কোতায়?

একজন মাত্র একটি মাছ পেয়েছে। তাও মাঝারি। বাকি চব্বিশ ঘর জেলে ফিরল খালি হাতে। তিন-চার ক্ষেপ দিয়েও ঐ অবস্থা।

মালা আগেই খবর পেয়েছিল। শুধু মালা নয়, পাড়াশুদ্ধ সবাই জানে। সহদেবরা মাত্র একটি পেয়েছে আর কেউ নয়।

অনেকদিন পরে দুজনে মুখোমুখি! সনৎই কথা বলে—আজ মাচ পাব! কার মুক দেকে উঠেছিলাম আজ।

—আহা-হা! কৃত্রিম রাগে মুখটা ঘুরিয়ে নিল মালা!

—তোর দেকা পাওয়াই ভার মালা! তুই যেন ইলসে মাচ! গভীর জলের তলায় থাকিস।

—তবে আমাকেই ধরে নিয়ে যাও! বলে ফেলেছিল আর কি? সামলে নিল। বললে—বাবাও পায়নি!

—খুড়োর সঙ্গে তুই তো গেলে পারিস। খুড়ো হালে বসবে! তুই জাল ফেলবি! তোর আর আমার নৌকো পাশাপাশি যাবে!

—যাক, আর ঢং করতে হবে না। নিজেরা জেলে হয়ে ধরতে পারে না।

মালার লক্ষ ছিল না। চৌধুরীদের বাড়ির পিছনের সরু এই রাস্তাটায় লোক বিশেষ চলাচল করে না। সেখানে দাঁড়িয়েই কথা বলছিল ওরা। মেজবৌ তরকারীর খোসা ফেলতে এসে থেমে গেল।

—যা লো মালা! যা! তুই সনতের নৌকোতেই যা! তোদের যুগলে দেখলে মাচ লাপিয়ে এসে জালে পড়বে! নিজের কথায় বৌটা নিজেই খিলখিল কবে হেসে ওঠে।

জিভ কেটে মালা ততক্ষণে হাওয়া।

বর্ষাকালটাই জেলেদের ভরসা। এসময় উপায় হলে পরের ছ'মাস বসে খেতে পারে। সে উপায়ও নেই। কোনদিন বা একটা মাছ পড়ে কোনদিন শুধু হাত। ভাবনা ঘোচে না। বর্ষাকাল আর শীতকাল সবই সমান। ইলিসের মরশুমেও মাছ নেই। জলেই নেই মাছ।

বর্ষায় কোন রকমে চললেও শীত এলেই আবার ভাবনা শুরু। বর্ষা বাদ দিয়ে বাকি সব ঋতুতেই ওদের ভাবনা বাড়ে। রসরাজের বাড়ি যায় জনার্দন। বলে—বেয়াই! সম্বন্ধ পাকা করে নাও! আর ভাল দেখায় না।

—বস বেয়াই, তামুক খাও। মালা তামুক দে। আমি তোমায় বলব বলব ভাবছিলাম। তা তুমিই বলে ফেলেচ। আমি সাহস করিনি, যা দিনকাল যাচ্চে।

—তাই তো বেয়াই! খুব ভাবনায় ফেলল। কি যে করি। একটু চুপ করে ভাবে জনার্দন। তারপর বলে—তবে বর্ষায় হবে! আর তো কটা মাস।

—সেই ভাল! মেয়েও আমার দিন দিন বড় হচ্চে তো!

—সে তো বটেই!

বুড়োরা জানে না বর্ষা আসার আগেই কোথায় গিয়ে নামবে তারা।

জল মরতে মরতে এক হাঁটুতে গিয়ে দাঁড়াল কোথাও কোথাও। কোথাও ডুবোন জল আছে বটে। কিন্তু দু-এক জায়গায় কাছিমের

পিঠের মত উঁচু বালির চর, এখানে ওখানে যেন দ্বীপ জেগেছে। তাই মাছ নেই একেবারে। ধার দেনায় ডুবে গেল সবাই। মালার বাবা একদিন ঘরের একখানা টিন বেচে চাল নিয়ে এল। এতেও হল না। পাড়ার দু-একটা ছেলে গেল মাঠে মুনিস খাটতে। কেউ শুনল। কেউ খেয়াল করল না। সবাই ব্যস্ত নিজের নিয়ে। বাঁচার সংগ্রাম। বাঁচতে হবে যেভাবে হোক।

মক্‌সুদ্দি মিয়ার সঙ্গে বাবাকে গোপনে কথা বলতে দেখে মালা একটু অবাক হয়েছিল। কি কথা। মক্‌সুদ্দি তো চাষী। ওর কাছে কি বাবা টাকা ধার চায়! বাবা আর কারও কাছে ধার চাইতে বাকি রাখল না।

পরের দিন ভোরবেলায় কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেল রসরাজ। মালার ভাল লাগে না। দিনরাত বাবা-মা'র ঝগড়া আর খিটিমিটি। নেই নেই! ঝগড়ার পর মায়ের কান্না।

ওখানেও তাই। তবু বাড়ি থেকে বার হয়। মেজবৌ-এর কাছে গিয়ে বসে। সব বাড়িরই এক অবস্থা। তবু এ মেয়ের মুখে হাসি আর তামাসা লেগে আছে।

—কি লো মালা, পথ ভুল করেছিস—এ বাড়িতে তো সনৎ থাকে না!

—যাও! ভাল লাগে না সব সময় ইয়ার্কি।

পাড়াটা নির্জন। অশ্বত্থগাছের মাথায় শুধু পাখিদের কিচির-মিচির শব্দ। অন্যদিন হলে হলে মালা যেত না। আজ গেল সনৎদের বাড়ি। সেও নেই। কুঁড়ে লোকটা সাত সকালে বেরিয়েচে কোতায়। সইমাকে শুধাতে গিয়েও পারেনি! গম্ভীর মুখ আর থমথমে ভাব।

সারা সকাল ছটফট করে কাটাল মালা। বাবার দেখা নেই। জালে যায়নি। তবে গেল কোথা?

দুপুর হয়ে এল তবু দেখা নেই। মা তার নির্বিকার। খেঁদা ঘুর ঘুর করছে মায়ের কাছে। বলতে পারছে না ক্ষিদে পেয়েছে।

অশ্বত্থগাছ ছায়া ফেলেছে তবু বারোয়ারীতলাটা ফাঁকা। ক্লান্ত গরু দুটো জাবর কাটছে শুয়ে শুয়ে। মালা গঙ্গার ঘাটের রাস্তাটায় গিয়ে

দাঁড়িয়ে রইল। আসছে ওরা। আসছে দুজনে। তার বাবা আর সনৎ। আঃ কি হাওয়া এখানটায়। শরীর যেন জুড়িয়ে যায়। অথচ দাঁড়াবার উপায় নেই। ওরা আসছে এক সঙ্গে।

জালে গিয়েছিল নাকি? কাছে আসতেই চমকে উঠল ও। হাতে মাটি মাখা। পিছনে মকসুদ্দি মিয়া। আগুনে পুড়ে যেন মানুষ দুটো ঝামা হয়ে ফিরে এসেছে।

সনৎ আগে। মা ওর দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাইতেই সনৎ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কি একটা তাড়াতাড়ি লুকোবার চেষ্টা করল কাপড়ের নিচে। রোদের আভায় ঝকমক করে উঠল নিড়ানির ফলাটা!

—সনৎ ভাই! কাল ঘুলি ঘুলি থাকতে যাবা! হালদারকেও সঙ্গে নিও।

মালার অনেকদিন থেকে সখ ছিল সনতের চাকরী হোক শহরে। জলে যখন মাছ নেই তখন শুকিয়ে মরবে কেন? একটু তো লেখাপড়া শিখেছিল! নিতাইয়ের মত সেও চাকরি করবে।

চাকরিই হলো সনতের। মাছ ধরা ব্যবসা বন্ধ। তাই খুলে গেল আর এক দরজা। শুধু সনৎই নয় এ অঞ্চলের নামকরা জেলে রসরাজ হালদারও নিড়ানি হাতে বুড়ো বয়সে মাঠে নামল অপরের জমিতে মুনিস খাটতে!

মালার স্বপ্ন সফল!

তার স্বপ্ন-দেখার মানুষ কাজ পেয়েছে। পাঁচ সিকে মজুরী!

সনতের মুখটা দেখতে চেয়েছিল মালা একবার। দেখতে পায়নি। মুখ নিচু করে চলে গেল মানুষটা।

মালা বাবার পিছু পিছু বাড়ি চলে এল।

অরণ্যের স্বপ্ন

সৌরি ঘটক



সৌরি ঘটক সাংবাদিক, উপন্যাসিক এবং গল্পকার রূপে বিশেষ পরিচিত। মার্কসবাদী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী লেখক ও সংগঠক। বর্ধমান জেলার কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। জীবনের প্রতি প্রচণ্ড আশাবাদী লেখক। তাঁর লেখায় গ্রামবাংলার মানুষের বাঁচবার সংগ্রাম, তাদের আশা-আকাঙ্খা, দুঃখ-কষ্ট, স্বপ্ন ভালোবাসা আশ্চর্য দরদের সাথে রূপায়িত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : দুইদেশ, কমরেড, এবং ১৯৫৯ সালের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত কলকাতায় খাদ্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা রক্তে রাঙানগরী। গল্পগ্রন্থ : কমিউনিস্ট পরিবার ও অন্যান্য গল্প।

বাংলা দেশের দক্ষিণ প্রান্ত।

সমুদ্রের ধার।

সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্য।...

তার শাখা-প্রশাখার জটাজালে এক অন্ধকার জগৎ রচনা করে রেখেছে।

তারই এক প্রান্তে একদল আত্মগোপনকারী মানুষের ছোট্ট সমাবেশটা সেদিন সকালে এক তীব্র মতবিরোধে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

এই মাত্র খবর এসেছে সাতদিন আগে জমির ধানের উপর হামলা রুখতে গিয়ে মিলিটারির হাতে ধরা পড়া বাইশ বছরের মেয়ে পাখীকে কাল আবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছে গাঁয়ের কাছে। তাকে বাঁচাতে হলে সেখান হতে অবিলম্বে সরিয়ে আনা দরকার।

খবর শুনেই কৃষক সমিতির সেক্রেটারি ত্রিপুরারি মণ্ডল পাখীর স্বামী গুণধরকে আদেশ দিয়েছিল তাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তার শ্বশুর হরিপদ তীব্র আপত্তি করেছে এই সিদ্ধান্তের,—এখানে আনা চলবে না। অন্য কোন গোপন ডেরায় পাঠিয়ে দাও। চিকিৎসা করাতে যত টাকা লাগে দেব আমি। কিন্তু এখানে নিয়ে আসা হবে না।

গুণধর ত্রিপুরারির আদেশ শুনে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে লেগেছিল কিন্তু বাপের তাড়া খেয়ে পিছিয়ে গিয়েছে। অন্য মানুষগুলো এ ব্যাপারে কেউ কোন মতামত দেয়নি—চুপ করে রয়েছে—বুঝতে পারছে না কি বলা যায়—কি করা উচিৎ।

এই বন মাইল খানেক পার হলেই এদের গ্রাম—মাঠ—ধানের জমি। সেখানকার মানুষ এরা। বহু যুগ আগে এদের পূর্বপুরুষেরা বন-জঙ্গল কেটে—বাঘ-সাপ-কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে আবাদ করেছিল সেই মাঠ—কিন্তু জমি পায়নি। আইনের খোঁচায় তার মালিক হয়েছিল লাটদার—কেউ ত্রিশ হাজার, কেউ চল্লিশ হাজার বিঘা। এখন সেই জমি পুনর্দখলের সংগ্রাম শুরু করেছে এরা।

একদিন এই অরণ্যেরই কোন এক প্রান্তে যেমন এক স্বজন পরিত্যক্ত মানুষকে এক সুন্দরী জিজ্ঞাসা করেছিল—'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ,' তেমনি তার চেয়েও এক রমণীয় কল্পনা আজ এই মানুষ-গুলির কাছে এসে আহ্বান দিয়েছে,—'পথ খুঁজিতেছ। মামানুসর।' সুন্দরবনের দিগন্তে তাই আজ আর শান্তির কোন চিহ্ন নাই।

আজ এখানে লাটদারের কাছারিগুলো হয়েছে মিলিটারী আর সশস্ত্র লাঠিয়ালদের আস্তানা—আর গ্রামগুলো প্রতিরোধের দুর্গ। সংঘর্ষ হচ্ছে প্রতিটি দিন। গুলি চলছে—মানুষ মরছে—ধরা পড়ছে—আহত হচ্ছে। কত মেয়ের চাপা গোঙড়ানি একেবারে নীরব হয়ে যাচ্ছে মিলিটারী ক্যাম্পের ভেতর। লড়াই পরিচালনার সুবিধার জন্য এরা গ্রাম থেকে সরে এসে আস্তানা গেড়েছে বনের ভেতর। আইনে এরা সবাই ভয়ঙ্কর বিপদ্‌জনক লোক—পাখীর শ্বশুর হরিপদকে জীবিত কি মৃত ধরে দিতে পারলে হাজার টাকা পুরস্কার, ত্রিপুরারির অবর্তমানে আদালত থেকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়ে গিয়েছে—বুড়ো রসময়কে ধরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছে চোখ দুটো কানা করে—এমনি সবাই—এমন কি যে স্বেচ্ছাসেবকগুলো রয়েছে তারা পর্যন্ত। নির্দেশ আছে ওদের দেখতে পেলেই গুলি করে মেরে ফেলার।

এই গভীর বনে মিলিটারী ঢুকতে সাহস পায় না, তাই এখানেই খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে এরা সাময়িক ডেরা পেতেছে। ওপাশে একটা বড় খাড়ি নদী, তার ও তীরে বড় বড় সুন্দরী গাছের নীচে হোগলা আর বেতের ঘন বন। মাথার ওপর অরণ্যের ঘন আচ্ছাদন।

শীতের রোদ গাছপালার ফাঁক দিয়ে এখানে পড়ে ঝিকমিক করছে—মনে হচ্ছে একরাশ যুঁই ফুল ফুটে রয়েছে মাটির ওপর। স্বেচ্ছাসেবকরা সারা রাত জেগে গাঁয়ে গাঁয়ে মিটিং করে ঘুরে এসে কেউ বা ঘুমচ্ছে—কেউ বা বড় বড় হস্কা হাতে করে খাড়ির বুকে ডিঙির ওপর বসে পাহারা দিচ্ছে। ওপারের চরে ভেসে রয়েছে বড় বড় কুমীর, একটু অসর্তক হলেই উঠে এসে টেনে নিয়ে যাবে

মানুষকে। অনেকটা দূরে হোগলা বনের মাথাটা আপনি দুলছে, বোধ হয় কোন বাঘ চলাফেরা করছে সন্তর্পণে। একটা নুয়ে-পড়া গাছের ডাল থেকে একটা অজগর সাপ মাথা ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে একমনে। তারই ভেতর খানিকটা অপরিসর জায়গায় সমিতির বয়স্ক নেতারা ঘোঁট পাকিয়ে বসে বির্তক করছে—পাখীর সমস্যা নিয়ে।

সকাল থেকেই হরিপদ সেই এক কথা বলছে। তাই এবার ত্রিপুরারি বিরক্ত হয়ে ঝেঁঝে উঠে বলল,—তোমার এ জিদ আমি বুঝতে পাচ্ছি না, কমরেড। এখানে তাকে নিয়ে এলে কি ক্ষতি হবে তাতো কই বলছো না। দুটো হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে বসেছিল হরিপদ। ত্রিপুরারির ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে সে মুখ তুলে বলে,—সে তুমি বুঝবে না, যদি তোমার হতো বুঝতে। এখানে ওকে আনলে আমার মাথাটা হেঁট হয়ে যাবে সবার সামনে।

—সে এলে তোমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে অন্ধ রসময়, মাথাটা উঁচু করে পাশেই বসেছিল সে। সমিতির হুকুমেই তো সে হামলা রুখতে গিয়েছিল।

—এটা সমিতির কথা নয় রসময়, এটা সমাজের কথা। যা বোঝ না তা নিয়ে বেশী বকো না। কত বড় গায়েন-বংশ আমার জান, সাত রাত মিলিটারীর ক্যাম্পে থাকা বউ ঘরে নিলে কোথায় থাকবে মান-মর্যাদা। আমার গুরু পা ধোয় না যার তার বাড়ি। ও বউ ঘরে নিলে আর কি সে জলস্পর্শ করবে আমার ওখানে। যতকাল ও বেঁচে থাকবে, লোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবে—গায়েন বাড়ির ঐ বউটা সাত রাত মিলিটারীর ঘরে ছিলো। হেঁট হবে না আমার মাথা। দুর্নাম পড়বে না আমার বংশে—

হরিপদর কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সব। খানিকটা দূরে ডিঙির ওপর হক্কা হাতে করে পাহারা দিতে দিতে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গুণধর। কথা শুনতে পাচ্ছে না—কিন্তু দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করে বুঝে নিতে চাইছে পাখীর ভাগ্য। হঠাৎ মানুষগুলোর এই ভাবান্তর দেখে

সে চমকে ওঠে আনমনে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রসময় আস্তে আস্তে বলে,—মাথা হেঁট হবে তোমার—

হরিপদ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়,—শুধু আমার নয়, সবারই হয়। ও মেয়েকে নিয়ে এখন সমিতি করা যেতে পারে কিন্তু ঘরের বউ করা চলে না। কেউ করে না এখানে। তার মুখের ওপর কথাটা বলতে চাই না, তাই বলছি, ওকে অন্য কোথাও পাঠাও।

—সমিতি করা চলে, কিন্তু ঘর করা চলে না—তাহলে ঘর-সংসারের চাইতে সমিতি ছোট—। তীরের মতো সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় রসময়।

হরিপদ বলে,—তা বলছি না কিন্তু সমিতি আর সমাজ তো এক নয়।

—তার মানে ওকে তুমি ত্যাগ করতে চাও? হরিপদ মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করে ত্রিপুরারি।

—তা না করে উপায় কি। ওর দায়ে মান-মর্যাদা খোয়াতে তো আর পারি না।

আবার নীরব হয়ে যায় সব।

অন্ধ রসময় আস্তে আস্তে সরে যায় এক পাশে।

ত্রিপুরারি খুব আস্তে আস্তে যেন স্বপ্নের ঘোর থেকে কথা বলছে এমনিভাবে বলে,—যেদিন পাইক-বরকন্দাজ ঘরে ঢুকলে বউ ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে হতো ভয়ে—বাপ হয়ে মেয়েকে তুলে দিয়ে আসতে হতো কাছারিতে—।

ত্রিপুরারির কথা বলার ধরন দেখে হরিপদ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। এইবার সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—সে যাদের হয়েছে তাদের। কিন্তু আমাদের গাঁয়েন বংশে তা কোনদিন হয়নি।

কিন্তু সে কথা ত্রিপুরারির কানে যায় না, তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে একটা ছবি—ক'বছর আগেকার—কিন্তু মনে হচ্ছে বুঝি এখুনি ঘটে গেল সেটা।

তার পাশের বাড়ির ঘটনা। তের-চোদ্দ বছরের ফুটফুটে মেয়ে।

বাপ-মা আদর করে নাম রেখেছিল বাসন্তি। একদিন গাঁয়ের কোলে ছাগল চরাতে গিয়ে নজরে পড়ে গিয়েছিল নায়েবের। ছাগল ফেলে রেখেই বিব্রত হয়ে পালিয়ে এসেছিল মেয়েটা। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি পায়নি। একটু পরেই নায়েবের ঘোড়া ঘুরে এসে দাঁড়াল তার বাড়ির সামনে। ঘরের খুঁটিতে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে ঘরে ঢুকে সোজা আদেশ দিল সে,—এক গ্লাস জল পাঠিয়ে দেতরে মেয়েটাকে দিয়ে।

অসহায় মা-বাপের চোখের সামনে দিয়ে আতঙ্ক-বিহ্বল মেয়েটা ঘরে ঢুকেছিল জলের গেলাস হাতে করে। একটু পরেই একটা আর্ত চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। শুধু সেমিজটা গায়ে রয়েছে, ঠকঠক করে কাঁপছে গোটা দেহ—ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল,—ওগো-মাগো—ওগো আমায় বাঁচাও গো—ওগো—বাবু ওকি কথা বলছে গো।

ব্যর্থতায় মুখ লাল করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল নায়েব। শাড়িখানা তখনও হাতের মুঠোয় ধরা। সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল ঘোড়া ছুটিয়ে। একটু পরেই তিন-চারজন পাইক এসে হুকুম জারি করে গেল মেয়ের বাপকে,—আজ রাতেই ও মেয়েকে তুলে দিয়ে আসতে হবে কাছারিতে, নইলে।—তারপর একটু থেমে বলেছিল—যদি পালাবার চেষ্টা কর—ত ঐ কোলের ছেলেটা পর্যন্ত রেহাই পাবে না।

বাকি গোটা দিনটা মেয়ের বাবা কেঁদে কেঁদে ফিরেছিল গাঁয়ের প্রত্যেকের দুয়োরে দুয়োরে। কিন্তু জলে বাস করে কুমীরের সংগে বিবাদ করবে সেদিন এত সাহস কেউ ধরতে পারেনি। কেউ বা বলেছিল,—ঐ ওর নিয়তি। নইলে এমনভাবে নায়েবের সামনেই বা পড়বে কেন। একটার দায়ে শেষে পাঁচটা না যায়।

তাদের নিরুপায় চোখের সামনে দিয়ে মেয়ের বাবা আলো হাতে করে মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল গাঁ থেকে—। অন্ধকার মাঠে আলোর শিখাটা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে হতে মিলিয়ে গেল এক সময়। কাছারির প্রান্ত থেকে একটা মর্মান্তিক কান্না বিদ্যুতের মত চমকে উঠল গাঁয়ে,—ওগো বাবা আমায় ধরল গো—বাঁচাও গো—।

পরের দিন মেয়ের বাবার লাস পাওয়া গেল খাড়ির জলে, গলায়

কলসী বেঁধে ডুবে মরেছে সে। আর মেয়েটা—কে জানে কি তার পরিসমাপ্তি।

বর্বর ঔদ্ধত্য সেদিন এমনিভাবেই গোটা সুন্দরবনের মাথাটাকে পায়ের নিচে লুটিয়ে দিতে চেয়েছিল। এই অরণ্যই তার সাক্ষী। সব জানে সে। সমুদ্রের তট ঘেঁষা তার ঐ মৌন রেখার নিচে স্তব্ধ হয়ে আছে শতাব্দীর পর শতাব্দীর কত দৃশ্য! মগ, পর্তুগীজ, দিনেমারদের বীভৎস তাণ্ডব, অন্তরের অভ্যন্তরে হিংস্র পশুর নির্লজ্জ আস্ফালন। যুগ-যুগান্তরে অনেক রক্ত, অনেক অশ্রু ঢাকা আছে তার মর্মরে। আজও সে দেখছে—দেখছে আর একদল মানুষকে। ভাবছে তার কান্না-ভেজা মাটিতে আগুনের এই স্ফুলিঙ্গগুলো কোথা হতে উড়ে এলো। আজও দূরে ঘর জ্বলছে, মাঠে ধান পুড়ছে—অগ্নিশিখা রক্তের অক্ষরে শূন্য আকাশে এক লিখন লিখে যাচ্ছে—তেমনি আর্তনাদে আজও কাঁদছে মাঠের হাওয়া। কিন্তু এখানে এই স্ফুলিঙ্গর স্পর্শে অশ্রুজল কি আজও বাষ্প হবে না? আজও কি জীবনের চেয়ে মর্যাদার দাম বেশি হয়নি। ত্রিপুরারির কাছ থেকে একটু তফাতে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে আর একটা ছবি দেখছে রসময়।

আত্মগোপনের ডেরা থেকে একসঙ্গে ধরা পড়েছিল তিনজনে। সে আর দুজন মহিলা কর্মী—নিত্য আর কৌশল্যা। সাত মাস গর্ভবতী নিত্যর ভ্রূণটা মিলিটারীর লাথিতে সেখানেই ঝরে পড়ে মাটির ওপর লিখে দিয়েছিল 'আমি রক্ত'। আর তারা দুজনে চালান হয়ে গিয়েছিল কাছারি বাড়ির ভেতর।

সারাটা দিন মারের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার পর গভীর রাতে তাকে তুলে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল আর একটা আলো জ্বালা ঘরের ভেতর। একটা গোল টেবিল। সামনে চেয়ারে বসে রয়েছে নীল জামা গায়ে অফিসার। মাথার চুলগুলো ঘুরে কপালের ওপর এসে পড়েছে—নেশায় টকটকে লাল চোখ। একধারে বেঞ্চিতে বসে রয়েছে কাছারির নায়েব, লাটদারের ছোট ছেলে, আশেপাশের

অঞ্চলের আরও দু-তিনজন ছোটখাট জোতদার। চারজন বন্দুকধারী মিলিটারী পাহারা দিচ্ছে দরজার সামনে, তাদের পেছনে একদল সশস্ত্র লাঠিয়াল। ঘরের ভেতরই মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে রয়েছে কৌশল্যার অর্ধনগ্ন দেহটা। তার মাথার চুল থেকে দোমড়ান পায়ের পাতা পর্যন্ত অবিচার তার নির্লজ্জ স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে।

সেদিকে তাকিয়ে হতবিহ্বল হয়ে গিয়েছিল রসময়। এই হাল করেছে কৌশল্যার। অনেক পুরুষের চেয়েও যে শক্ত কর্মী ছিল এই তার অবস্থা। কতক্ষণ যে সেদিকে তাকিয়েছিল হুঁশ নাই—হঠাৎ অফিসারের কড়া গর্জন শুনে ফিরে তাকাল,—এই শুয়ার, সিধা দাঁড়াও। দেখেছ ওর হাওলাত। বাঁচতে চাও তো সত্যি কথা বল। কোথায় থাকে তোমাদের নেতারা, কোথায় গোপন আস্তানা তাদের—চেন ত্রিপুরারিকে? কোথায় লুকিয়ে আছে সে? বলে আঙ্গুলটা তুলে কৌশল্যাকে দেখিয়ে নাচাতে নাচাতে বলেছিল,—ভগবান এলেও ওকে বাঁচাতে পারবে না এখানে। তবে সব যদি কবুল কর ত আর কিছুই বলব না—খালাস দিয়ে দেব।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল রসময়। দুটো হাতই দড়া দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। টেবিল থেকে একটা আলপিন তুলে নিয়ে সেই বাঁধা হাতের একটা বুড়ো আঙ্গুলের নখের ভেতর টিপে ধরে অফিসার বলল,—বল। বলতে হবেই। বলিয়ে তবে ছাড়ব। দেখছ কি—ও প্রথমে তোমার মতোই করছিল, তারপর ক্যাম্পের ভেতর থেকে দুপাক ঘুরে এসে সব কবুল করেছে।

রসময়ের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। সব বলে দিয়েছে কৌশল্যা! অনেক কিছুই ত সে জানত। সব কথাই সে বলে দিয়েছে—! তাহলে ত অনেক অনেক কর্মী ধরা পড়ে যাবে।

হঠাৎ কৌশল্যার অসাড় দেহটা যেন একটু নড়ে উঠল। রক্ত আর ক্ষতের ভেতর থেকে বোজান পাঁপড়ি মেলে ধরল দুটো চোখ—স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেই চোখই যেন অবশেষে কথা বলে উঠল,—না কমরেড, কিছুই বলিনি আমি। সব মিছে কথা। কথা বলাবার জন্যে ওরা সব কিছু করেছে—কিন্তু আমি কিছুই বলিনি—তুমি বিশ্বাস করো না।

ওরা একটু জলও .খেতে দেয়নি আমায়। তুমি আমায় একটু জল খেতে দেবে কমরেড—

একটা হুঙ্কার যেন রসময়ের সমস্ত সত্তা ভেঙ্গে গর্জন করে উঠল,—চোখের ওপর এমনি করে খুন করবে মেয়েটাকে! কি ভেবেছ কি তোমরা!

বাঁধা হাত দুটো ঝাঁকিয়ে ছিড়ে ফেলে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল অফিসারের উপর। কিন্তু তার আগেই দুপাশ থেকে দুটো ঘুসি এসে তার মাথাটা যথাস্থানে ঠিক করে দিল। হিংস্র দৃষ্টিতে অফিসার অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। তারপর বলল,—হ্যাঁ! বড় দামী চোখ তোমার। তার সামনে ত কিছুই করা চলবে না।—এই, বাহার লে যাও ইসকো। চোখ দুটো উপড়িয়ে ছোড় দেও। যাও—তোমার নেতাদের গিয়ে বলো, ধরা পড়লে এমনিধারা একটা একটা করে চোখ উপড়ে নেওয়া হবে তাদের।

রাতের সে অন্ধকার আর পরিস্কার হয়নি তার কাছে। কৌশল্যাও আর ফিরে আসে নি। কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি তার। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই তাকে মেরে ফেলছে। শুধু তাকে ঐ কথা দুটো বলবাব জন্যই অতক্ষণ সে বেঁচে ছিল। কিন্তু আজ যদি কৌশল্যাই ফিরে আসে—তাহলে? স্বামী সংসার সবাই ত্যাগ করবে তাকে। এত অত্যাচার সহ্য করে সেখানে যে মাথা নোয়াল না—আজ ফিবে এসে শুনবে তার জন্য তার স্বামী শ্বশুরের মাথা হেঁট হয়েছে।

এক মনে বসে বসে ভাবছিল সে। ত্রিপুরারি কখন যে পাশে এসে বসেছে খেয়ালই করতে পারেনি। হঠাৎ পিঠে হাত পড়তেই চমকে উঠল,—কে?

—আমি ত্রিপুরারি, বসে বসে কি ভাবছ কমরেড?

—ভাবছি—হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরারির হাত দুটো চেপে ধরল,—পাখীকে নিয়ে এস কমরেড। তাঁকে বাঁচাও। তুমি আমাদের সেক্রেটারি। তোমাকেই জোর ধরতে হবে। আমরা পুরুষেরা যাদের সঙ্গে লড়াই করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি ওরা মেয়েমানুষ কি করবে তাদের। কৌশল্যা শেষ সময় একটু জল চেয়েছিল আমার কাছে—

তেষ্টা বুকে নিয়ে মরেছে সে—। আন্দোলন শেষ হলে আমরা ধান পাব, জমি পাব, হরিপদ আবার ছেলের বিয়ে দেবে—হাসবে—আর পাখী কেঁদে কেঁদে ভেসে বেড়াবে! না কমরেড, মহাপাপ হবে তাহলে। এ ঠিক কথা নয়—ঠিক নয়। মাথাটা দোলাতে দোলাতে অন্ধের চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল ত্রিপুরারির হাতের ওপর।

ত্রিপুরারির রোগা কাল দেহটা কেঁপে উঠল থর থর করে। তাড়াতাড়ি দুহাত দিয়ে রসময়কে জড়িয়ে ধরে সে বলল—কেঁদ না। চুপ কর। ছিঃ। আমাদের কাঁদতে নেই। পাখীকে নিশ্চয় আনব। আমাদের জন্যে যারা রক্ত দিচ্ছে তাদের হেনস্থা করলে বেইমান হয়ে যাব যে।

— কিন্তু হরিপদ যে তোমার কথা শুনছে না।

—শুনবে বইকি! শোনাব তাকে। কোথায় যাবে সে, গোটা সমিতি যদি একমত হয়।

—তাই কর। যাতে পাখীর কোন ক্ষতি না হয় তাই কর।

শীতের দিন এগিয়ে চলেছে ক্ষয়ের দিকে। আত্মগোপনকারী কর্মীদের এই ডেরাটায় স্বেচ্ছাসেবকেরা দ্রুত তৈরি হয়ে নিচ্ছে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। হ্যাণ্ডবিল আর পোষ্টারগুলো কাপড়ে বেঁধে ভরে নিয়েছে পেটের তলায়, মাথায় জড়িয়েছে গামছার পাগড়ি। খাড়ির বুকে বাঁধা ডিঙি নৌকার হাল-দাঁড়ের বাঁধনগুলো পরীক্ষা করে দেখছে কেউ কেউ—কেউ বা মৃদুস্বরে সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করছে,—টর্চ লাইটটা নিয়েছিস ত।

—একখানা পতাকা সঙ্গে করে নে গুটিয়ে।

সারাটা রাত গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে সেখানকার রিপোর্ট আনতে হবে—করণীয় নির্দেশগুলো পৌঁছে দিতে হবে মানুষদের কাছে। তাই বিভিন্ন এলাকার নেতাদের কাছে আদেশ নিয়ে নিচ্ছে প্রয়োজন মত।

—রাখাল হালদার যদি দেখা করতে চায় নিয়ে আসবে তাকে।

—রাজেন গুড়িয়াকে নিতে বলব সমিতিতে।

এর ভেতর শুধু ত্রিপুরারি একটা গাছের গুঁড়ির ওপর চুপ করে বসে

বসে ভাবছে। সারাদিন হরিপদকে সে কিছুতেই বোঝাতে পারেনি। অন্য বয়স্ক কর্মীরাও চুপ করে রয়েছে। একমাত্র রসময় বলেছে বটে কিন্তু তার কথার কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না হরিপদ। বসে বসে সে ভাবছে কি করবে, এমন সময় ক'জন স্বেচ্ছাসেবক তার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল,—তাহলে আপনি যাবেন ত ও এলাকায়। মিটিং এর ব্যবস্থা করে আসব।

ত্রিপুরারি শান্ত গলায় বলে—না।

স্বেচ্ছাসেবকরা একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়।

ত্রিপুরারি বলে,—সবার বেরিয়ে গেলে ত চলবে না। পাখীর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তোমরা কানাই মোড়লকে একবার ডাক ত।

একজন স্বেচ্ছাসেবক গিয়ে কানাই গুড়িয়াকে ডেকে নিয়ে এল। লাটদারের ছুটো লেঠেল নিখোঁজ হওয়ায় হুলিয়া ঝুলছে তার মাথার ওপর। এমনি নেতৃস্থানীয় না হলেও বয়স্ক লোক বলে সবাই সম্মান খাতির করে তাকে। সে আসতেই ত্রিপুরারি জিজ্ঞেস করে,—তাহলে পাখীর কি করা যায় বল। হরিপদ ত ত্যাগ করবে তাকে ? এধারে অন্য কোথাও পাঠাতে হলে আগে খবর দিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে হুট করে এ অবস্থায় তুলবেই বা কোথায় ?

—সে ত ঠিকই। কানাই মোড়ল তার কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ে।

—আর গাঁয়েও এ অবস্থা নয় যে থাকে। শেষে মিলিটারীর হাতে রেহাই পেয়ে—আমাদের হাতে খুন হবে মেয়েটা।

—ভাই কি হয় !

—তবে তাহলে নিয়ে আসতে বলি তাকে এখানে—।

—দাঁড়াও! ডাকি একবার হরিপদকে। বলে দাঁড়িয়ে থাকা স্বেচ্ছাসেবকদের একজনকে বলল—কই সে ? ডাক ত তাকে।—

একধারে মাটির ওপর একখানা গামছা পেতে শুয়েছিল হরিপদ। ডাক শুনে উঠে আসতেই কানাই মোড়ল বলল—হ্যাঁ গো পাখীর তা হলে কি হবে ? এখানে তাকে আনা ছাড়া আর ত কোন উপায় দেখছি না এখন।

কানাই মোড়লের কথা শুনে হরিপদ ত্রিপুরারির মুখের দিকে তাকায়। বোঝে, তারই প্ররোচনায় কানাই মোড়ল এ কথা বলছে। তাই তাকে উত্তর না দিয়ে সে সোজাসুজি ত্রিপুরারিকেই বলে,—সকাল থেকে বার বার বলছি এখানে ওকে এনো না—তা আমার কথাটা শুনবে না।

ত্রিপুরারি সেই গাছের গুড়ির উপর উবু হয়ে বসে বসেই জবাব দেয়,—বুঝে দেখ! বিপদের সময় মানুষ তার আত্মীয়-স্বজনের কাছেই যেতে চায়। এখানে তুমি রয়েছ, তাব স্বামী রয়েছে— ।

হরিপদর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠে। সে বলে,—তার স্বামী হতে পারে কিন্তু সে ত আমারই ছেলে— ।

সারাদিন এই একই বিরোধিতায় ত্রিপুবারিও এবার উত্তেজিত হয়ে বলে,—ছেলে তোমার হতে পারে কিন্তু সে সমিতির কর্মী। সমিতি হুকুম দিলে সে তো ছেলেমানুষ, তুমি শুদ্ধ মানতে বাধ্য।

—সমিতির হুকুম দেবার তুমি কে হে— ? চিৎকার করে রুখে দাঁড়ায় হরিপদ।

এক লাফে কাঠটার ওপর থেকে নেমে ত্রিপুরারি ওর সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বলে,—আমি সেক্রেটারি!

—সেক্রেটারি! বটে! আমরা পাঁচজন যেমন তোমায় করেছি তেমনি আবার ঘাড় ধরে নামিয়ে দিতে পারি জান।

—যখন দেবে দিও। কিন্তু এখন আমার কথা শুনতে হবে।

দুজনের চেঁচামেচি শুনে চারি পাশ থেকে সবাই ছুটে এসেছে। স্বেচ্ছাসেবকরা যারা প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল তারাও এগিয়ে এসে এক পাশে কুঁচ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমিতির নেতাদের এ রকম প্রকাশ্য কলহ তারা কোন দিন শোনে নি।

কানাই গুড়িয়া দুহাত দিয়ে দুজনকে ঠেলে দিয়ে বলল,—আরে ঝগড়া করো না তোমরা—ছিঃ ছিঃ। শেষে ভেঙ্গে দেবে নাকি সমিতিটা।

ত্রিপুরারি তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার গাছের গুড়িটার ওপর উঠে বসল,—সমিতি ভাঙ্গার কি আছে এতে! এই তো সবাই রয়েছে—জিজ্ঞেস করো মতামত। কি গো তোমাদের কি মত বল ত।

পাখীকে আনা হবে এখানে? হরিপদ তো তাকে ত্যাগ করবে বলছে।

—ত্যাগ করবে কেন? স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা প্রশ্ন করে। সকাল বেলার ওদের আলোচনা এখনও কেউ জানে না।

—মিলিটারী ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলে—।

—না গো আমি ত্যাগ করার কথা বলি নি—। ত্রিপুরারিকে থামিয়ে দিয়ে হরিপদ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,—চিকিৎসা করাতে যত টাকা লাগে দেব বলেছি আমি। ক' বিঘে জমিও লিখে দেব তার নামে। যত দিন বাঁচবে—খাবে। তা বলে ঘরে কি ফিরিয়ে নেওয়া যায় তাকে—বল তোমরা।

—কেন, নেওয়া যাবে না কেন? স্বেচ্ছাসেবকদলের নেতাই আবার কথা বলল,—গুণধর তো তাকে নেবে বলেছে।

হরিপদ ওর কথা শুনে আবার রুখে ওঠে,—গুণধর বললেই তো আর হবে না। মানসম্মান বলে জিনিস তো আছে একটা—নাকি একটা বৌ হলেই হল—।

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা এর জবাবে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে কানাই মোড়ল বলে,—আরে বাপু নিস না নিস সে তো পরের কথা। আন্দোলনে জয় হোক—ঘর বাড়িতে ফিরে যাই তারপরে। কিন্তু এখন তাকে আনতে দোষটা কি?

—দোষ বুঝতে পারছ না। হরিপদ আঙুল তুলে গুণধরকে দেখিয়ে বলে,—ওর কাছে থাকতে থাকতে যদি ছেলেপিলেই হয় দু-একটা, তখন সে বংশ পরিচয় দেবে না? ভাগ নেবে না সম্পত্তির—।

—এ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ! এ যে এখন থেকে সম্পত্তির ভাগ কষছে মনে মনে—মরেছে রে—। স্বেচ্ছাসেবকদের ভেতর থেকে কে একজন মন্তব্য করে উঠল।

—এ্যাই কে রে? কানাই মোড়ল তাকে একটা তাড়া দিয়ে হরিপদর দিকে ফিরে বলল,—সে তখন একটা প্রায়শ্চিত্তি মতো করে নিস বাপু। যা হয়েছে সে তো আর ফিরবে না। তাছাড়া তোর বেটার যখন মত আছে।

—বেশ! বেশ! ভালো? স্বেচ্ছাসেবকদের ভেতর থেকে আবার

মন্তব্য করে একজন। মাথায় পাগড়ি বেঁধে হাতে টর্চলাইট ঝুলিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। ওধারে কাঠের গুড়ির ওপর বসে ত্রিপুরারি—হরিপদ দাঁড়িয়ে মাঝখানে—আর তার খানিকটা তফাতে কানাই মোড়ল। রসময় ও আরও কয়েকজন বুড়ো বসে রয়েছে এক পাশে। মাথার ওপর ডালপালায় বিকেলের ঘর-ফেরা পাখীরা চেঁচামেচি করছে। খাড়ির ওপারে বেতের বনের ভেতর একটা ফেউ ডাকছে। বহুদূরে সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে একটা জাহাজ ভেসে যাচ্ছে কোন দেশে।

স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা বলল,—বেশ বিচার! সাপে খেলে তোমায় খাক, মানিক পেলে আমি ভাগ নেব!

—কেন! এতে ঠাট্টার কথা কি হল? কানাই মোড়ল বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে তাকে।

—তাই তো বলছ তুমি? স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কানাই মোড়লকে কথা ঘুরিয়ে দেয়।

—আমি তাই বলছি?

—বলছ না? গাঁয়ে গাঁয়ে তোমরা মিটিং করে মানুষকে বলবে হামলা রুখতে। তারপর কিছু হলে বলবে প্রায়শ্চিত্ত কর। তোমার নামেও তো হুলিয়া বেরিয়েছে। লাটদারের পায়ে ধরে প্রায়শ্চিত্ত করগে না। মাপ পেয়ে যাবে।

বয়সের জন্য কানাই গুড়িয়াকে সমীহ করে সবাই। তাই ব্যক্তিগত আক্রমণে সে যেন ক্ষেপে উঠল। কাঁপতে কাঁপতে বলল,—কি? কি? কি বললি তুই—আমি পায়ে ধরে মাপ চাইব লাটদারের—

ওপাশ থেকে ত্রিপুরারি ধমক দিয়ে ওঠে,—এ্যায় মুখ সামলিয়ে কথা বলবি।

ত্রিপুরারি কাঠের গুড়িটার উপর থেকে নেমে দাঁড়াল। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা তাকে গ্রাহ্য না করেই বলল,—থামব কেন? সমিতির মিটিং-এ সবারই কথা বলার অধিকার আছে।

—তা বলে তুই যা খুশি তাই বলবি। ত্রিপুরারি আবার ফিরে কাঠের গুড়িটার উপর বসল।

পাগড়ি-বাঁধা মাথাটা নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা ছু'পা সামনে এগিয়ে এসে বলল—যা খুশি তোমরাই বলছ। সকাল থেকে তাকে আনবার কোন ব্যবস্থা নেই, শুধু ঘোঁট পাকাচ্ছ বসে বসে। মান মর্যাদা কিসের শুনি। আগে তো কাছারিতে ধরে নিয়ে গিয়ে জুতা পেটা করত, এখনও ধরা প'লে যদি বেত মারে, কি ঐ রসময় খুড়োর মতন কানা করে দেয়—তাতে মান যাবে না। মান যাবে ওকে ঘরে নিলে। তাহলে সমিতি থেকে কোন মেয়েকে আন্দোলনে ডাকতে পাবে না। তারা ধরা পড়লেই তো ঐ হবে। বেটাছেলেদের ধরে কানা কি খোঁড়া করে ছেড়ে দিচ্ছে—কি মেরে ফেলছে—আর ওরা ধরা পড়লে শালা কুকুর ওদের মাংস চাটছে। ওদের দোষ কি তাতে।

—ঠিক। নেতার কথা সমর্থন করে ছু-তিনজন স্বেচ্ছাসেবক। একজন বলে,—তা ছাড়া আমাদের মান তো আন্দোলনের ওপর। আন্দোলন যত জোর হবে তত আমাদের নাম-যশ। হেরে গেলে সবার মুখেই তো চুনকালি পড়বে—ধরে মেরে দেবে কুকুরের মতো গুলি করে।

—নিশ্চয়! বলে ওঠে আর একজন স্বেচ্ছাসেবক।

—তাছাড়া বংশ নিয়ে আমরা কি করব? ঐ যে ওপর থেকে আমাদের সমিতির নেতারা আসে—আমরা কি তাদের বংশ মর্যাদার খবর নিই, না কার ক'বিঘে জমি আছে খোঁজ করি। আন্দোলন ভাল চালায় বলেই তো দেশের লোক তাদের মানে—।

—নিশ্চয়ই।

গোটা স্বেচ্ছাসেবক দলটা বিপক্ষে ঘুরে যাওয়াতে ঘাবড়ে গিয়েছে হরিপদ। বিশেষ করে গুণধর তাকে নেবে বলাতে আরও অস্বস্তি বোধ করেছে মনে মনে। কিন্তু সেটা বুঝতে না দিয়েই সে বলে ওঠে,—অত বোঝাতে হবে না আমায়। ছোট ছেলে নই আমি। গুনধরকে তো উস্কিয়ে দিলে হবে না। জিজ্ঞেস করি—তোমাদের কারও বৌ যদি এ রকম সাত রাত মিলিটারীব ঘরে ভরা থাকত —নিতে তাকে?

—আলবৎ! আর আমরা ওসকাব কেন গুণধরকে। ও নিজে

বোঝে না। কিরে গুণধর তোকে আমরা উসকেছি—।

স্বেচ্ছাসেবকদের গোটা দলটা ঘুরে তাকাল তার দিকে। গুণধর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল,—ওসকাবে আবার কে? আমি কি কচি খোকা নাকি? আমি তো বলেছি ওকে নেব!

—কিন্তু তোর বাবা যে অমত করছে—।

—সমিতি হুকুম দিক না আগে—।

—আর তোর বাবা যদি ঘরে না নেয়—।

—ঘর তো সে আমার সঙ্গে করবে—না। থেমে বাকিটুকু ঘুরিয়ে নিয়ে বলে,—ঘর বাঁধব আলাদা।

সকাল থেকে এই কথাটা জানিয়ে দেবার জন্য সে ছটফট করেছে। কিন্তু বয়স্ক নেতাদের কাছে বৌ এর কথা বলতে পারে নি সঙ্কোচে। আজ সাতদিন ধরে আগুন জ্বলছে তার মাথার ভেতর। অপলক দৃষ্টিতে পাখী যেন তাকিয়ে রয়েছে তার মুখের দিকে। চোদ্দ বছর বয়সে যখন তার বিয়ে হয় তখন পাখী ন'বছরের। কত ঘটনা, কত স্মৃতি সব মনে পড়ছে—একে একে। একদিন খেতে দিতে দেরি হয়েছিল বলে গুম গুম করে কিল মেরেছিল তার ঘাড়ে। আর সেই শোধ নিতে বাড়ির পাশের এক বৌদিদির 'ওস্কানিতে পাখী একটা জুতোয় দড়ি বেঁধে তার গলায় ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে পালিয়েছিল ছুটে—বৌ-মারার সাজা।

চমকে উঠে রাগে অপমানে তাকে আরও মারবার জন্য এঁটো হাতেই তাড়া করেছিল সে—ধরেও ফেলেছিল দু'পা যেতে না যেতেই —কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাখী তার বুকে মুখ গুঁজে এমন করে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল যে সে আর মারতেই পারে নি তাকে। যতই তাকে ছাড়াবার চেষ্টা করেছে ততই পাখী আরও জড়িয়ে ধরে বলছে—বল আগে মারবে না?

—ছাড়! ছাড় বলছি ভাল চাসত।

—না ছাড়ব না, বল মারবে না।

—ভাতের এঁটো লাগছে তোর গায়ে!

—লাগুক, তুমি মারবে না বল।

—করলি কেন এ-কাজ ?

—বৌদিদি শিখিয়ে দিল যে।

পাখীকে মারতে পারে নি গুণধর, ভাত মাখা এঁটো হাতটা বেশ করে তার মুখে বুলিয়ে দিয়ে বলেছিল,—জুতো ছোঁড়া বৌ-এর সাজা।

সেই পাখী! হামলা রুখতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছে সে। আক্রোশের আগুন তার চোখে ধকধক করছে, তার সামনে কি সমাজের কোন বিধান দাঁড়াতে পারে! মুখ লাল করে সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—গুষ্ঠি বেচি শালা সমাজের। সে শালার গুরু খেল—আর না খেল বাড়িতে তাতে—।

—এ্যাও! ছেলেকে একটা কড়া ধমক দিয়ে চায় হরিপদ। কিন্তু তার রুদ্রমূর্তির সামনে কণ্ঠস্বর আপনি নির্জীব হয়ে যায়।

একজন জোয়ান স্বেচ্ছাসেবক তু'পা এগিয়ে এসে হরিপদর সামনে হাতটা নেড়ে বলে,—ও পুরানো বুদ্ধি আর চলবে না। ওই বুদ্ধি নিয়েই মার খেয়েছ চিরকাল, কিছুই করতে পার নি। সেদিন আর নেই। ওসব গুরু-পুরুতকে এবার টিকিট কাটতে বল। খুব মেরেছে শালারা—।

তার কথা বলার ভঙ্গীতে খুক খুক করে চাপা হাসি হেসে উঠল তু'জন অল্প বয়সী স্বেচ্ছাসেবক। আর হরিপদ কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—আমি নালিশ করব জেলা সমিতিতে। আমাকে অপমান করলি তোরা। ত্রিপুরারি, তুমি সেক্রেটারী। তোমায় জানিয়ে রাখছি আমি এর বিচার চাই।

—বিচার করুক জেলার নেতারা এসে। আর আমরা পাখীকে ঐ রসময় খুড়োর গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে গলায় মালা পরিয়ে শোভাযাত্রা করে পায়ের ধুলো নেব। বলব, এরা কেউ চোখ দিয়েছে, কেউ ইজ্জত দিয়েছে তাই আন্দোলনে জয় হয়েছে আমাদের। দেখি লোকে কি বলে। স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কথাটা বলেই বলল—এই

চল ! চল ! রাত হয়ে এল যে— ।

আনুষ্ঠানিকভাবে সে সেক্রেটারী ত্রিপুরারির অনুমতিটাও ভুলে গেল। বনের এধার ওধার দিয়ে ডিঙি-নৌকা বেয়ে নিমেষের মধ্যে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল চার ধারে।

কিন্তু সংশয় তখনও কাঁপতে লাগল বনের হাওয়ায়। তাই ভোর রাতে বয়ে আনা পাখী গুণধরের কোলে মাথা রেখে প্রথমেই প্রশ্ন করল স্বামীকে,—কিন্তু আমায় কি তুমি ঘেন্না করবে না মনে মনে। বল সত্যি করে —।

—তার আগে তুই একটা জবাব দে ।

—কি ?

—এই আন্দোলনে আমি যদি কানা খোঁড়া কি অথর্ব হয়ে যাই, তুই আমায় ফেলে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবি আর একটা।

—ছিঃ ছিঃ ! কি কথা। পাখী তার শীর্ণ হাতখানা তুলে স্বামীর মুখটা চাপা দিল।

গুণধর আস্তে আস্তে হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বলল,—ওসব ভেবে এখন মন দুর্বল করিস না। সেরে ওঠ তাড়াতাড়ি। বহু কাজ এখন। তারপর আন্দোলনে যখন জিতব তখন সে আনন্দে, তুইও ভুলে যাবি এসব।

—কিন্তু কেউ যদি ছিঃ ছিঃ করে।

—কে ? আবার গুণধরের চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলে উঠল,—সমিতির যারা বিপক্ষে—তারা ? মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলব না তাদের।

পাখী পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে স্বামীর দৃপ্ত মুখের দিকে তাকায়।

রাত শেষ হয়ে গিয়েছে।

নিরাভরণ উষা কপালে শুকতারার টিপ পরে শুচিশুভ্র প্রভাতকে বন্দনা করছে বনের মাথার উপর দাঁড়িয়ে।

একদিন এমনি এক অরণ্যে এক শরাহত ক্রৌঞ্চির বেদনায় এক অমর সঙ্গীতের আবির্ভাব হয়েছিল এক মুনির কল্পনায়। কিন্তু অরণ্যের

আজকের এ গান তার চেয়েও মহান, তার চেয়েও গরিমাময়। ক্রৌঞ্চ এখানে আহত ক্রৌঞ্চির চারিপাশ ঘিরে ডানা ঝাপটিয়ে কাঁদছে না—তার পাণ্ডুর অধরে একটু করে সিঞ্চন করছে জীবনের অমৃত। আর তাই লাঞ্ছিত ক্রৌঞ্চির চোখের পাতায় ধীরে নেমে আসছে এক নূতন স্বপ্ন।

সে স্বপ্ন আনন্দের—আশ্বস্তির—সুখের—স্বস্তির।

খড়ম

মুনীর চৌধুরী



মুনীর চৌধুরীর জন্ম (১৯২৫) ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে। আদি নিবাস নোয়াখালি জেলার গোপাইবাগ গ্রাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (১৯৪৭) ইংরাজিতে এম. এ পাশ করে প্রথমে বিভিন্ন কলেজে এবং পরে (১৯৫০-৫৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষায় অধ্যাপনা করেন এবং এই সময়েই (১৯৫৪) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ পাশ করেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই বাংলা ভাষার অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ পাশ করেন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য ও ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং পরে কলা বিভাগের ডীন হিসাবে কাজ করেন (১৯৪৯-৫১)। ছাত্রাবস্থায় বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৯ সালে কারাবরণ করেন। ভাষা আন্দোলন উপলক্ষে ১৯৫২ সালে পুনরায় কারাবরণ করেন। পূর্ব বাংলার প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের পুরোধাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বাধীনতা সংগ্রামকালে তিনি পাক বাহিনীর হাতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। একাধারে তিনি সাহিত্য সমালোচক, ভাষাতত্ত্বের গবেষক, নাট্যকার এবং গল্পকার রূপে পরিচিত ছিলেন। ১৯৪২ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের নিয়ে লেখা নাটক 'কবর' যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রকাশিত গ্রন্থ—নাটক : রক্তাক্ত প্রান্তর (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ), চিঠি (১৯৪৬), কবর (১৯৪৭), দণ্ডকারণ্য (১৯৪৭), এবং সমালোচনা ও গবেষণা গ্রন্থ : মীরমানস (১৯৪৫), বাংলা গদ্যরীতি (১৯৪০), তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৪৯) এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বেশ কিছু ছোট গল্প।

মস্‌জিদের সামনে একজোড়া খড়ম। রাত্রির অন্ধকারে এশার নামাজের পর একে একে সবাই চলে গেছে, সবার শেষে গেছে সবচেয়ে পরহেজগার ফজু ব্যাপারী। মজবুত খড়ম জোড়া তারই। সারাদিন পায়ে থাকে। অজু করা দেহ মাটির স্পর্শ পায় শুধু এই এশার নামাজের পর। রাত্রির অন্ধকারে একবার মাত্র খড়ম থেকে পৃথিবীতে নামে ফজু ব্যাপারী। সমস্ত দিনের মধ্যে নোংরা মাটি অজু নষ্ট করবার মত সুযোগ পায় এই প্রথম।

সাড়ে চার টাকা দরে ধানের মণ কিনে সওয়া চার টাকা দরে বিক্রি করেও নেকবখত আলেম ফজু ব্যাপারীর মণপ্রতি চার আনা লাভ থাকে। সাধারণের কাছে এ রহস্যের সমাধান অসম্ভব। এমন কি গ্রামের মাতব্বরবাও কোনদিন এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করতে সাহসী হয়নি। খোদার যে প্রিয় বান্দা, খোদার রহমতে তার ভাগ্য অনেক রকমেই খুলতে পারে! গ্রামবাসীরাও তাই বিশ্বাস করত। পাক শরীরে, পাক মনে হালাল রোজগারের চেষ্টা করলে খোদা তার উন্নতি না করেই পারেন না। সমস্ত দিনের মধ্যে সব সময়ে পাক থাকতেও তারা দেখেছে ঐ একমাত্র ফজু ব্যাপারীকেই। চালের বস্তার পাশে চৌকির ওপর পাল্লা সামনে সারাদিনেই তো ফজু ব্যাপারী ওখানে বসে থাকে। অথচ অজু নেই, এমন কথা কোন ক্রেতাই কখনও বলতে পারবে না। যদিই বা এক আধবার পায়খানা-পেসাব করবার জন্য তাকে উঠতে হয় তবু আবার দোকানে এসে বসবার আগেই অজু করে এসে বসা চাই। মেটে রংয়ের পরিচ্ছন্ন খালি গায়ে ফর্সা লুংগি পরে, মাথায় বাঁশের পরিচ্ছন্ন টুপী পরে হ্যাঁচকা এক টানে তুলে ধরে দাঁড়িপাল্লা। হাঁ করে ক্রেতার দল দেখে কি করে অবলীলাক্রমে এক হাতের টানে পাল্লাটা উপরে উঠে যাচ্ছে। একদিকে আধমণি বাটখারা, অন্যদিকে আধমণ ওজনের ধান। একটুও হাত কাঁপছে না, নড়ছে না। সাদা দাড়িগুলো কেঁপে উঠেছে, কাঁধে পিঠের পেটানো মাংসপেশীগুলো থরে থরে ফুলে শক্ত হয়ে স্থির হয়ে যায়,

পেছনে সুসজ্জিত চালের বস্তা খয়েরী পাহাড়ের মত। পঞ্চাশ বছরেও অস্থিমাংসের এই অদ্ভুত বলিষ্ঠতা, এ শুধু খোদার হুকুমেই সম্ভবপর। পাক, নেক লোকেই এ শক্তির অধিকারী হতে পারে। কেউ কেউ তাই চালের বস্তা নিয়ে যাবার আগে ভক্তির আবেগে কদমবুছিও করে ফেলে। ঘুণাক্ষরেও ফজু ব্যাপারীকে সন্দেহ করার মত পাপচিন্তা ওরা মনের মধ্যে ঢুকতে দেয়নি। কোনদিন চালের বস্তা দ্বিতীয়বার ওজন করে তার ওজনের পরিমাপ পরীক্ষা করে দেখবাব অসম্ভব কল্পনা ওদের মনে জাগেনি। আর যদিই বা দেখত, যদিই বা সে মাপ কম ধরা পড়ত—তখন ওরা হয়ত নিজেদের চোখকে অবিশ্বাস করত—কিন্তু ফজু ব্যাপারীকে— !

হাট খোলার মধ্যিখানে বিরাট একটা বটগাছ। কচি সবুজ পাতা ভোরের কাঁচা আলোতে ঝলমল করছে। সাদা, ঠাণ্ডা, আটাল মাটিতে গতদিনের হাটের ভাঙ্গা গুড়ের হাঁড়ির টুকরো, বারীদের ফেলে যাওয়া হলদে শুকনো কলাপাতা, শিশিরে ভেজা খড়ের দলা—এমনি আরো বহু ছোটখাট ময়লা এখানে সেখানে জড় হয়ে রয়েছে। সূর্য তখনও পুরোপুরি ওঠেনি। মতি ডাক্তারের ডাক্তারখানার দরজা বন্ধ। উল্টো দিকের বেনে দোকানের মালিক বসিরউল্লা কারী শুধু তার দোকানের সামনের জায়গাটুকু ঝাড় দিয়ে ঘরের ঝাঁপি তুলে, সুপুরি গাছের তক্তার মাচায় বসে সুর করে কোরান-শরীফ পড়ছে। পাকা বটফলের গোটা খেয়ে বটঘুঘুর ঝাঁক তখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। স্বল্প সূর্যের আলোয় ওদের নরম পাখা তেতে উঠে। পত্ পত্ করে হলুদ মাখান ছাই রংগা ডানা মেলে পাখীগুলো উড়ে চলে গেল।

কাঠের পুলের উপর দিয়ে খড়ম ঠুকে খালের ওপার থেকে ফজু ব্যাপারী আসছে। পুলের মধ্যখানে একবার থেমে নিয়মিত গলায় জিজ্ঞেস করল—

: কৌগা হাইলি আইজ ?

: অনতাই ছোগা।

পুলের নীচ থেকে উত্তর দিল কালা মাঝি। মাথার উপর লুংগি জড়ানো উলঙ্গ বলিষ্ঠ দেহ নাভি পর্যন্ত পানির মধ্যে, দু'হাত দিয়ে

কাঁটাঝোপ সরিয়ে একটা একটা করে বাঁশের 'আন্তা' তুলছে আর তার মধ্যে একটা এক বিঘত লম্বা শ্যাওলাপড়া পুষ্ট চিংড়িমাছ ছপ্ ছপ্ করে লাফাচ্ছে। মনে মনে কালা একবার ব্যাপারীকে ছালাম করল। নেক লোককে দেখলেও বরাত ফেরে। বাকী 'আন্তা'টা ঠিক করে দেখে কালা লুংগি জড়িয়ে উঠে পড়ে। আটটা চিংড়ি হয়েছে। কিন্তু শুধু চিংড়িমাছ দিয়ে কি হবে? অসুখে পড়া মেয়েটা কি খাবে? আগুনে পুড়িয়ে মরিচ দিয়ে সে নিজে না হয় এক বেলা চালিয়ে দেবে, কিন্তু মেয়েটা? একটা চিংড়ি হঠাৎ তার মৃতপ্রায় লম্বা ঠ্যাংয়ের চিমটি দিয়ে কালার হাতের গোশ্ত কেটে বসিয়ে দেয়।

মেয়েটার ক্ষুধার চীৎকার ভোররাতে তার ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছে। বৌকে সে তাই লাথি মেরে ঘর থেকে বেরিয়েছে। বেরিয়েই মনে হয়েছে, লাথিটা তার নিজের গায়েই মারা উচিত ছিল। বুকে দুধ থাকলে আরফানী মেয়েটাকে খাওয়াতে পারে। কিন্তু না থাকলে? মায়ের গোশত মেয়ে খেলে, বোধ হয় তাও পারতো। কালা শিউরে উঠে। আরফানীর বিয়ে হয়েছে মাত্র বছর চারেক হবে, কিন্তু এখন ওর বুকের দিকে চাইলে কালার নিজের বুকই কেঁপে উঠে। কেমন যেন দিনে দিনে বাদুড়ের মত কুঁকড়ে চেপ্টে যাচ্ছে!

: বেগগুণ কি ইছা নিরে?

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে প্রশ্ন করল মতি ডাক্তার। কালা মাথা নাড়ল, রোজকার মত ভয়ে ভয়ে। মতি ডাক্তার কি বলবে তা সে জানত, শুনতে শুনতে তার মুখস্ত হয়ে গেছে। চিংড়িমাছ নাকি পানির পোকা ওতে রক্ত নেই। চিংড়িমাছ ক্রমাগত বেশী খেলে নাকি রক্ত সাদা হয়ে যায়, রক্তে পোকা হয়—কিন্তু তার ঐ 'আন্তায়' এ সময়ে খালে যে চিংড়ি ছাড়া আর কিছুই উঠে না। সে কি করবে?

: কাইল যে তোর মাইয়ার লাই কুইনাইন মিক্চার দিলাম হেইডার হৈয়সা কৈরে কালা?

বলতে বলতে মতি ডাক্তার ওর হাতের খালুই থেকে গোটা চারেক বাছাই করা বড় চিংড়ি তুলে নিয়েছে। ভ্রূ কুঁচকে মাছগুলোকে নিরীক্ষণ করে সে বলতে থাকে—

: একছার গুড়া গুড়া এনা। তা'আ কাইল আরও চাইরগা দিছ হেইলেই সাইরব।

বলে ডাক্তারখানার মধ্যে পা বাড়ায়।

কালা কোন রকমে উচ্চারণ করে: ডাগদার সাব আঁর মাইয়া বাঁইচব ত?

ডাক্তার মুখ খিঁচিয়ে উঠে: বাঁইচত ন' ক্যা? বাঁইচব। খোদা বাঁচাইলে বাঁইচত ন' ক্যা।

কালা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

: হাক্‌করি চাই রইছত ক্যা? খাওয়া, খাওয়া। খাওয়াইলেই মানুষ বাঁচে, বুঝ্যত? তোর মাইয়া বাঁইচব।

কালার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠে। সে টলতে টলতে সরে যায়। ডাক্তার তখনও গর গর করছে: বাঁইচত ন' ক্যা? বাঁচে কিন্তু ক্যাল আঁর কুইনাইনের হানি আর ইছা খাই বাঁচে না—।

দু'হাত দিয়ে কালা দু'কান চেপে ধরে। শেষেরটুকু সে শুনতে চায় না। নিজে জানলেও ডাক্তারের মুখে সে কথা শুনতে চায় না। একবার ইচ্ছা হয় এমন কথা বলবার আগে বাকী চিংড়ি ক'টাও ছুঁড়ে মারে ডাক্তারের মুখে। চিংড়িগুলো সে বাড়ীতে ফিরিয়ে নেবে না। বৌকে সে আজ খেতে দেবে, মেয়েকে সে আজ খাওয়াবে—সাদা চিংড়ি নয়, সাদা চাল, সাদা দুধ! যা খেলে মানুষে বাঁচে, রক্ত লাল হয়।

হঠাৎ ফজু ব্যাপারীর চালের দোকানের দিকে চোখ পড়তেই সে আঁৎকে উঠল। দোকানের কেরোসিন টিনের কালো বেড়ার উপর চুন দিয়ে লেখা—"এখানে মওতের কাপড় বিক্রি হয়"। ছোটকালের বাড়ীর পাঠশালায় শেখা বিদ্যার উপর ও যথেষ্ঠ নির্ভর করতে পারে না। ফজু ব্যাপারীর চালের আড়তে মওতের কাপড় অর্থাৎ কাফনের কাপড়—কবর দেয়ার আগে যে কাপড়—

ভেতর থেকে দেখতে পেয়ে ফজু ব্যাপারী জিজ্ঞেস করে—

: চাই রইছস্ ক্যা? লাইগব নাকি কোনডা?

: না, না। কালা কোন রকমে চীৎকার করে উঠে।

: তোর মাইয়া ভালা নিরে আইজ?

: আইন্তেগো দোয়া, আইন্তেগো দোয়া—বলতে বলতে কালা ছুটে হাটখোলা থেকে বেরিয়ে যায়। যাদের স্বাস্থ্য সুন্দর, যাদের পরণের কাপড় পরিষ্কার, যাদের দেহ 'অজুতে' পাক—তাদের কাছ থেকে কালা পালিয়ে বাঁচতে চায়। ফজু ব্যাপারীর মুখে তার মেয়ের অসুখের খোঁজ থেকে সে ত্রাণ পেতে চায়।

চাল না নিয়ে আজ সে বাড়ি ফিরবে না—এ সমস্যার সমাধান হল মুন্সী বাড়ীর বৈঠকখানায়। আধকানি জমি যদি সে নিড়াতে পারে তবে দেড় টাকা পাবে। তাও খোরাকী ছাড়া। কালা রাজী।

সকাল গড়িয়ে দুপুরের রোদ মাথার উপর তেতে উঠে। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে, প্রায় হাঁটুজল ময়লা গাঁজাল পানিতে দাঁড়িয়ে কালা আগাছা উপড়ে চলেছে হাতের টানে। রোদে পুড়ে পিঠের চামড়া চড় চড় করছে। এক আধ ফোঁটা পানি তাই গায়ে পড়লে সারা গা শির শির করে উঠে। মনে হয় যেন জ্বর আসছে, কাঁপুনি দিয়ে।

দু'দিনের অভুক্ত পেট। দু'রাত চালের দুঃস্বপ্ন দেখা চোখ ঘোলাটে হয়ে আসে। কচি ধানের সবুজ আর ঘাসের তামাটে সবুজ সব ওলট-পালট হয়ে যায়। ঘাস টানতে ধানের গোছা উপড়ে ফেলছে। দু'হাতে রগ টিপে কালা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। চোখ মেলে দেখে সামনের সীমাহীন বাকী জমিটুকু। সবুজ জল ফড়িংগুলো নাড়া পেলেই লাফাচ্ছে।

হঠাৎ ওর মনে হয় আজ না জুম্মার দিন? জুম্মার নামাজ তো সে কখনও বাদ দেয়নি। আজ সে নামাজ পড়বে, আজ তার জীবনে উৎসব! আজ সে টাকা দিয়ে চাল কিনবে, দুধ কিনবে। রাস্তার উপরে এসে কালা আচমকা থেমে পড়ল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে উঠে। নিজের ভুলে নিজেই ও হেসে ফেটে পড়তে চায়। বাড়তি লুংগি তার শেষ হয়েছে যেদিন থেকে সরকারের পেয়াদা এসে তার কেরায়া নৌকা, পঁচিশ টাকা আর ভবিষ্যতের অনেক প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। পরনে লুংগিটা পরেছে একধারে হপ্তাতিনেক

ধরে। লুংগি পাক থাকবে কি করে? সেত আর ফেরেস্তা নয়? আর বৌয়ের সঙ্গে সেত ল্যাংটা হয়ে সংসার করতেপারে না—যে রোজ ভোরে গোসল সেরে পাক লুংগি পরে সে ঘর থেকে বেরুবে? হাসতে হাসতে তার মুখ নীল হয়ে উঠে। আরো কালো হয়ে উঠে যখন অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেল তার বৌ আরফানী চীৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে আসছে। পেছনে ছুটতে ছুটতে আসছে ফজু ব্যাপারী আর গ্রামের দু'চারজন গণ্যমান্য লোক। আরফানীর কাপড়ের বাঁধনে না আছে ইজ্জত, না আছে আব্রু। কালা মাঝির চোখের সামনে সমস্ত দিগন্ত জুড়ে হা হা করে, কানফাটা আর্তনাদ করে সে ছুটে আসছে।

কিছুই হয়নি। দিন চার ধরে অনবরত কেবল কয়েক ফোঁটা করে কুইনিন মিক্‌চারে বেঁচে থেকে এই ভোরবেলা কালার মেয়েটা ছটফট করে মরে গেছে।

ঘরের দাওয়ায় কালা গুম হয়ে বসে আছে। দু'হাতে মাথা গুঁজে পায়ের দিকে মরা চোখে চেয়ে দেখে সেখানে একটা জোঁক অনেকক্ষণ ধরে রক্ত চুষে পেট ফুলে উলটে পড়ে আছে। সেই একটুখানি ক্ষীণ রক্তস্রোতের চারপাশে চামড়া পচা পানিতে ভিজে কেমন যেন সাদা আর ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া। ঘরের ভেতর থেকে আরফানী থেকে থেকে গোংগায়—

: আঁই ভাত খাইয়ুম। আঁই মইত্তামন, আঁই মইত্তামন,—আঁই ভাত খাইয়ুম।

কালা পা'টা একবার নাড়ে। দেখে নড়ে কিনা, মারবার জোর আছে কিনা। ফজু ব্যাপারী চলে গেছে। ফজু ব্যাপারীই দয়া করে সব করে দিয়ে গেছে। মায় নিজের দোকান থেকে কাফনের কাপড়টুকু অবধি ধার দিয়েছে। যাবার সময় শুধু আরফানীকে বলে গেছে—কাফনের কাপড় বাকী রাখা গুনাহ্। ওতে মুর্দার রূহ কষ্ট পায়। কাফনের বাবদ বাকী তিনটাকা তাই যেমন করেই হোক কাল ভোরের মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আরফানী আবার কাতরাচ্ছে।

ঃ আঁই মইত্তামন—আঁই মইত্তামন, আঁই মইল্লে আঁরও কাফনের কাপড়ের দাম বাকী থাইকব। আঁই—

কালার পা মাথা সব ভারী হয়ে আসছে। কিছুই আর নড়তে চায় না। কানের কাছে আরফানীর অসংলগ্ন বিলাপ ওর স্নায়ুতন্ত্রীকে ঠাণ্ডা করে আনতে চায়। কোন রকমে দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে একবার ঘরের দুয়ার অবধি আসে, তারপর সন্ধ্যার আবছা আঁধারে পথ হাতড়ে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে কালা চলতে শুরু করে দেয়। দু'চোখ আটাল হয়ে বুঁজে আসে একটা অদ্ভুত ক্লান্ত, শ্লথ ঘুমে।

বৃষ্টির ছাট লেগে যখন চোখ মেললো তখন দেখে চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, খালপাড়ের মরা তালগাছটার গোড়ায় মাথা দিয়ে সে শুয়ে। চারিদিকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। শুয়ে শুয়েই সে সব কথা মনে করতে পারল। হাত পা সব ব্যথায় টন টন করছে।

মস্‌জিদের কাছে এসে হঠাৎ কি মনে করে তার সামনে বসে পড়ল। তক্তার আর মাটি সিঁড়ির সামনে। এশার নামাজও তখন শেষ হয়ে গেছে, সকলে চলে গেছে। সামনের সিঁড়ির ওপর একজোড়া খড়ম। শক্ত। বড়। ফজু ব্যাপারীর বলিষ্ঠ পায়ের দাগ। মসৃন কাঠের উপর আরো কালো হয়ে ছাপ পড়েছে। পানি আর চামড়ার ঘষায় সে সুস্পষ্ট দাগের গর্ত থেকে আঙ্গুলগুলো স্পষ্ট গোণা যায়। গুণতে গুণতে কালা মাঝির চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে উঠে। বিড় বিড় করে উঠে ঃ আঁই মইত্তামন, আঁই মইত্তামন।

নিঝুম রাত্রির আঁধারে পা টিপে কালা মাঝি ফজু ব্যাপারীর চালের দোকানের পিছন দিকের বেড়া ঘেঁষে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা টিন নিঃশব্দে টিপে দেখছে কতখানি মজবুত!—সড়াৎ করে সে হাতটা সরিয়ে নিল! ভেতরে যেন কারা রয়েছে। কারা যেন নড়ছে। কালা কান পেতে টিনের সাথে চেপে ধরে। ধানের রোঁয়া রোঁয়া গন্ধ এসে কালার স্নায়ু বিবশ করে দিচ্ছে, আর ভেতর থেকে দ্রুত নিঃশ্বাসস্পন্দিত শব্দ শোনা যায়।

ঃ আহ্‌! করস্ কি, এমুই সরি আয়। কাফনের উপর হুচ্ছত ক্যা?

এমুই কাইত্যই আয়।

খিল খিল করে একটা মেয়ে হেসে উঠে—

: কাফনের কাপড় হি-হি-হি-হি—বাঃ হেমুই যে আবারতঁর চাইলের বস্তা। আঁই ইয়ানেই হুইত্তম, চাইলের বস্তার লগে ঠেস দিলে আর ডর কইত্ত না, হি-হি হি-হি।

আরফানীর বিকৃত হাসির কাকলিকে নিষ্পেষিত করে গর্জন করে উঠে ফজু ব্যাপারীর স্ফীত নাসার তপ্ত প্রশ্বাস।

পরের দিন ভোরের বেলায় বটঘুঘুর ঝাঁক যখন রোদের আঁচ পাওয়া মাত্র উড়ে চলে গেছে, সদ্যস্নাত শান্ত সৌম্য ফজু ব্যাপারী যখন তার দোকানে এসে বসেছে, তখন ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল কালা মাঝি। কোমর থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ফজু ব্যাপারীর সামনে রাখল। পরিচিত নোটের ভাঁজে সস্নেহে হাত বুলিয়ে ফজু ব্যাপারী প্রশ্ন করল—

: কাফনের বাকী দিতে আইলা বুঝি বাবা।

: জি।

: আর কি দিউম ? কিছু চাইল ?

: না, বাকী ট্যায়া দিয়া কাফনের কাপড়ই দেন।

চমকে উঠল ফজু ব্যাপারী।

: কাফনের কাপড়। কার লাই ?

: আরফানীর লাই।

চমকে উঠেছিল শুধু এক মুহূর্তের জন্য,—তারপরই ফজু ব্যাপারী পরিচ্ছন্ন হাতে কাপড় কাটতে শুরু করে।

সাদা কাপড়, প্রমাণ মাপের স্ত্রী-মুর্দাকে আগাগোড়া মুড়ি দেবার জন্য যতখানি দরকার।

বাঁধ

জহির রায়হান



জহির রায়হানের জন্ম (১৯৩৩) নোয়াখালি জেলার মজপুর গ্রামে। তিনি চলচ্চিত্রকাররূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ হলেও উপন্যাসিক এবং গল্পকার রূপেও বিস্তীর্ণ খ্যাতির অধিকারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাভাষা ও সা হত্যে সম্মানেব সঙ্গে বি এ. পাশ করে (১৯৫৮) তিনি চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রগতিশীল পরিচ্ছন্ন ভাবধারার জীবনমুখী চলচ্চিত্র নির্মাণের নতুন ধারা প্রবর্তনের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যান। উত্তরকালে তিনি একজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। পূর্ববাংলার প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনেরও তিনি ছিলেন পুরোভাগে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নিখোঁজ অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের সন্ধানে ঢাকার মীরপুর এলাকায় গিয়ে তিনি নিজেও নিখোঁজ হন। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন বলে ধরা হয়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় ছায়াছবি 'জীবন থেকে নেয়া' এবং বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র 'Stop Genocide'। উপন্যাসের জন্য তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৫১) এবং সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য মরণোত্তর 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ—শেষ বিকালের মেয়ে (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), হাজার বছর ধরে (১৩৫১), আবেক ফাল্গুন (১৩৫৫), ববফ গলা নদী (১৩৫৬) এবং আব কতদিন (১৩৫৭) এবং গল্পগ্রন্থ : সূর্যগ্রহণ (১৩৬২)।

আর কিছু নয়, গফরগাঁ থাইকা পীর সাইবেরে নিয়া আস তোমরা অনেক ভেবেচিন্তে বললেন রহিম সর্দার।

তাই করেন হুজুর, তাই করেন! একবাক্যে সায় দিল চাষীরা।

গফরগাঁ থেকে জবরদস্ত পীর মনোয়ার হাজীকেই নিয়ে আসবে ওরা। দেশ জোড়া নাম মনোয়ার হাজীর। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি তিনি। মুমূর্ষু রোগীকেও এক ফুঁয়ে ভালো করেছেন এমন দৃষ্টান্ত আছে।

সেবার করিমগঞ্জে যখন ওলাবিবি এসে ঘরকে ঘর উজাড় করে দিচ্ছিল তখন এই মনোয়ার হাজীই রক্ষা করেছিলেন গাঁটাকে। সাধ্য কি ওলাবিবি মনোয়ার হাজীর ফুঁয়ের সামনে দাঁড়ায়। দিন দুয়েকের মধ্যে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়ে গেল ওলাবিবি, দু'দশ গাঁ ছেড়ে। এমন ক্ষমতা রাখেন মনোয়ার হাজী।

গাঁয়ের লোক খুশি হয়ে অজস্র টাকা পয়সা আর অজস্র জিনিসপত্র ভেট দিয়েছিল তাঁকে। কেউ দিয়েছিল বাগানের শাক-সব্জি। কেউ দিয়েছিল পুকুরের মাছ। কেউ মোরগ-হাঁস। আবার কেউ দিয়েছিল নগদ টাকা। দুধের গরুও নাকি কয়েকটা পেয়েছিলেন তিনি। এত ভেট পেয়েছিলেন যে, সেগুলো বাড়ি নিতে নাকি তিন তিনটে গোরুর গাড়ি লেগেছিল তাঁর। সেই সৌভাগ্যবান পীর মনোয়ার হাজী! তাঁকেই আনবে বলে ঠিক করল গাঁয়ের মাতব্বরেরা, চাষী আর ক্ষেত মজুরেরা।

কিন্তু পীরকে আনতে হলে টাকার দরকার। পীর সাহেব কি এমনি আসবেন? তাঁর জন্যে বিশেষ ধরনের পাল্‌কি চাই। আট বাহকের পাল্‌কি। ঘি ছাড়া কোন কিছু মুখেই রোচে না পীর সাহেবের। গোস্ত ছাড়া ভাত খান না। খাবার শেষে এক প্রস্থ মিষ্টি না হলে খাওয়াটাই অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তাঁর। তাই টাকার দরকার।

—টাকার চিন্তা করলে তো চলবো না। যেমন কইরা অউক পীর সাহেবেরে আনতে হইবো। কোমর ঘিঁচে বলল জমির ব্যাপারী। পর পর দুইডা বছর ফসল নষ্ট অইয়া গেল, খোদা না করুক, এইবার

যদি কিছু অয়, তাইলে যে কোনমতেই জান বাঁচান যাইবো না। শেষের দিকে কান্নায় ভিজে এল জমির ব্যাপারীর কণ্ঠস্বর।

পর পর কত বছর বন্যার জলে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে ওদের। ভরা বর্ষা শুরু হতেই বাঁধটা ভেঙ্গে যায়। আর হুড় হুড় করে পানি এসে ভাসিয়ে দিয়ে যায় সমস্ত প্রান্তরটাকে।

কপাল চাপড়িয়ে খোদাকে অনেক ডেকেছে ওরা। অনেক কাকুতি মিনতি ভরা প্রার্থনা জানিয়েছে খোদার দরবারে। কিছুতেই কিছু হয়নি। খোদা কান দেননি ওদের প্রার্থনায়। নীরব থেকেছেন তিনি।

—নীরব থাকবো না? খোদা কি আর যার তার ডাকে সাড়া দেন! গাঁয়ের লোকদের বোঝাতে চেষ্টা করল জমির মুন্সি। খোদার ওলিদের দিয়া ডাকাইলে পর খোদা শুনবো। মন টলবো। তাই কর, পীর সাইবেরে নিয়া আস তোমরা।

ঠিক হল বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলবে ওরা। অবশ্য চাঁদা সবাই দেবে। দেবে না কেন? বান ডাকলে তো আর একা রহিম সর্দারের ফসল নষ্ট হবে না, হবে সবার। সবার ঘরেই অভাব-অনটন দেখা দেবে। সবাই দুঃখ ভোগ করবে। ধুঁকে ধুঁকে মরবে, যেমন মরেছে গত দু'বছর। কিন্তু মতি মাষ্টার যুক্তি তর্কের ধার ধারে না। চাঁদা চাইতেই রেগে বলল,—চাঁদা দিমু? কিসের লাইগা দিমু? ওই লোকডার পিছে ব্যয় করবার লাইগা?

মতি মাস্টারের কথায় দাঁতে জিভ কাটল জমির মুন্সি।

—তওবা, তওবা, কহেন কি মাস্টার সাব। খোদাভক্ত পীর, আল্লার ওলি মানুষ। দশ গাঁয়ে যারে মানে, তার নামে এত বড় কুৎসা!

—ভালা কাজ করলা না মাস্টার, ভালা কাজ করলা না। ঘন ঘন মাথা নাড়ল জমির ব্যাপারী। পীরের বদ দোয়ায় ছাই অইয়া যাইবা!

কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠল মতি মাস্টার।—কি যে কও চাচা, তোমাগো কথা শুনলে হাসি পায়।

—হাসি পাইবো না, লেখাপড়া শিখাতো এহন বড় মানুষ অইয়া গেছ। মুখ ভেংচিয়ে বললেন জমির ব্যাপারী। চাঁদা দিলে দিবা, না দিলে নাই, এত বাহাত্তুরী কথা ক্যান?

কিন্তু বাহাত্তরী কথা আরো একজনের কাছ থেকে শুনতে হল তাদের। শোনালো দৌলত কাজীর মেজ ছেলে রশিদ। শহরে থেকে কলেজ পড়ে। ছুটিতে বাড়িতে এসেছে বেড়াতে। চাঁদা তোলার ইতিবৃত্ত শুনে সে বলল,—পাগল আর কি, পীর আইনা বন্যা রুখবো। এ একটা কথা অইলো ?

—কথা নয় হারামজাদা ! জমির মুন্সি কোন জবাব দেবার আগেই গর্জে উঠলেন দৌলত কাজী নিজে। আল্লার ওলি, পীর দরবেশ, ইচ্ছা করলে সব কিছু করতে পারে। সব কিছু করতে পারে তাঁরা। এই বলে নূহ নবী আর মহাপ্লাবনের ইতিকথাটা ছেলেকে শুনিয়ে দিলেন তিনি।

খবরটা রহিম সর্দারের কানে যেতে দেরী হল না। দু-দশ গাঁয়ের মাতব্বর রহিম সর্দার। পঞ্চাশ বিঘে খাস আবাদী জমির মালিক। একবার রাগলে, সে রাগ সহজে পড়ে না তাঁর। জমির মুন্সির কাছে থেকে কথাটা শুনে রাগে থর থর করে কেঁপে উঠলেন তিনি,—এ্যাঁ! খোদার পীরেরে নিয়া ঠাট্টা তামাসা। আচ্ছা, মতি মাস্টারের মাস্টারি আমি দেইখা নিমু। দেইখা নিমু মইত্যা এ গেরামে কেমন কইরা থাহে। অত্যন্ত রেগে গেলেও একেবারে হুঁশ হারাননি রহিম সর্দার। কাজীর ছেলে রশিদের নামটা অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেন তিনি। কাজী বাড়ি কুটুম্ব বাড়ি, বেয়াই বেয়াই সম্পর্ক, তাই।

পীর সাহেবের নূরানী সুরত দেখে গাঁয়ের ছেলে বুড়োরা অবাক হল। আহা! এমন যার সুরত, গুণ তার কত বড়, কে জানে! ভক্তি সহকারে পীর সাহেবের পায়ের ধুলো নিল সবাই।

—গরীব মানুষ হুজুর ! মইরা গেলাম, বাঁচান। হুজুরের পা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন জমির ব্যাপারী।

জমির ব্যাপারী বোকা নন, বোঝেন সব। খোদার মন টলাতে হলে আগে পীর সাহেবের মন গলাতে হবে। পীর সাহেবের মন গললে এ হতভাগাদের জন্যে খোদার কাছে প্রার্থনা করবেন তিনি।

তারপরেই না খোদা মুখ তুলে তাকাবেন ওদের দিকে।

পীর সাহেব এসে পৌঁছলেন সকালে। আর ঘটা করে বৃষ্টি নামল বিকেলে। বৃষ্টি, বৃষ্টি, আব বৃষ্টি। সারাটা বিকেল বৃষ্টি হল। সারা রাত চলল তার একটা ঝপঝপ ঝনঝন শব্দ। সকালেও তার বিরাম নেই।

প্রতি বছর এ সময় শ্রাবন মাসের 'ডাত্তব'। কেউ কেউ বলে বুড়োবুড়ির 'ডাত্তব'। এই ডাত্তবের আয়ুষ্কাল পনের দিন। এই-পনের দিন একটানা ঝড় বৃষ্টি হবে। জোবে বাতাস বইবে। বাতাস যদি বেশি থাকে আর অমাবস্যা কি পূর্ণিমার জোয়ারের যদি নাগাল পায়, তাহলে সর্ব্বনাশ! নির্ঘাত বন্যা!

—খোদা, রক্ষা কর! রক্ষা কর খোদা। রহম কর এই অধমগুলার ওপর। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন জমির ব্যাপাবী। মনে মনে মানত করলেন। যদি ফসল নষ্ট না হয় তাহলে হালের গরু জোড়া পীব সাহেবকে ভেট দেবেন তিনি।

গম্ভীর পীর সাহেব ঢুলে ঢুলে তছবি পড়েন আর খোদাব মহিমা বর্ণনা করেন সবার কাছে। খোদার মহিমা বর্ণনা শেষ হলে পীব সাহেবেব মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে অসংখ্য আজগুবি ঘটনার অবতাবণা কবেন তাঁব সাকরেদরা।

মনে মনে অবশ্য আশা জাগে চাষীদেব। আনন্দে চকচক কবে ওঠে কোটরে ঢোকা চোখগুলো। ভীড়েব মাঝ থেকে গনি মোল্লা ফিসফিসিয়ে বললেন,—কই নাই মনার পো? এই পীর যেই সেই পীব নয়, খোদাব খাস পীব।

কথাটা মিনু পাটারীর কানে যেতে গদগদ হয়ে বলল সে,—শুন নাই তোমরা? সেইবাব এক বাঁজা মাইয়া পোলারে এক তাবিজে পোয়াতী বানাইয়া দিছলেন তিনি। শুন নাই?

যারা শুনেছে তারা মাথা নেড়ে সায় দিল, হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। আব যারা শোনেনি তারাও সেই মুহূর্তে বিশ্বাস করল কথাটা। পীর সাহেব সব পারেন। ইচ্ছে করলে এই ঝড় বৃষ্টিটাকে এই মুহূর্তে থামিয়ে দিতে পারেন তিনি। কিন্তু থামাচ্ছেন না প্রয়োজনবোধে থামাবেন তাই।

কিন্তু মতি মাষ্টার বিশ্বাস করল না কথাটা। হেসে উড়িয়ে দিল।

বলল,—ঝড় থামাবে ওই বুড়োটি ? মন্তর পড়ে ঝড় থামাবে ?

—হ্যাঁ, থামাবে। আলবৎ থামাবে। আকাশভেদী হুংকার ছাড়লেন গনি মোল্লা। চোখ রাঙিয়ে ফতোয়া দিলেন। এই নাফরমান বেদীনগুলো গাঁয়ে আছে দেইখাই তো গাঁয়ের এই দুরবস্থা।

হ্যাঁ, ঠিক কইছ মোল্লার পো। তাঁকে সমর্থন করলেন বুড়ো তিনজী মিঞা। এই কাফেরগুলারে গাঁ থাইকা না তাড়াইলে গাঁয়ের শান্তি নাই। কিন্তু গাঁয়ের শান্তি রক্ষার চাইতে 'ঢল' রোখাটাই এখন বড় প্রশ্ন। প্রকৃতি উন্মাদ হয়ে পড়েছে। ক্ষুব্ধ বাতাস বার বার সাবধান করছে। ঢল হইবো ঢল। পানি ভরা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনজী মিঞা।

রক্ত দিয়ে বোনা সোনার ফসল। হায়রে ফসল!

হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠেন তিনি,—খোদা!

মসজিদে আজান পড়ছে। পীর সাহেব ডাকছেন সবাইকে। এস —মিলাদ পড়তে এস—এস মঙ্গলের জন্য এস।

টুপিটাকে মাথায় চড়িয়ে বৃষ্টির ভেতর ভিজে ভিজেই মসজিদের দিকে ছুট দিলেন জমির ব্যাপারী। যাবার সময় ঘরের বৌ-ঝিদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন, এ রাত ঘুমাইবার রাত নয়। বুঝলা ? অজু কইরা বইসা খোদারে ডাক।

অজুটা সেরে উঠে দাঁড়াতেই কার একটা হাত এসে পড়ল ছকু মুন্সির কাঁধের ওপর। জমির মুন্সির ছেলে ছকু মুন্সি। গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান মানুষ। প্রথমটায় ভয়ে আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করল,—কে ?

—ভয় নাই, আমি মতি মাষ্টার।

—ব্যাপার কি ? এ রাত্তির বেলা ? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ছকু।

মতি মাষ্টার বলল,—যাস কনহানে ?

—যাই মসজিদে। ছকু জবাব দিল। ক্যান তোমরা যাইবা না ?

—না। স্বল্প থেমে মতি মাষ্টার বলল। এক কাজ কর ছকু। মসজিদে যাওয়া এহন রাখ। ঘর থাইকা কোদাল নিয়া বাইর অইয়া আয়। যা জলদি কর।

—কোদাল দিয়া কি অইবো ? রীতিমত ঘাবড়ে গেল ছকু মুন্সি।

—যা ছকা। কোদাল আন। পেছন থেকে বলল মন্তু শেখ।

এতক্ষণ পুরো দলটার দিকে চোখ পড়লো ছকু মুন্সির। একজন দুজন নয়, অনেক। অন্ততঃ জন পঞ্চাশেক হবে। সবার হাতে কোদাল আর ঝুড়ি। মতি মাষ্টার এত লোক জোটালো কেমন করে ? কাজী বাড়ীর পড়ুয়া ছেলে রশিদকে দলের মধ্যে দেখে আরো একটু অবাক হল ছকু।

ব্যাপারটা অনেক দূর আঁচ করতে পারল সে। গতকাল এ নিয়েই কাজী পাড়ায় বুড়ো কাজীর সঙ্গে তর্ক করছিল মতি মাষ্টার। গত কয়েক বছর কি খোদারে ডাকেন নাই আপনারা ? হ্যাঁ, ডাকছিলেন। কিন্তু ফল কি হইছে ? ফসল কি বাঁচছে আপনাগো ? বাঁচে নাই। তাই কইতে আছলাম কেবল বইসা বইসা খোদারে ডাকলে চলবো না। এ কয়টা গাঁয়ে মানুষতো আমরা কম নই। সবাই মিলে বাঁধটারে যদি পাহারা দিই,—সাধ্য কি বাঁধ ভাঙে ?

মতি মাষ্টারেব কথা শুনে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এসেছিলেন বুড়ো কাজী। অশ্রাব্য গালি-গালাজ করেছিলেন তাকে। সে কাল বিকেলের কথা। মসজিদে আজান হচ্ছে। পীর সাহেব ডাকছেন সবাইকে, এস —মিলাদ পড়তে এস—এস মঙ্গলের জন্য এস।

সবাব দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ছকু। তারপব টুপিটাকে মাথায় চড়িয়ে মসজিদের দিকে পা বাড়ালেন। খপ করে ওর একখানা হাত চেপে ধরলো রশিদ,—ছকু।

—এই ছকা। ক্ষেপে উঠলো পণ্ডিত বাড়ীব চাঁদু।

অগত্যা, কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে এলো ছকু মুন্সি।

মাইল খানেক হাঁটতে হবে ওদের। তারপব বাঁধ।

নবীন কবিরাজের পুকুর পাড়ে এসে পৌছতেই জোরে বিদ্যুৎ চমকে উঠে। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল একটা। ভয়ে আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়ালো ছকু। খোদা সাবধান করছে তাদের। খবরদার যাইও না।

—যাইও না মাষ্টার। থামো থামো ! হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো ছকু মুন্সি। খোদা নারাজ হইবো, মসজিদে চলো সবাই।

—ইস, চুপ কর ছকু। বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছে মতি মাষ্টার। এখন কথা

কইবার সময় নাই। জলদি চল।

আবার চলতে শুরু করলো ওরা।

দূরে মসজিদ থেকে দরূদের শব্দ ভেসে আসছে। পীর সাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দরূদ পড়ছে তিনজী মিঞা, জমির ব্যাপারী, রহিম সর্দার ও আরো কয়েকশ জোয়ান জোয়ান মানুষ। অসহায়ের মত উর্ধ্বে হাতে তুলে চিৎকার করছে তারা। হে আসমান জমিনের মালিক! হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তা। হে রহমানের রহিম! তুমিই সব। তুমি রক্ষা কর আমাদের! ওদিকে মরিয়া হয়ে কোদাল চালাচ্ছে মতি মাষ্টারের দল।.এ বাঁধ ভাঙতে দেবে না তারা। কিছুতেই না।

তাদের সোনার ফসল ডুবতে দেবে না তারা। কখনই না।

ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আকাশ বিদ্যুৎ চমকিয়ে বাজ পড়ছে। সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বইছে। খরস্রোতা নদী ফুলে ফেঁপে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। অমাবস্যার জোয়ার। নির্ঘাত বাঁধ ভেঙে পড়বে।

হায় খোদা! ঘরের বৌ ঝিয়েরা করুণ আর্তনাদ করে ফরিয়াদ জানায় আকাশের দিকে চেয়ে। দুনিয়াতে ইমান বলে কিছু নেই তাই তো খোদা রাগ করেছেন। মানুষ গোরু সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন তিনি। ধ্বংস করে দেবেন এই পৃথিবীটাকে, পাপে ভরা এই পৃথিবী।

দুরু দুরু বুক কাঁপছে তিনজী মিঞার। চোখের জলে ভাসছেন জমির ব্যাপারী। আর ঢুলে ঢুলে তছবি পড়ছেন।

হায়রে ফসল! সোনার ফসল!

এ ফসল নষ্ট হতে পারে না। টর্চ হাতে ছুটোছুটি করছে মতি মাষ্টার।

কোদাল চালাও! আরো জোরে!

বাঁধে ফাটল ধরেছে। এ ফাটল বন্ধ করতেই হবে।

অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে কোদাল চালাচ্ছে ওরা।

মন্তু শেখ চিৎকার করে বললে,—আলির নাম নাও ভাইরা, আলির নাম নাও।

—আলির নামে কাম হইবো শেখের পো? বললে বুড়ো কেরামত।

—তারচে একডা গান গাও। গায়ে জোস আইবো।

মন্তু শেখ গান ধরলো। গানের শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ বাজ পড়লো একটা কাছে কোথায়। কোদাল চালাতে চালাতে মতি মাষ্টারকে আর তার চৌদ্দ পুরুষকে মনে মনে গাল দিতে লাগলো ছকু মুন্সি, খোদার সঙ্গে লাঠালাঠি। হা-খোদা, এই কি জমানা আইছে। খোদা, এই অধমের কোন দোষ নাই। এই অধমেরে মাপ কইরা দিও।

ঝুড়ি মাথায় বিড় বিড় করে উঠলো পণ্ডিত বাড়ীর চাঁদু,—হাত-পা গুটাইয়া মসজিদে বইসা বইসা ঢল রুখবো না আমার মাথা রুখবো। তারপর হঠাৎ এক সময়ে মতি মাষ্টারের গলার শব্দ শোনা গেল,—আর ভয় নাই রে চাঁদু। আর ভয় নাই। এবার তোরা একটু জিরাইয়া নে!

এতক্ষণে হাসি ফুটলো সবার মুখে। শ্রান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁধের ওপর এলিয়ে পড়লো অবশ দেহগুলো। পঞ্চাশটি ক্লান্ত মানুষ। সূর্য তখন পূর্ব আকাশে উঁকি মারছে।

আধ আলো অন্ধকার। আকাশ বেয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। মৃদুমন্দ বাতাসের তালে তালে নাচছে সোনালী ফসল। মসজিদ থেকে বেরিয়ে হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়তে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো জমির ব্যাপারী। ডোবেনি ডোবেনি। ফসল তাদের ডোবেনি। ডুবতে দেননি পীর সাহেব। খুশিতে চক্ চক্ করে উঠলো জমির মুন্সির চোখ দুটো। দৌড়ে এসে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খেলেন গনি মোল্লা। ডোবেনি ডোবেনি। ফসল তাদের ডোবেনি। ডুবতে দেননি পীর সাহেব।

এক মুহূর্তে যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সমস্ত গাঁ-টা। ছেলে বুড়ো সবাই হুমড়ি খেয়ে ধেয়ে আসছে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খাবার জন্যে।

ঘুম চোখে তখনও ঢুলছেন পীর সাহেব। স্বল্প হেসে বললেন,— খোদার কুদরতের শান কে বলতে পারে।

সাগরেদরা সমস্বরে বলে উঠলো,—সারারাত না ঘুমাইয়া খোদারে ডাকছেন আমাগো পীর সাব। বাঁধ ভাঙ্গে সাধ্য কি?

পীর সাহেব তখনো হাসছেন। স্বল্প পরিমিত হাসি আপেলের রক্তিমাভার মত ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে মুখের সর্বত্র।

বাঘের বাচ্চা

সরোজ কুমার দত্ত



সরোজ দত্ত সাংবাদিক, প্রবন্ধকার, কবি এবং অনুবাদকরূপে বিশেষ পরিচিত। জন্ম অধুনা বাংলা দেশের যশোহর জেলায়। সাংবাদিক হিসাবে প্রথমে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে এবং পরে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র দৈনিক স্বাধীনতায় তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে সম্পাদকীয় বিভাগে যুক্ত ছিলেন। পরিচয় পত্রিকার সঙ্গেও ঐ সময় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে সাপ্তাহিক দেশহিতৈষীতে যোগদান করেন এবং পরে দেশব্রতী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৭২ সালে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান এবং এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। গল্পকাররূপে বিশেষ পরিচিত না হলেও তাঁর এই গল্পটিতে বাংলার ভাঁটি অঞ্চলের কৃষক জীবনের— বাস্তব অবস্থা, আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন-ভালবাসা অতি অন্তরঙ্গভাবে ফুটে উঠেছে। এই গল্পটি শারদীয়া স্বাধীনতায় (১৩৬২) প্রকাশিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থ শিল্পীর নবজন্ম : রমাঁরোলাঁ, নানা লেখা : ম্যাকসিম গর্কি, সেবাস্তোপোলের কাহিনী এবং রেজারেকসন ১ম : লেভ তলস্তয়। তাঁর বহু কবিতা ও ছড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয় এবং সম্প্রতি কিছু কবিতা ও ছড়া নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

হঠাৎ লোকটা থমকে দাঁড়াল। একটা সুঁদরী গাছের ডালে কতক-গুলো বানর ও পাখীর অস্থিরতা দেখে লোকটা কিছুক্ষণ আগেই সাবধান হয়েছিল, একবার ভেবেছিল ফিরে যায় কিন্তু কালকের গুছিয়ে রেখে যাওয়া জ্বালানী কাঠের লোভ সম্বরণ করা সম্ভব হয়নি, তাই অতি সন্তর্পনে চোখ কান খোলা রেখেই সে অগ্রসর হচ্ছিল, হঠাৎ একটা শব্দ কানে আসতেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর যা চোখে পড়ল তাতে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

শীতের সকাল। বড়জোর ন'টা হবে। অরণ্য শব্দহীন। ঠেলাঠেলি সুন্দরী গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে একটু ফাঁকা পরিস্কার জায়গায়। সেখানে চারপায়ে উবু হয়ে বসে একমনে হরিণ মেরে খাচ্ছে বাঘ। না, বাঘ নয় বাঘিনী। লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সেখান থেকে বড় জোর পঞ্চাশ গজ দূরে।

লোকটার নাম কলিম গাজী। বাদার মানুষ সে। বাঘ 'তার অপরিচিত নয়, জীবনে বাঘে মারা বা বাঘে ধরা লোক সে কম দেখেনি। একরকম বলতে গেলে বাঘ নিয়েই তাদের বাস। তবু এভাবে বাঘের মুখোমুখি জীবনে সে হয়নি। প্রথমটা ভয়ে সে একেবারে কাঠ হয়ে গেল। এগুতে এগুতে এত কাছে এসে পড়েছে যে, এখন পিছু হটার মৃদুতম শব্দেও যদি বাঘ মুখ তুলে চায় তাহলেই সর্বনাশ। যখন সমস্ত চিন্তাশক্তি জড়ো করেও সে পালানোর কোন উপায় বের করতে পারলো না, তখন পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ একাগ্র দৃষ্টিতে জানোয়ারটাকে সে লক্ষ্য করতে লাগল। তারপর এক সময় আঁৎকে উঠল কলিম গাজী। কি সর্বনাশ! বাঘিনীতো একা নয় সঙ্গে বাচ্চা। একটা মায়ের লেজ নিয়ে খেলা করছে, আর একটা ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে মায়ের বুকের একপাশে।

বিদ্যুৎ চকিতের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল কলিম গাজীর, গত সনের আগের সনে যখন সে খুলনায় গিয়েছিল একটা ফৌজদারী মামলার

সাক্ষ্য দিতে, কথায় কথায় উকীল যত্নু চৌধুরী তাকে বলেছিলেন, বাদার জঙ্গল থেকে একটা বাঘের বাচ্চা যদি কেউ তাকে ধরে এনে দিতে পারে, তবে তৎক্ষণাৎ নগদ পঞ্চাশ টাকা দাম দিয়ে তিনি সেটা কিনে নেবেন। খুলনা কলিম গাজী ভাল চেনে না। ষাট বছরের জীবনে মাত্র দু'বার সে সেখানে গেছে। প্রথম বার মাছের নৌকো নিয়ে গিয়েছিল, ডাঙ্গায় ওঠেনি, দ্বিতীয়বার গিয়েছিল সাক্ষ্য দিতে। কিন্তু উকীল যত্নু চৌধুরীর বাড়ী তার ভুল হবে না। নদীর পাড়েই বাড়ি, বাড়ির সামনেই একটা কাঁঠাল গাছ আছে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে কাছারি ঘরের বারান্দায় বসে গাজীকে বলেছিলেন যত্নু চৌধুরী, শেখের পো, দেখতো পারো কিনা, বাদা থেকে একটা বাঘের বাচ্চা আমায় এনে দিতে। নগদ পঞ্চাশ টাকা দাম দেব তোমায়। কলিম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, বাঘের বাচ্চা দিয়ে কি করবেন উকীল বাবু, পুষবেন ? হেসে উঠেছিলন যত্নু চৌধুরী, আরে না। কলকাতায় বড় বড় জানোয়ারের কারবারী বহু আছে, বাদার বাঘের বাচ্চা পেলে ওরা লুফে নেবে। জাত বাঘ কিনা, দুনিয়ার সেরা বাঘ বলতে পার।

পঞ্চাশ টাকা ! পঁয়ত্রিশ টাকায় বন্ধকী জমিখানা খালাস করেও হাতে থাকবে পনেরো টাকা। পাঁচ টাকা দিয়ে ভাঙ্গা নৌকাখানা সারিয়ে নেবে কলিম গাজী। নৌকোর জন্য আর সে পরের হাতে পায় ধরতে যাবে না। বাকি টাকায় ঘরটা ছাওয়া হয়ে যাবে। আঃ তা হলে হাফ ছেড়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারবে কলিম গাজী।

মূর্তিমান মৃত্যু ও হিংসার পঞ্চাশ গজের মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবন ও শান্তির স্বপ্ন দেখতে লাগল কলিম গাজী।

কলিম গাজীর মনে পড়ল বাঘিনীতো একসঙ্গে চারটের কম বাচ্চা বিয়োয় না। তবে আর দুটো গেল কোথায় ? মদ্দা বাঘে খেয়ে গেল নাকি ! না আর দুটো কাছেই আছে কোথাও, সে দেখতে পাচ্ছে না ? কলিম গাজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আপাতত বাঘিনীকে রেখে এদিক ওদিক তার বাচ্চা খুঁজতে লাগল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে যে মানুষ মৃত্যুর আতঙ্কে প্রায় নীল হয়ে গিয়েছিল, সহসা তারই সর্বাঙ্গে একটা আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। সুঁদরী গাছের শুলোর ফাঁকে ফাঁকে এগুতে এগুতে একটা

বাচ্চা তারই খুব কাছে এসে পড়েছে, এবং এখনও সেটা এগিয়েই আসছে। আহাররত বাঘিনীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ রেখে আস্তে আস্তে কোমরে জড়ানো গামছাটা খুলে নিল কলিম গাজী।......

মহামূল্য সম্পদ গামছায় বেঁধে নিয়ে কলিম গাজী যখন প্রায় নিরাপদ দূরত্বে এসে গেছে এবং খালের কোলে বাঁধা নৌকোটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তখনই এক প্রচণ্ড গর্জনে সমগ্র অরণ্যভূমি থর থর করে কেঁপে উঠল। জঙ্গলে বাঘের ডাক যথেষ্ঠ ভয়ংকর, কিন্তু শাবকহারা বাঘিনীর ডাক যে কি ভয়ঙ্কর তা যে না শুনেছে তার পক্ষে কল্পনা করাই শক্ত। দ্বিতীয় গর্জনে কলিম গাজী বুঝল, বাঘিনী তার পায়ের দাগ ধরে তাকে অনুসরণ করছে আর অনুসরণ করছে অত্যন্ত দ্রুতবেগে।

বাদার জংগলেব ভেতর দিয়ে আট দশ হাত চওড়া অসংখ্য ছোটবড় খাল জোয়ারের সময় জলে ও মাছে ভর্তি হয়ে যায়। তারই একটা খাল দিয়ে ডিঙ্গি নিয়ে বাদায় ঢুকেছিল কলিম গাজী। গতকাল এক জায়গায় সে শুকনো কাঠ কুড়িয়ে রেখে গিয়েছিল আজ সেগুলো নিয়ে যেতে না পারলে শুধু রান্না নয়, আগুনের অভাবে রাতের শীত সহ্য করাও কঠিন হবে। গামছায় জড়ানো বাঘের বাচ্চা কোলে নিয়ে প্রাণপনে বৈঠা বেয়ে কলিম গাজী যখন নদীতে এসে পড়ল তখন তার মনে হল সে যেন মুক্তির সমুদ্র এসে গেছে। শীতের শান্ত নদী। কুয়াশা কেটে গিয়ে রৌদ্রে ঝলমল করছে আকাশ। কলিম গাজী আরাম অনুভব করল। তার মুখ দিয়ে বেরুতে যাচ্ছিল 'মার-দিয়া-কেল্লা', কিন্তু হঠাৎ তার হাতের বৈঠা শিথিল হয়ে এল। মাঝনদী দিয়ে পিটেল বা পেট্রোল পুলিসের লঞ্চ যাচ্ছে। ফরেষ্ট ডিপার্ট-মেণ্টের সাব ইনস্পেক্টর অর্থাৎ বন দারোগার লঞ্চ। একবার যদি ওরা তাকে দেখতে পায়, তবে বেআইনীভাবে রিজার্ভ ফরেষ্টে ঢোকার অপরাধে এখনই গ্রেপ্তার করে সদরে চালান দেবে এবং জেল অনিবার্য। না, ওরা তাকে দেখতে পায়নি। লঞ্চটি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল বাঁধের ওপাশে। গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কলিম গাজী।

পুঁটুলি নিয়ে কলিম গাজী সরাসরি ঘরের ভেতরে ঢুকে বৌকে ডাকল। বৌ উঠোনে বসে কি যেন করছিল। ডাক শুনে ঘরের ভেতর

এসে দাঁড়াল। স্বামীর চোখমুখের ভাব দেখে সে একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—ব্যাপার কি? পুঁটলীতে কি?

কলিম প্রায় ফিস ফিসিয়ে বলল,—চুপ, বাঘের বাচ্চা।

শুনে বৌ একেবারে হা হয়ে গেল। গেল লোকটা কাঠ আনতে বাদায়, নিয়ে এল বাঘের বাচ্চা।

তারপর যখন কলিম উত্তেজনায় থেমে থেমে বলে গেল কেমন করে সে বাঘিনীর মুখ থেকে বাচ্চা চুরি করে এনেছে, তখন ভয়ে কলিমের বৌ এর মুখ সাদা হয়ে গেল। বল্‌ল,—কি সর্বনাশ, বাচ্চার খোঁজে বাঘ যদি নদী সাঁতরে তোমাব বাড়ী আসে রেতের বেলায়।

স্ত্রী বুদ্ধি সম্পর্কে একটা বিদ্রূপ কবে কলিম হেসে উড়িয়ে দিল বটে কথাটা, কিন্তু সম্ভাবনাটা একেবাবে মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না। ঘরেব মধ্যে দাঁড়িয়েই নদীব ওপারে অরণ্য দেখা যাচ্ছে। ধ্বক করে উঠল কলিমের বুকটা।

কিন্তু পঞ্চাশ টাকাব কথাটা কলিম যখন বৌকে বলল, তখন বৌও কেমন যেন বিচলিত হল। বলল,—বগার হাট থেকে একটা ভাঙ্গ কাপড এনে দিতে হবে কিন্তু। এ কাপড়ে আর বেরুতে পারিনে।

কলিম হেসে বল্‌ল,— সব হবে।

কলিমেরা স্বামী-স্ত্রী, এই নিয়েই সংসার, গত সনের আগের সনে একমাত্র ছেলে দিন পাঁচেকের জ্বরে মারা গেছে। কলিমের জমি নেই। সাতক্ষীরের জোদ্দার প্রশান্ত মুখুজ্জের জমিতে সে ভাগচাষ করে, কখনও বা জন খাটে। কিন্তু দুটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন এতেও কুলোয় না।

তাই কলিমকে অনেকের মতই চুরি করে বাদায় ঢুকতে হয়। মাছ, মধু ও গোসাপের চামড়ার গোপন বিক্রীতে কলিমের দু'পয়সা হয়। কিন্তু বাঘের বাচ্চার কথা কোনদিন কলিম ভাবেওনি। যদি কোনমতে একবার খুলনায় নিয়ে যাওয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে নগদ পঞ্চাশ টাকা।

বৌকে কলিম বললে,—খবরদার। কাকপ্রানীতে যদি টের পায় একথা, তাহলে কথাটা নির্ঘাৎ বনদারোগার কানে যাবে। তখন

মালও যাবে, জেলও হবে। সর্বনাশ হয়ে যাবে একেবারে।

দুদিন পরে ছক্রোশ দূরে বড় দলের হাট। তেঁতুল তলার চর থেকে অনেকগুলো নৌকা যায় ঐ হাটে। ঐ একখানায় কোন মতে বাচ্চাটাকে লুকিয়ে হাটে নিয়ে যেতে পারলে, ওখান থেকে হেঁটে খুলনায় যাওয়া যাবে। কিন্তু পরের নৌকায় লুকিয়ে এ মাল নিয়ে কেমন করে যাওয়া যায়, অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়ল কলিম গাজী। উপায় নেই, যার নৌকায় যাবে, তাকে বলতেই হবে। হয়ত কিছু চেয়েও বসবে সে। কিন্তু উপায় নেই।

পঞ্চাশ টাকা। ঘরে চাল নেই, একফোঁটা জমি নেই, নৌকো নেই, গরু নেই, মেয়ে মানুষের ইজ্জত ঢাকবাব মত একটুকরো কাপড়···নেই। এর মধ্যে পঞ্চাশ টাকা।

আশ্বিনের অমাবস্যার রাত্রি। অন্ধকারে ঢেকে গেছে তেঁতুলচরার চর নদী ও নদীর ওপারের বাদাবন। ঘরের মধ্যে পঞ্চাশ টাকার বিপজ্জনক মাল বুকে আঁকড়ে আতঙ্কে উদ্বেগে বিনিদ্র বজনী যাপন করছে সুন্দরবনের নিঃস্ব চাষী ও তার জীবনসঙ্গিনী। মাল নিয়ে একবার খুলনায় পৌছুতে পারলে হয়, জমি হবে, নৌকা হবে, চাল ছাওয়া যাবে, চাই কি একখানা কাপড়ও হয়ে যেতে পারে বৌয়ের।

হঠাৎ অরণ্য কাঁপিয়ে মেঘের ডাকের মত ডাক শোনা গেল। ওপারের বাদায় বাঘ ডাকছে। প্রতি অমাবস্যা-পুর্ণিমার রাত্রে এ ডাক শুনতে তারা অভ্যস্ত। তবু আজ তারা কেঁপে উঠল। একি সেই শাবকহারা বাঘিনীর ডাক? কে জানে?

সকালে উঠোনের রোদে বসে কলিম গাজী তামাক খাচ্ছিল। একজন এসে খবর দিল বন দারোগা এসেছে তেঁতুলতলার ঘাটে। তাকে ডাকছে। হুঁকোটা রেখে গামছাটা নিয়ে বাড়ীর বাইরে পা দিতেই কলিম দেখে, বনদারোগা জন ছয়েক সেপাই নিয়ে স্বয়ং এসে উপস্থিত। কলিম নত হয়ে সেলাম জানাতেই জিজ্ঞেস করলেন,—কাল বাদা থেকে বাঘের বাচ্চা ধরে এনেছিস তুই?

কলিম সহজ কণ্ঠে বলল,—ধরেছিলাম আবার ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

দারোগা বলল,— সত্যিকথা বলছিস ?

কলিম বলল,—বিশ্বাস না হয় আমার ঘর তল্লাশ করে দেখেন।

কথা হচ্ছিল উঠোনে দাঁড়িয়ে। কলিমের কথা শুনে দারোগা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর চোখ দিয়ে ইসারা কবতেই একজন সেপাই লাফিয়ে উঠে গেল কলিমের ঘরের ভেতর এবং কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে এল একটা ছোট বেড়ালেব মত জানোয়ারেব ঘাড়ের চামড়াটা হাতের ছুই আঙ্গুলে আটকে তুলে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বুকফাটা আর্তনাদে উঠোনটা যেন কেঁপে উঠলো। কলিমেব বৌ আছড়ে পড়েছে দারোগার পায়ের উপর।

এবারের মত মাপ করেন দারোগা বাবু, ও জেলে গেলে আমি যে না খেয়ে মরে যাব।

থানা থেকে কলিম গাজী যখন ফিরে এল তখন বেলা বেশী নেই। বুকে পিঠে সর্বত্র প্রহারের দাগ, সারা গা ফুলে উঠেছে। তেষ্টায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, আর সে দাঁড়াতে পারছে না। দারোগা দয়া করে তাকে চালান দেননি, শুধু চোরাই মালটা কেড়েরেখেছেন থানায়। মবিয়া হয়ে একটু আপত্তি করতে গিয়েছিল কলিম, তারই ফল সর্বাঙ্গে বহন করে ফিরে এসেছে।

ঢক ঢক করে একঘটি জল গলায় ঢেলে দিয়ে দাওয়ার একপাশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল কলিম। রাত্রে ভাত খাবে কিনা জানবার জন্মে বৌ ডাকলে কয়েকবার। সাড়া পেলনা। ক্রমে কালকের মতই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল বাদার চরে ও অরণ্যে এবং শুরু হল কালকের মতই নদীর ওপারে আবার সেই বাঘের ডাক। কিন্তু কলিম গাজী তখন জ্বরে বেহুঁশ।

ওদিকে বনদারোগার সুরক্ষিত কোয়াটার্সে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে দারোগার মেয়ে তখন বাঘের বাচ্চাকে ঝিনুকে করে ছাগলের দুধ খাওয়াচ্ছে এবং দারোগা মোজাম্মেল চৌধুরী ইজিচেয়ারে শুয়ে তাই দেখছে আর ভাবছে, বাঘটা জেলার সাহেবম্যাজিষ্ট্রেটকে উপহার পাঠালে কেমন হয় ?

□ □ □ □ আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই □ □ □ □

মরিয়ম—গোলাম কুদ্দুস ১৮'০০

স্বাধীনোত্তর কালে পূর্ব পাকিস্তানে(বর্তমান বাংলাদেশে যে)বিশাল রেল ধর্মঘট হয়, তারই পটভূমিকায় এক অসাধারণ মুন্সিয়ানায় লেখক এই উপন্যাসের কাহিনীকে বিধৃত করেছেন। এক দেশব্যাপি সংগ্রামের উপর এমন উপন্যাস আর রক্তে মাংসে গড়া এমন সব চরিত্র পৃথিবীর যে কোন ভাষার সাহিত্যেরই এক অমূল্য সম্পদ।

মা—ম্যাকসিম গর্কি : চতুর্থ সংস্করণ। ১০'০০

অনুবাদ ও সম্পাদনা—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
যাঁকে দেখে গর্কি এই পৃথিবী বিখ্যাত উপন্যাস লিখেছিলেন তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পরিচয় নতুন সংযোজিত।

রাত প্রভাতের গান—গেব্রিয়েল পেরী ৭'০০

গেব্রিয়েল পেরী ছিলেন ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য এবং পার্টির মুখপত্র 'ল্যুমানিতি'র অন্যতম সম্পাদক। জার্মান ফ্যাসিস্টরা ১৯৪১ সালে ১৫ই ডিসেম্বর পেরীকে বন্দী অবস্থায় খুন করে। এই বইটিকে গেব্রিয়েল পেরীর রাজনৈতিক জবানবন্দি হিসাবে গণ্য করা হয়। হত্যার পূবে কয়েকদিন ধরে লেখা এই আত্মজীবনী জেলখানা থেকে লুকিয়ে বাইরে আনা হয়, পরে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির গোপন ছাপাখানা এদিসিওঁ-দ্য-মিনুই এটা প্রকাশ করে। মূল্যবান দীর্ঘ ভূমিকা অংশ লিখেছেন ফ্যাসী বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রথম সারির নেতা, পেরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সংগ্রামের সাথী, প্রখ্যাত কবি ও লেখক লুই অাঁরাগ।

মানবতাবাদ—বসুধা চক্রবর্ত্তি

মানবতাবাদ মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতই প্রাচীন। এই বই সমগ্র মানবতা বাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ও আলোচনা গ্রন্থ। তথ্য বহুল মৌলিক উপাদান সম্বলিত বাংলায় একমাত্র বই। ইতিহাস ও দর্শন এর অনুরাগী পাঠকেরা বিশেষ করে যাঁরা রাজনীতির চর্চা করেন, মানব সমাজের উন্নততর জীবনযাত্রা যাদের কাম্য, তাদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বই।

বাঁদী—গোলাম কুদ্দুস ১৮·০০

বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের আশা-আকাঙ্খা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা ভাবনায় চালিত গতানুগতিক জীবন ; নতুন চিন্তার উন্মেষ এবং উভয়ের টানাপোডেনের এক অতি অন্তরঙ্গ ছবি এই উপন্যাস।

ভলান্টিয়ার্স—ষ্টীভ্ নেলসন (যন্ত্রস্থ)

স্পেনের গৃহযুদ্ধে উপর আমেরিকান স্বেচ্ছাসৈনিক ষ্টীভ নেলসনের এক অনন্য উপন্যাসের অসাধাবণ অনুবাদ।

ইরাণের গল্প সংগ্রহ (যন্ত্রস্থ)

ইবাণের বিপ্লবী গল্পকাবদেব এক অসাধারণ গল্প সংগ্রহ।

শহর গঞ্জের গল্প (যন্ত্রস্থ)

চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে বাংলার শহর গঞ্জের জীবন ও সংগ্রামের উপব প্রায় সমস্ত প্রগতিশীল গল্পকারদের এক অনন্য গল্প সংগ্রহ।

রহস্য উপন্যাস—অনুবাদ

মঙ্গলবারের সান্ধ্যবৈঠক—আগাথা ক্রিষ্টি ১৭·০০

মনোরম প্রচ্ছদ ও অলংকরণে সজ্জিত এই বই বাংলা রহস্য উপন্যাস অনুবাদের ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। পডতে যেয়ে মনেই হয়না যে কোনো অনুবাদ পডছি কিন্তু বিদেশী স্বাদ গন্ধ পরিপূর্ণ রূপে বজায় আছে।

এডগার এ্যালান পোর গল্প (যন্ত্রস্থ)